বিদেশী গল্প সংকলন

অনুবাদ

সুপ্রিয়া আচার্য্য

শঙ্খ প্রকাশন

Bideshi Galpa Sankalan
Translated by
Supriya Acharya

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৭১

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
শঙ্খ প্রকাশন
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
সমীর মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

একটি অসাধারণ কাহিনী

আলেক্সি তলস্তয়

ঐ আসছে ওরা! সুবিন্যস্তভাবে সারিবদ্ধ হয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে— একটা, আব একটা, তৃতীয়টা –তাদের গায়ে বিড়ালের চোখের মতো সাদা বৃত্ত আর তার মাঝখানে কালো ক্রুশ চিহ্ন আঁকা। পিওতর ফিলিপোভিচ-এর পিছনে দাঁড়িয়ে, প্রাসকোভাইয়া সাভিশনা নিজের গায়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলো । ঘড় ঘড় শব্দে ট্যাঙ্কগুলি এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পিওতর ফিলিপোভিচ লাফ দিয়ে জানালার ধারের বেঞ্চির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে, জানলার কাঁচের গায়ে মুখ লাগালো ভালো করে দেখবে বলে। প্রাসকোভাইয়া সাভিশনা তার সর্বাঙ্গে ক্রুশ চিহ্ন আঁকার পর সে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার তারের মতো কড়া খসখসে দাড়ির মধ্যে প্রায় দন্তহীন একটা বিদ্রুপের হাসি হাসলো। গ্রামের কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে ট্যাঙ্কগুলোর পিছু পিছু সারিবদ্ধভাবে আসছিল বিরাট ট্রাকে জোড়া জোড়া বেঞ্চিতে বসা সৈনিকের দল। তাদের ভারী ভারী হেলমেটগুলোর (শিরস্ত্রাণ) তলা থেকে জার্মানরা 'শূন্য' দৃষ্টিতে ধূসর বৃষ্টির দিকে তাকিয়েছিল, তাদের মুখগুলো সব ধূসব প্রাণহীন আর মলিন।

পার হয়ে যাওয়ার সারিটার শব্দ মিলিয়ে গেলে তখন আবার বাজের শব্দ শোনা যেতে লাগলো। পিওতর ফিলিপোভিচ জানলার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়'লো। তার চোখগুলো হাসিতে কুঞ্চিত, আর সঙ্কুচিত চোখের পাতার মধ্যে বহুকষ্টে দেখা চোখদুটোর কেমন অদ্ভুত একটা দ্বীপ্তি। প্রাসকোভাইয়া সাভিশনা বললো :

"হা ভগবান, কি সাংঘাতিক! এইবার, পিওতর ফিলিপোভিচ, আমরা হয়তো হোমরা চোমরা একটা কিছু হবো ?" ও কোনো উত্তর দিলো না। বসে বসে টেবিলের ওপর নখ নিয়ে টোকা মারতে লাগলো— ছোটখাটো মানুষটি, প্রশস্ত নাসারন্ধ্র আর পাতলা লাল চুল। তাদের বাড়ির সম্বন্ধে কিছু বলতে পারলে প্রাসকোভাইয়া সাভিশনা খুশি হতো কিন্তু ভীরুতা তার মুখ বন্ধ করে দিলো। বরাবর সে তার স্বামীকে ভয় করে এসেছে, ১৯১৪ সালে তাকে তার দুস্থ পরিবার থেকে নিয়ে আসা হয় তার বিত্তশালী, স্বামীর প্রার্থনাদির পুরাতন অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে বিশ্বাসী* পরিবারে।

[★ রুশীয় ধর্মীয় এক সম্প্রদায়-ধর্মগুরু নিকন-এর প্রার্থনাদির অনুষ্ঠানের পদ্ধতির সংশোধনে প্রতিবাদে সপ্তদশ শতাব্দীতে এর উৎপত্তি]

পুরাতন অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে বিশ্বাসী রুশীয় ধর্মীয় এক সম্প্রদায়- ধর্মগুরু নিকন-এর প্রার্থনাদির অনুষ্ঠান পদ্ধতির সংশোধনের প্রতিবাদে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি পরিবারে, সেই দিন থেকে। বছরগুলোর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল সে যেন এটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সেবার সেই বসন্তকালে, দশ বছরের দণ্ড ভোগ করে পিওতর ফিলিপোভিচ যখন ফিরে এলো, তখন থেকে সে আবার তাকে ভয় করতে আরম্ভ করলো। কিন্তু কেন যে তা সে নিজেই বলতে পারতো না। স্বামী তাকে মারধর বা গালমন্দ করতো না— কিন্তু সে যাই করুক না কেন স্বামী তাকে বিদ্রুপ করতো আর সব সময় হেঁয়ালি করে কথা বলতো। আগে ঐ বাড়িতে কেউ কখনো কোনো বই পড়তো না, কিন্তু এখন তার স্বামী গ্রামের লাইব্রেরী থেকে খবরের কাগজ নিয়ে আসে আর রাত্রে বই পড়বার জন্য কেরোসিন পোড়ায়। এই জন্য উত্তরাঞ্চল থেকে চশমা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

প্রাসকোভাইয়া তার মনের কথা না বলেই রাতের খাবার তৈরি করতে লেগে গেলো ; খানিকটা বাঁধাকপি আর পেঁয়াজ কুচিয়ে কিছুটা জলো কভাস (রাঈ শস্যের দানা পচিয়ে তৈরি অম্লস্বাদের পানীয়) ঢাললে তারপর অপ্রসন্নভাবে তার ছেলে-মেয়েকে ডাক দিলো। তাদের রাতের খাবারের সঙ্গে তারা ছাতাধরা সেঁকা রুটির টুকরো খেলোঃ শস্যের দানা, ময়দা জরানো হাঁসের আর শূকরের মাংস, পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হবার জন্য জার্মানদের চোখের অন্তরালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। নিজের চামচটা তুলে নেবার আগে পিওতর ফিলিপোভিচ তার জামার হাতার মধ্যে থেকে হাত দুটো বার করে কনুইয়ের কাছ থেকে বেঁকিয়ে নিজের চুলে বিলি কাটতে লাগলো— ওর বাপের অভ্যাস ছিল এটা। সে তার হাত দুটো বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই প্রাসকোভাইয়া সাভিশনা মহিলাসুলভ অসঙ্গতির সঙ্গে বলে উঠলো :

"ওরা গ্রাম সোভিয়েত-এর সাইন বোর্ডটা খুলে ফেলে দিয়েছে ; এবার ওদের উচিত আমাদের বাড়িটা ফিরিযে দেওয়া।"

নিজের চামচটা নামিয়ে রেখে এপ্রনের খুঁটে চোখের জল মুছে প্রাসকোভাইয়া সাভিশনা, শততম বার শোনা তার দীর্ঘ অভিযোগ চিৎকার করে বলতে শুরু করলো। পিওতর ফিলিপোভিচ ও ছেলে-মেয়েরা — ছেলে একটি, চুলের রঙ তার বাপের চুলের মতোই আর বারো বছরের মেয়ে একটি, দুধের মতো সাদা ধবধবে উদাস বিষণ্ণ মুখ —নীরবে খেয়ে চললো। শেষকালে আসলো খবরটা, যেটা বলতে না পেরে তার অশান্তি হচ্ছিল, প্রাসকোভাইয়া সাভিশনা সেটাই দুম করে বলে বসলোঃ

"ব্লাগোভেসচেনস্কর গ্রামে একজন দাগী অপরাধী —সকলেই তাই বলে— তাকে বার্গোমাস্টার (প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট বা মেয়র) করা হয়েছে। তাকে ওরা একটা বাড়ি দিয়েছে..। বাড়িটা দোতালা আর ইঁটে গাঁথা, একটা ঘোড়া দিয়েছ ···। আর ঈশ্বর জানেন, তুমি তো যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করছো, তোমার কিছু পাওয়া উচিত....।"

"আর তুমি হচ্ছো পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে নিরেট মূর্খ"। ওর কথার উত্তরে

ফিলিপোভিচ মাত্র এইটুকুই বললো, কিন্তু এইটাই সে এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললো যে প্রাসকোভাইয়া সাভিশনা সঙ্গে সঙ্গে একেবারে থমকে, থেমে চুপ করে গেলো।

পরের দিন জার্মানদের নিয়ে ট্রাকগুলো এসে গেলো —এবার তাদের মাথায় হেলমেটের পরিবর্তে ট্রেঞ্চক্যাপ। অফিসাররা পিওতর ফিলিপোভিচ-এর পৈত্রিক যে বাড়ি ছিল, টিনের ছাদওয়ালা বেশ ভাল বাড়ি সেইটা দখল করে বসলো, এখন সে যে বাড়িতে বাস করছিল তারই ঠিক উলটো দিকে, রাস্তার ওপারে। কয়েকদিন আগেই প্রায় সব অল্পবয়স্করা তের থেকে উনিশ বছরের সব ছেলেমেয়েরা গ্রাম থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল কে যেন তাদের সবাইকে ভুলিযে নিয়ে গিয়েছিল। এটাতে জার্মানরা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কমান্ডান্ট-এর (সেনাপতি) অফিসের দরজাগুলোর ওপর আর কুয়োর ধারে তারা দুরকম ভাষায় বেশ ভালো কাগজে এক ঘোষণা জারি করেছিলঃ রুশীয়দের আবার আচার-আচরণ। শাস্তি মাত্র একটি— মৃত্যু। তারপর শুরু হলো ব্যাপক খানাতল্লাশ। আতঙ্কিত প্রাসকোভাইয়া সাভিশনা সবিস্তারে গল্প করলো ওদের এক সৈনিক সম্বন্ধে, দুগ্ধ পোষ্য শূকরছানা খুঁজে বার করার ব্যাপারে একেবারে সিদ্ধহস্ত সে যে কোনো গোলাবাড়ির উঠোনে সন্তর্পণে ঢুকে সে শূকরছানার মতো ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে শুনলে কোনো পার্থক্য বোঝা যায় না— ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে আর কান পেতে শোনে। বেশ কয়েকটা গোলাবাড়ির দুগ্ধপোষ্য শূকরছানারা তার সে ডাকে সাড়া দিয়েছে— চিলেকোঠায় তাদের এত ভালো করে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে ঐ সব মহিলারা কি কান্নাই কেঁদেছে।...

জার্মানরা সব কিছু নিয়ে গেলো, বাড়িগুলো একেবারে শূন্য করে দিলো। প্রতি রাত্রি বাক্স থেকে মাটিরতলার ভাঁড়ার ঘরে আবার সেখান থেকে স্টোভের নিচের বা বা কোনো জায়গায় জিনিসপত্র নাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে প্রাসকোভাইয়া সাভিশনা একেবারে শ্রান্ত হয়ে পড়লো। শেষকালে পিওতর ফিলিপোভিচ মাটিতে পা ঠুকে চিৎকার করে তাকে বললোঃ "হয় স্থির হয়ে বোসো না হয় অন্য কোথাও গিয়ে পড়ে মরো, নয় তো এখান থেকে বেরিয়ে যাও।" তাদের বাড়িটা ওরা এড়িয়ে গেলো যেন বাড়িটার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা আছে। অবশেষে রাইফেলধারী দুজন সৈনিক এসে উপস্থিত হলো। পিওতর ফিলিপোভিচ তার বাপের কারাফুল ভেড়ার লোমের টুপিটা কপালের ওপর নামিয়ে পরে ধীর অচঞ্চলভাবে সৈনিক দুজনের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চললো। কমান্ডান্টের অফিসের গাড়ি বারান্দায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখলো চশমা চোখে লম্বা, ভদ্র চেহারার এক জার্মান বছর চৌদ্দের গোলমুখ একটি মেয়েকে নিজের কাছে টেনে এনে বিশ্রীভাবে তার গায়ে হাত বোলাতে আরম্ভ করেছে। মেয়েটি ভয় পেয়ে কনুই দিয়ে নিজেকে আড়াল করে মৃদু কণ্ঠে বললো, "দোহাই খুড়ো, অমন কোরো না।" লোকটি তার হাঁটু দুটো দিয়ে মেয়েটিকে চেপে ধরলো। মেয়েটি কাঁদতে আরম্ভ করলো। লোকটি তার মাথার পিছনে এক বাড়ি মারলো, মেয়েটি হোঁচট খেতে খেতে পালিয়ে গেলো। নিজের

চশমাটা সোজা করে নিয়ে লোকটি পিওতর ফিলিপোভিচ এর দিকে তাকালো— তার মুখের বা চোখের দিকে নয়, আরো উঁচুতে।

"এই কি পিওতর গরশকোভ ?" জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো।

পিওতর ফিলিপোভিচ লম্বা জার্মানটির পিছু পিছু বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলো, সেই বাড়ি যেখানে সে জন্মেছে, বড় হয়ে উঠেছে, যেখানে তার বিয়ে হয়েছে আর যেখানে তার বাপ, মা আর তিনটি সন্তানকে সে কবর দিয়েছে, সারা জীবন ধরে এই বাড়ি তার মনকে অধিকার করে আছে, একজন কৃষকের ঘাড়ের ওপর চেপে বসা এক চক্ষু শয়তানের মতো। দেওয়ালগুলো সদ্য চুনকাম করা হয়েছে, মেঝেগুলো ধোওয়া হয়েছে, তিনটে জানলাওয়ালা ঘরের মধ্যে চুরুটের গন্ধ ভাসছে, এখানেই আগের কালে প্রধান প্রধান ছুটির দিনগুলোয় গরশকভ পরিবার টেবিল ঘিরে বসতো। দ্বিতীয় এক জার্মান সন্তর্পণে তার কলম নামিয়ে রেখে পিওতর ফিলিপোভিচ এর দিকে মুখ তুলে তাকালো— সেই একই রকম ভাবে, তার মাথার ওপর— আর রুশ ভাষায় বললো:

"টুপিটা খুলে দরজার কাছের ঐ চেয়ারটাতে বোসো।" এই জার্মানটি সুপুরুষ, কালো গোঁফ আর মাথায় চকচকে সিঁথি কাটা।; তার কলারের ট্যাবগুলোয বিদ্যুতের রুপোলী ঝলক *।

" তোমার জীবনের কথা আমরা জানি," দীর্ঘ একটা নীরবতার পব সে বললো। "তুমি সোভিয়েত শক্তির একজন শত্রু ছিলে— আশা করি এখনও তাই আছো।" টুপিটা তার হাঁটুর ওপর রাখা, সামনের দিকে আলম্বিত দাড়ি, পিওতর ফিলিপোভিচ তার কুঞ্চিত সঙ্কীর্ণ চোখেব পাতার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অফিসারের দিকে তাকালো। "আমরা তোমার কাছ থেকে কি চাই ? আমরা চাই: এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে বিশেষ করে পার্টিজানদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্বন্ধে সমস্ত খবর ; আমরা চাই তুমি এখানকার অধিবাসীদের যেন কাজ করতে বাধ্য করো : কি কবে কাজ করতে হয় রুশীয়রা তা জানেনা, আমরা জার্মানরা সেটা পছন্দ করি না— প্রতিটি লোকের উচিত আজীবন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে যাওয়া, অন্যথায় তার মৃত্যু অনিবার্য : আমার যেখানে জন্ম, আমার বাপের বাড়িতে, একটা ছোট ঘানি আছে কুকুরে টানা—সারা দিন সারা রাত ধরে ঘুরে ঘুরে কুকুরটা সেটা চালায়, কুকুর খুব বুদ্ধিমান জানোয়ার, সে বেঁচে থাকতে চায়— রুশীয়দের সম্বন্ধে অবশ্য সে কথা বলতে পারি না....। আর সেই জন্যই মেদভেদোভকা গ্রামেব বার্গোমাস্টার নিযুক্ত করবো তোমাকে। সোমবার তুমি দুজন পার্টিজানের ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকবে। তারপর তুমি তোমার কাজের ভার গ্রহণ করবে।"

পিওতর ফিলিপোভিচ বাড়ি ফিরে গেলো। তার স্ত্রী ছুটে এলো তার কাছে।

"কি হলো, কি বললো ওরা তোমায় ? আমাদের বাড়িটা কি ফিরিয়ে দেবে বলছে ?

[★ প্রাচীন টিউটনিক বর্ণ-ভাষার অক্ষর "S" এবং "S" এর পরিবর্তে ব্যবহৃত এবং টিউনিক যুদ্ধ দেবতা-এর প্রধান লক্ষণ সমূহ।]

"নিশ্চয়, নিশ্চয়," শ্রান্তভাবে একটা বেঞ্চির ওপর বসে গলার স্কার্ফ খুলতে খুলতে উত্তর দিলো পিওতর ফিলিপোভিচ।

"ওরা আর কি বললো?"

"ওরা তোমাকে আমার জন্য স্নানের ঘর গরম করতে বলেছে?"

প্রাসকোভাইয়া সাভিশনা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তার স্বামীর দিকে তাকালো। কিন্তু স্বামীকে আবার প্রশ্ন করার সাহস হলো না তার "তা তো বটেই— আজ হলো শনিবার, আর জার্মানরা আবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে....।" প্রাসকোভাইয়া সাভিশনা তার বুটজোড়া টেনে পরে নিয়ে নদীর ধারের স্নান ঘর গরম করতে গেলো।

পিওতর ফিলিপোভিচ বেশ ভালো করে বাষ্প স্নান করলো, মনের আশ মিটিয়ে চা খেলো তারপর শুয়ে পড়লো। ভোর হবার আগেই সে বাড়ি থেকে যাত্রা করলো।

পার্টিজানরা, যাদের সম্পর্কে কলারে বিদ্যুতের ঝলক দেওয়া সুদর্শন জার্মানটি অত উদ্বিগ্ন হয়েছিল, সোজা গেল তাদের হেডকোয়াটার্স (সাময়িক কার্যকলাপেব কেন্দ্রীয় দপ্তর) মেদভেদোভকা গ্রামে। গ্রাম থেকে এমন কিছু একটা দূরে ছিল না, কিন্তু সেখানে পৌঁছানোটাই ছিল খুব কঠিন ব্যাপার: ফার গাছ ও এলডার গাছ, আরো অন্যান্য ঝোপঝাড়েব মধ্যে দিয়ে ছোট ছোট রাস্তা আর প্রায় অদৃশ্য সুঁড়িপথগুলো গিয়ে পড়েছিল একটা বিলের মধ্যে সেই বিলেব মাঝখানে একটা দ্বীপের মধ্যে ছিল তাদের হেডকোয়ার্টার্স; সেখানে পৌঁছাবার সব পথগুলোয রক্ষী প্রহরা ছিল, এই জঙ্গলের মধ্যে জার্মানরা ঢুকতে সাহস কবতো না। কোনো অচেনা লোক এর মধ্যে প্রবেশ করলে শুনতে পেতো কাছেই কোথায় একটা কাঠঠোকবা ঠকঠক করে গাছের গায়ে ঘা মারছে, তারপর দূরের কোন এক ডাকে সাড়া দিচ্ছে একটা কোকিল, আর তারপরই সাবা জঙ্গল জুড়ে জেগে উঠতো অদ্ভুত শব্দ— ঠকঠকানি, শিষ, কাকের ডাক, কুকুরের ঘেউ ঘেউ..। অচেনা লোক ভয় পেয়ে যেতো। সেদিন বাতাস ছিলনা, ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। পার্টিজানদের হেডকোয়ার্টস-এর বড় গোছের কোনো অভিযানের পরিকল্পনা ছিলনা। তিন কি চারজনের ছোট ছোট দল বরাবরের মতো বেরিযে পড়েছিল, কেউ গিয়েছিল প্রাথমিক নিরীক্ষার কাজে, অন্যেরা গিয়েছিল প্রধান সড়কে 'মাইন' (বিস্ফোরক ভরা আধার) পাততে। অন্ধকার হবার পর থেকে বিশেষ একটি দল সৈন্যবাহী ট্রেনের অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়েছিল। বাঁধের দুই ধার দিয়ে দিয়ে জার্মান রক্ষীরা তাদের দুই কিলোমিটার ব্যাপী প্রহরার এলাকায় টহল দিচ্ছিল, পার্টিজানদের পায়ের ছাপ দেখা যাবে বলে বাঁধের ওপর চুণ ছড়ানো ছিল; টহল দিতে দিতে রক্ষীরা চতুর্দিকে সতর্ক নিরুৎসাহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। তাদের থেকে দশ পা দূরে, গাছের ভাঙা ডালপালা চাপা দিয়ে একটি মেয়ে পর্যবেক্ষক ছোট একটা জলার ধারে নল-খাগড়ার মধ্যে শুয়েছিল; তার সঙ্গে ছিল একটা 'কারবাইন' (ছোট বন্দুক বিশেষ) আর হাঁসের ডিমের আকারের কালো কালো দুটি 'গ্রেনেড' (ছোটবোমা); আরো খানিকটা দূরে, বিরাট একটা

উপড়ে পড়া গাছের গুঁড়ির পিছনে বসেছিল একটি ছেলে ; ছেলেটি নিজের চোখে দেখেছে কেমন করে ধূসর — সবুজ ইউনিফর্ম (উর্দি) আর হেলমেট পরা জার্মান সৈন্যরা তার সমস্ত পরিবারকে — তার মা, ঠাকুমা আর ছোট ছোট বোনেদের — ঠেলে নিয়ে গিয়ে খড়ের মাচাওয়ালা একটা গোলাঘরে পুরে রাত্রে সেটাতে মশাল দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আর চিৎকারের মধ্যে সে তার মার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল। ছেলেটির মুখ পাণ্ডুর, অকালে বলি রেখা পড়েছে তাতে ; সেও কান পর্যন্ত টেনে হেলমেট পরা টহলদারী জার্মানটার ওপর থেকে তার দৃষ্টি সরাচ্ছিল না।

রক্ষীদের মধ্যে একজন, পার্টিজানদের মনোনীত জায়গা পার হয়ে যাবার পরই তুলো ভরা, শক্ত করে বেল্ট আঁটা জ্যাকেট পরা চটপটে একটি ছেলে সামনে টমিগান (লঘুভার কামান বিশেষ) বাগিয়ে ধরে এক লাফে রাস্তা পার হয়ে গেলো ; সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ছেলে ঝোপের মধ্যে থেকে ছুটে বেরিযে এসে ক্ষিপ্রগতিতে জটিল আর ভীতিপ্রদ একটা গোলা রেললাইনের নিচেয় বসাতে লাগলো।

বাঁকের মুখে হুস হুস করে এগিয়ে আসা ট্রেনটার প্রায় সম্পূর্ণটাই দেখা যাচ্ছিল ; ধোঁয়ার সাদা কুণ্ডুলী লম্বা লম্বা গাছের গুঁড়ির আর বার্চ গাছের বিক্ষিপ্ত সরু মরা ডালপালাগুলোর মধ্যে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাটিকে জড়িয়ে ধরছিল। চলমান চাকাগুলোর ওপর বিশাল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ, প্রকাণ্ড ইঞ্জিনটা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে এলো, রক্ষীরা পথ পরিস্কার আছে এই সংকেত দিয়ে খোয়া দেওয়া রেলপথ ছেড়ে নেমে দাঁড়ালো। ট্রেনের সামনে বিস্ফোরণের একটা ভীষণ শব্দ শোনা গেলো, বালির বিরাট একটা স্তম্ভ আকাশের দিকে উঠে গেলো, আর তীক্ষ্ণ শিষের মতো আওয়াজ করা টুকরোগুলোর সাথে রেল লাইনের একটা অংশ পাশে উড়ে পড়লো ; গতির সম্পূর্ণ বেগ নিয়ে ইঞ্জিনটা তার সমস্ত বাঁধন ছিড়ে ফেললো ; হুড়মুড় করে কামরাগুলো একটার ওপর একটা গিয়ে জড়ো হয়ে উলটে পড়লো, তারপর ঢাল বেয়ে নিচে গড়িয়ে গেলো। তাদের মধ্যে থেকে বিশৃঙ্খলভাবে ঠেলাঠেলি করে চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এলো ছোটো ছোটো ধূসর-সবুজ মূর্তিগুলো ···।

এই ধরনের কাজ ছাড়াও সেদিন সকালে পার্টিজানদের আরো অনেক কিছু করার ছিল। চীফ অফ স্টাফ (সেনাপতির সাহায্যকারী সেনানীদের মধ্যে-প্রধান) ইয়েভভিউকোভ একজন অতিথির সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করছিল — অতিথি ছিল 'মাউন্টেড স্কাউট'দের (যে কোনো ধরনের যানবাহী খবর সংগ্রহকারী দল) নায়ক ইভান সুদাবেস্ত। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে 'কামোফ্লাজ' করা (শত্রুকে প্রভাবিত করার জন্য ডালপালা ইত্যাদি দিয়ে লুকিয়ে রাখা) "ডাগ আউট" (পরিখার মধ্যে সৈনিকদের জন্য ছাতওয়ালা আশ্রয়স্থল)এর কাছে একটা ভূতলশায়ী পাইন গাছের ওপর বসে তারা খালি টিনে করে ফরাসী 'শ্যাম্পেন' (উৎকৃষ্ট এক মদ) খাচ্ছিল, ফরাসী দেশীয় এই শ্যাম্পেনকে পুশকিন খুবই সুখ্যাতি করেছেন। স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় দুজনেরই পুরনো আঘাতের জায়গাগুলি ব্যথা করছিল, ইয়েভতিউকোভ বলছিল শত্রুর পরিকল্পনা আর জার্মানদের পশ্চাদভাগের সৈন্যদের মধ্যে কি হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোনো খবর না পাওয়ার দরুন নানা অসুবিধা ও জটিলতার কথা।

"আমাদের প্রয়োজন ভেতরের একজন স্কাউটের কিন্তু তেমন লোক পাই কোথায় ? আমার এখন সেইটাই চিন্তা।"

"তোমার পক্ষে সেটা নিয়ে চিন্তা করা খুবই সঙ্গত", ইভান সুদাররেভ বিজ্ঞের মতো বললো, হালকা পানীয়ের অবশিষ্ট অংশটুকু ঝেড়ে ফেলে দিলো সে। "ভেতরের খবর ছাড়া তোমার অবস্থা হচ্ছে একজন সাহসী লোকের চোখ বেঁধে যুদ্ধ করার মতো, আর সেটা নেহাতই অসম্ভব।"

এইসব কথাবার্তার মধ্যে ফারগাছের বৃষ্টিভারাক্রান্ত শাখাগুলো নড়তে লাগলো আর ঝর ঝর করে এক পশলা বৃষ্টির জল ঝরে পড়লো, ভিজা টিউনিক, খাটো স্কার্ট আর বড় বড় বুট পরা দুটি মেয়ে এসে উদয় হলো। সঙীন-আঁটা রাইফেল হাতে, তারা পিওতর ফিলিপোভিচকে ধরে নিয়ে এলো। সুতীর রুমাল দিয়ে চোখ তার বাঁধা, আর সামনের দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে চলছিল সে। একে অপরকে বাধা দিয়ে নিজেদের দোষ মোচন করে, মেয়ে দুটি কি করে ঐ লোকটিকে তিন কিলোমিটার দূরে ধরেছে তারই বিবরণ দিচ্ছিল ; সে যে কি করে রক্ষীদের এড়িয়ে চলে এসেছে সেটাই তারা বুঝে উঠতে পারছিল না।

"ও হচ্ছে একটি বাস্তু ঘুঘু", ইভান সুদারেভ চিফ অফ স্টাফকে বললো। "মেদভেদোভকাতে একবার ওর বাড়িতে এক রাত কাটিয়েছিলাম। বেশ চালাকচতুর লোক। এখন ও কি বলবে তাই ভাবছি।"

পিওতর ফিলিপোভিচ এর চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হলো, আর মেয়ে দুটি রাইফেল কাঁধে করে, অনিচ্ছাভাবে সরে দাঁড়ালো। পিওতর ফিলিপোভিচ মাথা তুললো, কুয়াশা ঢাকা গাছের মাথাগুলোর দিকে তাকিয়ে, নিঃশ্বাস ফেলে বললো ঃ

"ঠিক এইখানেই আমি আসতে চাইছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার প্রয়োজন আছে।"

"আমার সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন থাকতে পারে সেইটাই আমি জানতে জানতে চাই" ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিফ অফ স্টাফ উত্তর দিলো।" জার্মানরা কি তোমাকে জ্বালাচ্ছে ?"

"বরং উলটোটাই হচ্ছে, জার্মানরা আমাকে মোটেই জ্বালাচ্ছে না। আসলে ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য আমি দশ বছরের সাজা ভোগ করেছি।"

"গরশকো, তুমি অনাহুতভাবে এখানে এসে পৌছতে পেরেছো বটে, এখান থেকে ফিরে যাওয়া কিন্তু কঠিন হবে সেটা কি তুমি জানো ?"

"সেটা নিশ্চয় জানি। আমি মরবো জেনেই এসেছি।"

চিফ অফ স্টাফ ইভান সুদায়েভ এর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে গুঁড়ির ওপর সরে বসলো।

"বসো, গরশকোভ, তাহলে কথা বলার সুবিধা হবে। আত্মহত্যা করার এমন জটিল উপায় বেছে নিলে কেন ?"

পিওতর ফিলিপোভিচ বসে পড়ে হাতদুটো তার পেটের ওপর রাখলো।

"হ্যাঁ, তোমরা হয়তো আমাকে বিশ্বাস করবে না একথা আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। গতকাল ওরা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ছিল, বুঝেছো, আর আমাকে বার্গোমাস্টারের পদ দিতে চেয়েছে। জার্মানরা পারস্পরিক দায়িত্বে বিশ্বাস করে, তাই আমাকে ওরা একটা অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে চায় : সোমবার তোমাদের দুজন পার্টিজানের ফাঁসির সময় আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে…।"

ইয়েভতিউকোভ গুঁড়ির ওপর থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

"উঃ, শয়তান কোথাকার।"

পিওতর ফিলিপোভিচ-এর সামনে দাঁড়িয়ে তার দুর্ভেদ্য চোখের দৃষ্টি ভেদ করার প্রয়াসে ওর ভুরুগুলো বেঁকে গেলো।

"বসো এখন, ওসব করার অনেক সময় পাবে", ইভান সুদানেভ তাকে বললো। "বলে যাও, গরশকোভ, আমরা শুনছি।"

"প্রথমে, এই কথাটাই তোমাকে বলতে চাই : আমি সত্যই একজন ধ্বংসকারী ছিলাম, আর আমার উচিত সাজাই হয়েছিল। আমি কোনো সংগঠনের মধ্যে ছিলাম না। সে ব্যাপারে আমাকে মিথ্যাভাবে জড়ানো হয়েছিল। কিন্তু আমার রাগ হযেছিল, সেটাই সব …। আমি বিশ্বাস করিনি যে আমার ছেলেমেয়েরা ভালোভাবে বাঁচবে, প্রাচুর্যের মধ্যে, সুখী হয়ে …। আর আমি বুড়ো হয়ে যখন মরবো তখন শান্তিতে মরব, মানুষকে ক্ষমা করে মরবো, যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি ভাবে …। আর রুশ দেশের মাটিতে আমাকে সসম্মানে কবর দেওয়া হবে ‥। আমার মনে ক্ষমার লেশমাত্র ছিল না …। তারপর আমি একজন কৃষিবিদ এর সঙ্গে জুটে গেলাম। সে আমাকে খানিকটা গুঁড়ো দিয়েছিল …। আমি অনেক চিন্তা করলাম — গোরু আমাদের খাদ্য যোগায়, ঘোড়াও তাই — তাদের দোষ কি ? সেই গুঁড়োগুলো আমি ফেলে দিলাম ; সে অপবাধে আমি অপরাধী নই। কিন্তু সেই কৃষিবিদ ধরা পড়ে, আর তাকে প্রশ্ন করার সময় সে আমার কথা বলে …। কিন্তু রাগের বশে আমি চুপ করে ছিলাম। ঠিক আছে, আমাকে নির্বাসন দাও …।"

"এ এক অসাধারণ কাহিনী", চিফ অফ স্টাফ বললো, তখনও সে শান্ত হয়নি।

"অসাধারণ কেন ? একজন রুশীয় তো আর একজন সাধারণ মানুষ নয়, একজন রুশীয় হচ্ছে সাচ্চা মানুষ। ক্যাম্পে (বন্দী শিবিরগুলোয়) দশ বছর ধরে আমি কাজ করেছি — এসব নিয়ে কিছু কিছু চিন্তা-ভাবনা কি আর করিনি ? তাহলে, পিওতর গরশকোভ তুমি কষ্ট পাচ্ছো …। ওহো, আমাকে ক্ষমা কোরো,আমি শুধু আমাদের বাড়ির কথা যোগ করবো, টিনের ছাদওয়ালা আমার পৈত্রিক বাড়ি — প্রাসকোভাইয়া সাভিশনা সেটা নিয়ে চিন্তা করে কিন্তু আমি করি না ; অনেকদিন আগেই চিন্তার মৃত্যু হয়েছে …। তবে কোন সত্যের জন্য তুমি কষ্ট পাচ্ছো ? আমাদের ক্যাম্প থেকে খুব একটা দূরে নয়, পুস্তোজেরস্ক শহরে, জার আলেক্সি মিখাইলোভিচ-এর শাসনকালে, 'আর্চ প্রিস্ট' (প্রধান পুরোহিত) আভাকুম একটা গর্তের মধ্যে বসে

থাকতো। তাকে চুপ করাতে পারেনি বলে ওরা তার জিভ কেটে দিয়েছিল ; জিভ কাটা অবস্থায় গর্তের মধ্যে বসে বসে সে রুশীয় জনসাধারণকে উদ্দেশ করে আবেদনপত্র লিখতো, তাদের সত্য পথে চলবার জন্য, এমনকি সত্যির জন্য আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহ্বান ···। আভাকুমের রচনাবলী সব আমি পড়েছি। সে সময়কার সত্য ছিল একরকম, আর আজকের সত্য অন্যরকম — কিন্তু সত্য তো বটে ···। আর সত্য হলো রুশ দেশের মাটি।"

"ওর কথাগুলো বেশ বিশ্বাসযোগ্য", ইভান সুদায়েভ চিফ অফ স্টাফকে বললো। "বলে যাও গরশকোভ, আসল কাজের কথায় এসো।"

"তাড়াহুড়ো কোরো না — আমরা কাজের কথাতেও আসবো। গতকাল একজন জার্মান — একজন অফিসার আমাকে বলছিল তার কুকুর খুব বুদ্ধিমান আর প্রয়োজনীয় জানোয়ার, সে আরো বলেছিল, রুশীয়দের সম্বন্ধে সে কথা অবশ্য সে বলতে পারে না। জার্মানরা আমাদের ঠাট্টা করছে — অ্যাঁ?" পিওতর ফিলিপোভিচ হঠাৎ ভ্রুকুঁচকানো বন্ধ করে গোল গোল বর্ণহীন ভারী চোখে তার শ্রোতাদের দিকে তাকালো। "ওরা রুশীয জনগণকে ঠাট্টা করছে ; ঐ চলেছে, স্নান করে না, চুল আঁচড়ায় না, একেবারে নিরেট মূর্খ — ওটাকে পিটিয়ে মারো! গতকাল আর একজন অফিসার — রাস্তার ওপর, সকলের সামনে — বিশ্রীভাবে ছোট্ট আনিউত্কা কিসেলেভার গায়ে হাত দিচ্ছিল, অমন লক্ষ্মী মেয়েটা, লোকটা তার জামা তুলে ধরেই একেবারে হাঁপাতে লাগলো। এসব কি? এটা কি খ্রীষ্ট শত্রুর আগমনেব সূচনা? এই কি রুশ দেশের বিনাশ? আমাদের নিয়ে হতভাগা জার্মানদের মস্করা বন্ধ করার জন্য সোভিয়েত শক্তি জনগণকে অস্ত্র দিয়েছে আর তাদের সমর অভিযানে পরিচালিত করছে। কমরেডগণ, তোমরা সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছো, সেইজন্য তোমাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সোভিয়েত শক্তি আমাদের, রুশীয়দের, কৃষকদের। আমার ব্যক্তিগত আক্রোশের কথা আমি অনেকদিন আগেই ভুলে গেছি।"

পিওতর ফিলিপোভিচ ঝুঁকে পড়ে কনুই দুটো তার হাঁটুর ওপর রাখলো তারপর হাতের তেলো দিয়ে তার কারাকুল টুপিটা টেনে নামিয়ে কপাল ঢাকলো।

"এবার — তোমরা ঠিক করো। জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমাকে গুলি করে মারো। আমি প্রস্তুত — শুধু, ভগবান, ব্যথা লাগবে খুব ···। আর নয়তো আমার কথা শোনো। আমি কি করতে চাই বলছি : ওদের সম্বন্ধে সব খবর তোমাদের দিতে চাই ; আমি সব জানতে পারবো, আমি ওদের সেনা বাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স-এ ঢুকবো — আমার অনেক ফন্দী-ফিকির জানা আছে। বেশ সাহস করে কাজ করবো। মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না, আর দৈহিক উৎপীড়ন আমাকে আতঙ্কিত করে না!"

ইভান সুদায়েভ আর 'চিফ অফ স্টাফ' ইযেভতিউকোভ "ডাগ আউট"-এর মধ্যে চলে গেলো, সেখানে তাদের একটু তর্কাতর্কিও হলো। একদিকে যেমন এই ধরনের লোককে বিশ্বাস করাও কঠিন আবার অপর দিকে তার এই প্রস্তাবের সুযোগ না নেওয়াটাও নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। ওরা "ডাগ আউট" থেকে বেরিয়ে এলো, পিওতর

ফিলিপোভিচ কিন্তু ঐ গুঁড়ির ওপর বসেই রইলো, ইয়েভিতিউকোভ কঠিনভাবে বললো :

"তোমাকে আমরা বিশ্বাস করবো ঠিক করেছি যদি তুমি আমাদের ছলনা করো — আমরা তোমাকে নরক থেকেও খুঁজে বার করবো।"

পিওতর ফিলিপোভিচ এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে টুপি খুলে অভিবাদন করলো।

"এখন আমি খুশি", সে বললো। "খুবই খুশি। যেখানে বলবে সেখানে তোমাদের আমি খবর পাঠাবো, আমার মেয়েকে দিয়ে। আমার ছেলেটা দুর্বল প্রকৃতির — তার মার স্বভাব পেয়েছে। কিন্তু আমার মেয়ে আনা হয়েছে আমার মতো — গম্ভীর, গোপনতাপ্রিয়।"

পিওতর ফিলিপোভিচ এর চোখ বেঁধে দেওয়া হলো আর ঐ মেয়ে দুটিই ওকে নিয়ে গেলো।

সোমবারের ভোর সেই একই স্যাঁৎসেঁতে বিষণ্ণ দিন, জার্মান সৈনিকরা অচেনা ভাষায় চিৎকার করে কি বলতে বলতে আর গ্রাম সোভিয়েত-এর দিকে নির্দেশ করতে করতে গ্রামের অধিবাসীদের তাড়িয়ে রাস্তায় বার করে নিয়ে আসতে লাগলো। ছোট একটা খোলা জায়গায়, যেখানে অল্প কিছুদিন আগেও লেনিনের মূর্তি বসানো বাগান ছিল, জার্মানরা মূর্তিটা টেনে নামিয়ে ভেঙে ফেলে দিয়েছিল, সেখানে এখন আড়াভাবে একটা কাঠ রাখা হয়েছে। ফাঁস বাঁধা দুটো সরু সরু দড়ি ঝুলছিল সেটা থেকে।

ইতিমধ্যে সকলেই জানতে পেরেছিল ইয়াং কমিউনিস্ট লীগ-এর সদস্য আলেক্সি স্তিরিদোভ, কয়েকদিন আগে জার্মানরা যাকে গ্রামের কাছের হেজেল ঝোপের পাশে জখম করেছিল, তাকে আর মেদভেদোভকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকা, ক্লাভাদিয়া উশাকোভা, আলেক্সি স্তিরিদোভকে নিরাপদ স্থানে বয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করার জন্য যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাকে ওরা ফাঁসি দেবে।

শহরের কসাইখানায় যেন গোরু ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এমনিভাবে চিবুক দিয়ে নির্দেশ করতে করতে সৈনিকরা জনসাধারণকে আড়াআড়িভাবে রাখা কাঠের কাছে ঠেলে নিয়ে চললো। বৃষ্টির জল ঝরঝরিয়ে তাদের স্টীলের হেলমেট বেয়ে, মহিলাদের রেখাঙ্কিত মুখ বেয়ে, শিশুদের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। পায়ের নিচের কাদা গব্ গব্ শব্দে বুড়বুড়ি কাটতে লাগলো। আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিল না, শোনা যাচ্ছিল শুধু সঙীনের খোঁচা খাওয়া গ্রামবাসীদের কলরব।

একটা ট্রাক এলো। তার ওপর দাঁড়িয়ে মরা মানুষের মতো ফ্যাকাশে, অনাবৃত মাথা শিক্ষিকা, তার কালোরঙের কোটের বোতামগুলো সব খোলা, হাতদুটো তার পিছনে বাঁধা। অর্ধমৃত স্তিরিদোভ তার পায়ের কাছে বসে। ও ছিল এক তেজস্বী, মানুষের মনে বিশ্বাস জাগানো ছেলে, গ্রামের সকলেই তাকে খুব পছন্দ করতো। দৈহিক উৎপীড়নের পর তার মধ্যে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না, ময়দার বস্তার মতো

পড়েছিল। ট্রাকের পিছনে আসছিল দুজন অফিসার : চশমাপরা লম্বা জার্মান, একটা ক্যামেরা তার সঙ্গে আর সুদর্শন সেই লোকটি। রুশীয়দের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে তারা বেশ আত্মতৃপ্তির হাসি হাসছিল।

ট্রাকটা এগিয়ে এসে ঘুরে পিছু হটে আড়াআড়িভাবে রাখা কাঠটার তলায় এসে দাঁড়ালো। ট্রাক থেকে দুজন সৈনিক লাফিয়ে নেমে পড়লো। এইবার ক্লাভাদিয়া উশাকোভা যেন অবুঝ বিস্ময়ে বড় বড় করে চোখ খুলে চিৎকার করে বললো, গলার স্বর যদিও বেশি উঁচুতে উঠলো না ঃ

"কমরেডগণ, আমি আজ মরতে চলেছি, জার্মানদের নিশ্চিহ্ন করে দাও, তোমরা প্রতিজ্ঞা করো তাদের নিশ্চিহ্ন করবে ...।"

একজন সৈনিক তার হাতের তেলো দিয়ে তার মুখ চাপা দিলো আর সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি করে ওর শীর্ণ শিশু সুলভ গলায় কোনো রকমে ফাঁস পরিয়ে টান দিলো। বসে থাকা অবস্থায় আলেক্সি স্তিরিদোভ ভাঙ্গা গলায়, হৃদয় বিদারক একটা চিৎকার দিলো ঃ

"কমরেডগণ, জার্মানদের বধ করো ...।"

অন্য সৈনিকটি তার মাথায় আঘাত করে তারও গলায় ফাঁসের দড়িতে টান দিলো।

ভিড়ের মধ্যেকার মানুষের কান্নার রোল ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে লাগলো। ট্রাকটা একটা ঝাঁকি মেরে হঠাৎ সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। ক্লাভিদিয়া উশাকোভার পা-দুটোও সামনের দিকে এগিয়ে গেলো, তার দেহটা, যেন পড়ে যাচ্ছে এমনিভাবে পিছনের দিকে ঝুলে পড়লো তারপর ট্রাক থেকে মুক্ত হয়ে ঝুলতে লাগলো। ঐ সরু দড়িতে সেই প্রথম ঝুলে পড়লো, তার অনাবৃত মাথাটা কাঁধের ওপরে ঝুঁকে পড়লো, চোখ-দুটো বুঁজে গেলো ...।

বার্গো মাস্টার পিওতর ফিলিপোভিচ, ট্রাকটা যেখানে ছিল, ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো। ভিড়ের মানুষ আতঙ্কে শিউরে উঠে দেখলো সে তার টুপি খুলে সারা দেহে ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করলো।

ফাঁসির কয়েক দিন পরে এক সন্ধ্যায় 'চিফ অফ স্টাফ' নির্দিষ্ট জায়গায়, একটা খাতের মধ্যেকার ছোট ছোট ওক গাছের ঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে, গরশকোভ-এর মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। গরশকোভ নিজেই এলো। তার দিকে তাকিয়ে 'চিফ অফ স্টাফ'-এর আপাদমস্তক কেঁপে উঠলো। কিন্তু গরশকোভ শুধুমাত্র উবু হয়ে বসে পড়ে শান্তকণ্ঠে ফাঁসির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে লাগলো।

"লোকে বুঝতে পারলো মহান শহীদ, মহাপুরুষ সব পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো। তাদের শেষ সংগ্রামী কথাগুলো এখনও সকলের কানে বাজছে। আর খবর, এই নাও...।"

তারপর সে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ খবর দিতে লাগলো যেসব খবরের কথা 'চিফ অফ স্টাফ' স্বপ্নেও কখনো কল্পনা করতে পারেনি। অনেকক্ষণ সে হাঁ করে গরশকোভ-এর দিকে তাকিয়ে রইলো।

"ভালো, তবে তুমি যদি মিথ্যে বলে থাকো ... !"

উত্তরে পিওতর ফিলিপোভিচ দু-হাতের তেলো চিৎ করে হাসলো ; তার টুপির ভেতর থেকে সে একটা ম্যাপ বার করলো যার মধ্যে জার্মানদের পেট্রোল ও গোলাবারুদের গুদামগুলো ক্রশ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করে আছে।

"আর ম্যাপ তুমি আঁকবে না", ইয়েভ্‌তিউকোভ কাগজের টুকরোটা পকেটে পুরতে পুরতে তাকে বললো, "আমি তোমায় ধরে মানা করছি। সব কিছু মাথার মধ্যে রাখবে — কিন্তু কোনো কাগজপত্রে নয়! তুমি নিজে আর এখানে আসবে না। তোমার মেয়েকে পাঠাবে।"

গরশকোভ-এর খবর নির্ভুল বলে প্রমাণিত হলো। জার্মানদের গুদামগুলো একেব পর এক আকাশচুম্বী বিস্ফোরণে উড়ে গেলো। ফ্যাকাশে, গম্ভীর মুখখানা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় চুপিসাড়ে খাতের মধ্যে আসতে লাগলো প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় খবর নিয়ে। একদিন সে তার অপ্রসন্ন নির্লিপ্ত স্বরে বললো ঃ

"বাবা তোমাদের বলতে বলেছে ওরা নতুন টমিগান (লঘুভার কামান বিশেষ) পেয়েছে আর বাবার কাছে গুদোমের চাবি আছে। তোমরাই প্রথম সেগুলো পাবে। আসছেকাল রাত্রে এসো, কিন্তু বাবা বলে দিয়েছে কোনো মতেই তোমরা কোনো রক্ষীর ওপর গুলি চালাবে না, শুধু মাত্র ছোরা ব্যবহার করবে।"

পিওতর ফিলিপোভিচ বেশ সাহসের সঙ্গে স্পর্দ্ধাভরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। সে যেন জার্মানদের ঠাট্টা করছিল, যেন দেখাতে চাইছিল একজন রুশীয় হচ্ছে সত্য সত্যই কৌশলে গড়া একজন মানুষ, সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জার্মান বুদ্ধির পক্ষে স্থির, উদ্দীপিত, তীক্ষ্ণধার রুশীয় বুদ্ধি, যে বেশির ভাগ সময়, নিজের সুপ্ত শক্তির পরিধিই জানে না, তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়া সম্ভব নয়।

তারা যে একজন উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন লোককে খুঁজে পেয়েছে, যে আবার কুকুরের মতোই প্রভুভক্ত, সে সম্বন্ধে দুজন অফিসারই একেবারে দৃঢ়প্রত্যয়। তারা সদা সর্বদা আতঙ্কের মধ্যে বাস করতো। তাদের নাকের তলা দিয়ে সেনাবাহিনীর গুদামগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেলো আর ট্রেনগুলো ভেঙ্গে চুরমার হলো — বিশেষ করে আবার সেই ট্রেনগুলো, যেগুলো সেনাবাহিনী অথবা বিশেষ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মাল বয়ে নিয়ে আসছিল ; একটা নিদর্শন হিসাবে বলা যেতে পারে ওয়ার্স থেকে বগিভর্তি করে পাঠানো রাইফেল, টমিগান আর রিভলবারগুলোর বেশির ভাগই যে ইতিমধ্যেই উধাও হয়ে গেছে, আর বালিভর্তি করা সাবধানে বন্ধ করা বাক্সগুলো মেদভেদোভকা থেকে যে জাহাজে করে রণাঙ্গনে চলে গেছে এটা কখনোই তাদের মাথায় আসতো না। 'থর' এর বিদ্যুৎ ঝলকের চিহ্ন দেওয়া কলারওয়ালা অফিসারটি স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে এক অন্ধকার রাত্রে তার বাড়ি আক্রান্ত হবার উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো চিহ্নিত করা ম্যাপভরা তার 'ডেসপ্যাচ কেসটা' (সামরিক বিষয় সংক্রান্ত সরকারি কাগজপত্র রাখার বাক্স) কয়েক ঘণ্টার জন্য চুরি করা। সে নিজে অবশ্য রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল, শুধুমাত্র আতঙ্ক ভোগ করা ছাড়া আরো গুরুতর

কিছু তার ঘটেনি, মাঝরাত্রে যখন জানলার কাঁচ ভেঙ্গে কি একটা ঘরের মধ্যে পড়ে এমনভাবে বিস্ফারিত হলো যে তখন যদি সে, নিচু একটা খাটে শুয়ে না থাকতো তাহলে অঘটন কিছু একটা ঘটে যেতো। লাফিয়ে উঠে আণ্ডার ওয়ারে (খাটো অন্তর্বাস) পরা অবস্থাতেই সে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিল। সারা গ্রামে শোরগোল ছড়িয়ে পড়লো। — সৈনিকরা তাদের যে যার কুটির ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলো 'পার্টিজান' বলে চিৎকার করতে করতে, আর অন্ধকারের মধ্যে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। অফিসারদের গাড়ি বারান্দার কাছে দুজন রক্ষী গলাকাটা অবস্থায় পড়েছিল। সকালের আগে সে বুঝতেই পারেনি যে তার 'ডেসপ্যাচ কেস'টা হারিয়ে গেছে। পরে পিওতর ফিলিপোভিচ একটা ছোট স্যুটকেস আর কাদামাখা একটা ইউনিফর্মের সঙ্গে ওটা নিয়ে এলো — ওগুলো সে অদূরের সব্জীক্ষেত থেকে পেয়েছে ; মনে হয় পার্টিজানরা পালিয়ে যাবার সময় ওগুলো ওখানে ফেলে গেছে।

পিওতর ফিলিপোভিচ-এর বার্গোমাস্টারগিরির দরুন জার্মানদের বেশ মূল্য দিতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়লো — খুবই সামান্য একটা ব্যাপারে, অথবা বলা যেতে পারে জার্মানদের প্রতি তার অপরিসীম ক্রোধের জন্য। একটা রাবার স্ট্যাম্প আর একটা নাম-ঠিকানা ছাপা চিঠির কাগজ চুরি করে সে তারপর গুদাম থেকে একটা জার্মান টাইপ রাইটার নিয়ে গিয়েছিল স্তারাইয়াবুদা গ্রামে, সেখানে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ কোজুবস্কির পার্টিজানবাহিনী খুব তৎপর। স্কুলের পরিচালক তাকে শহরে আর সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্সে প্রবেশ করার জন্য জার্মান ভাষায় এক প্রবেশপত্র লিখে দেয়। যদিও ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ জার্মান ভাষা ভালোই জানতো তবু বিভক্তির ব্যাপারে সে একটা ভুল করে ফেলেছিল। তাতেই গরশকোভ-এর সর্বনাশ হলো। তাকে আটক করা হলো আর জাল প্রবেশপত্রের সঙ্গে তাকে মেদভেদোভকায় ফেরত পাঠানো হলো। লম্বা অথবা সুদর্শন অফিসারদের কেউই এমন সীমাহীন রুশীয় বিশ্বাসঘাতকতা উপলব্ধি করতে পারছিল না, কিন্তু পরে তারা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলো : এবার সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেলো …।

এটা এমন সময় ঘটে যখন লালসৈন্যরা জার্মান রণাঙ্গনের একাংশ ভেদ করে জার্মানদের গ্রাম আর উপগ্রামগুলো থেকে বিতাড়িত করছিল। পার্টিজানরাই প্রথমে এসে মেদভেদোভকায় প্রবেশ করে ও দখল করে। রাস্তায় ইয়েভতিউকোভকে আনা এসে ধরলো ; মেয়েটির মাথার চুল কাদায় জমাট বেঁধে গেছে, জটা পড়া ; মুখটা তার শুকনো, ধুলো মাখা, বয়সের ছাপ পড়েছে যেন ; জামাটা হাঁটুর কাছে ছেঁড়া।

"তুমি কি আমার বাবাকে খুঁজছো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার কি হয়েছে?"

"জার্মানরা আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, আমার মাকে আর ভাইকে মেরে ফেলেছে। চারদিন ধরে আবার বাবার ওপর অত্যাচার চালিয়েছে ; সে এখনও জ্যান্ত অবস্থায় ঝুলছে, এসো শিগ্গির।"

যেন কিছুর ঘোরে চলেছে এমনিভাবে আনা ইয়েভতিউকোভকে টিনের ছাদওয়ালা

গরশকোভের পূর্বতন বাড়িতে নিয়ে এলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে বহু কষ্টে কোনো রকমে মুখ খুলে বললো ঃ

"অন্য কিছু ভেবে বোসো না যেন — আমার বাবা ওদের একটা কথাও বলেনি।"

গরশকোভ-এর পরনে শুধু একটা আন্ডারওয়ার, গোয়ালের চালের একটা কড়িকাঠ থেকে ঝুলছিল সে ঃ তার পাদুটো নীলবর্ণের, শিথিল হয়ে গেছে ; তার ঝুলন্ত দেহ দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া দাগে ভরা। তার হাত দুটো পিছনের দিকে মোচড়ানো, পাঁজরাগুলো সব বেরিয়ে আছে, তার ডান বুকে একটা হুক গাঁথা রয়েছে, একটা পাঁজরায় ভর করে সে কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে …।

একটি গানের জন্ম

ম্যাক্সিম গোর্কি

গ্রীষ্মের একটা দিনে গির্জার ঘণ্টাগুলোর শোকার্ত ধ্বনির সহযোগে দুটি রমণী এইভাবে একটি গান রচনা করেছিল। আরজামাস-এর নির্জন এক রাস্তায়, সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে, আমি যে বাড়িতে বাস করতাম তারই সামনের এক বেঞ্চিতে বসে। জুন মাসের একটা দিনের গুমোট নিস্তব্ধতার মধ্যে সারা শহর যেন ঝিমোচ্ছিল। জানলার ধারে একটা বই নিয়ে বসে আমি আমার প্রতিবেশী, গ্রামের প্রধানের পরিচারিকার সঙ্গে মোটাসোটা গোলগাল, মুখে বসন্তের দাগওয়ালা আমার রাঁধুনী উস্তিনাইয়ার মৃদু কণ্ঠের কথপোকথন শুনছিলাম।

"আর কি লেখে তারা?" পুরুষালি কিন্তু অত্যন্ত নমনীয় কণ্ঠে প্রশ্ন করলো সে।

"নাঃ, আর কিছু নয়," পরিচারিকাটি মৃদুকণ্ঠে, চিন্তান্বিত বিষণ্ণতার সঙ্গে টেনে টেনে উত্তর দিলো। মেয়েটির গায়ের রঙ অতটা উজ্জ্বল নয়, কৃশতনু, ছোট ছোট, স্থির সন্ত্রস্ত চোখদুটি।

"আর অতএব... আমাদের শুভেচ্ছা জেনো আর আমাদের টাকা পাঠিও — তাই নয় কি?"

"হ্যাঁ তাই...!"

"আর তুমি কি ভাবে আছো — তাই নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়? এ্যাঁ!"

আমাদের রাস্তার পিছনের বাগানগুলোর পুকুরে ব্যাঙ ডাকছিল কাঁচের মতো অদ্ভুত একটা ঝনঝন শব্দ করে। গির্জার ঘণ্টাগুলোর ধ্বনি বিরক্তিকর অবিচলতার সঙ্গে ভেসে আসছিল, গুমোট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। কোথায় কার পিছনের উঠোনে একটা করাত খ্যাঁস খ্যাঁস শব্দ করছিল, মনে হচ্ছিল আমার প্রতিবেশীর পুরোনো বাড়িটা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, আর গরমে হাঁস ফাঁস করতে করতে নাসিকা ধ্বনি করছে।

"আত্মীয়স্বজন," ক্রোধ মিশ্রিত বিষণ্ণ সুরে বললো উস্তিনাইয়া। "কিন্তু তাদের থেকে তিন ভেরসট (রুশীয় দৈর্ঘ্যের মাপ বিশেষ) দূরে গিয়েছো কি মনে হবে তুমি যেন একটা গাছ থেকে ভাঙা ছোট্ট একটা ডাল! শহরে এসে প্রথম বছর আমারও

তাই হয়েছিল। বাড়ির জন্য ভীষণ মন কেমন করছিল। মনে হচ্ছিল আমি যেন পুরোপুরি বেঁচে নেই; যেন আমার আধখানা রয়েছে এখানে আর আধখানা পড়ে রয়েছে গ্রামে। দিনরাত আমি ভাবতাম আর দুশ্চিন্তা করতাম : কেমন করে চলছে তাদের?"

গির্জার ঘণ্টাগুলো যেন তার কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গত করছিল, মনে হলো সে যেন ইচ্ছা করেই ঘণ্টাগুলো যে স্বরগ্রামে বাজছে, তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা বলছে। পরিচারিকাটি দুই হাত দিয়ে তার হাড় বার করা হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে, তার সাদা রুমাল বাঁধা মাথাটা এপাশ থেকে ওপাশে নাড়ছিল আর ঠোঁট কামড়াচ্ছিল, মনে হচ্ছিল সে যেন একমনে অনেক দূরের কোনো কিছু শুনছে। উস্তিনাইয়ার ভবাট কণ্ঠ কখনো সঘৃণ আর ক্রুদ্ধ আবার কখনো কোমল আর বিষণ্ণ শোনাচ্ছিল।

"কখনো কখনো আমার গ্রামের জন্য এমন সাংঘাতিক মন কেমন করে যে আমার চারপাশে কি হচ্ছে তা দেখতেও পাইনা, শুনতেও পাইনা। অথচ সেখানে আমার কেউ নেই। বাড়িতে আগুন লাগলে বাবা পুড়ে মারা যায়। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ছিল তখন। আমার কাকা মারা গেছে কলেরায়। আমার দুই ভাই, একজন কিন্তু সৈন্যবাহিনীতেই রয়ে গেছে — কর্পোরাল হয়ে গেছে সে; আর একজন রাজমিস্ত্রি, সে থাকে বয়গরোভস্ত্র। মনে হয় তারা যেন সব বন্যায় ভেসে গেছে...।"

ভয়ঙ্কর রঙের সূর্য, পশ্চিমে অস্ত যেতে যেতে কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের গায়ে সোনালি কিরণরেখাগুলোর থেকে ঝুলে রয়েছে। রমণীটির মৃদু কণ্ঠস্বর, ঘণ্টাগুলোর ঢং ঢং শব্দ আর ব্যাঙগুলোর কাঁচের মত ঝনঝনে ডাকই শুধু সেই বিশেষ মুহূর্তটিতে শহরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল। আসন্ন বর্ষণের আগে স্যোয়ালো পাখিরা যেমন নিচু হয়ে মাটির ওপর দিয়ে হালকাভাবে উড়ে যায় ঠিক তেমনি করে তারা ভেসে চলছিল; তাদের ঊর্ধ্বে আর চতুর্দিকে মৃত্যুর মতো সর্বগ্রাসী নীরবতা বিরাজ করছিল।

একটা অদ্ভুত ধারণা আমার মাথায় ঢুকলো। মনে হলো শহরটাকে যেন কাত করে শোয়ানো বড় একটা বোতলের মধ্যে পুরে দিয়ে জলন্ত একটা ছিপি দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আর কে যেন বাইরে থেকে তপ্ত কাঁচের ওপর অলসভাবে আস্তে আস্তে বাড়ি মারছে।

উস্তিনাইয়া হঠাৎ উৎফুল্ল হয় কিন্তু বেশ কাজের লোকের মতো বললো :

"এবার, মাশুৎকা, আমাকে একটু সাহায্য করতো...।"

"কিসে সাহায্য করবো?"

"একটা গান বাঁধতে।"

বেশ জোরে একটা শ্বাস ফেলে উস্তিনাইয়া দ্রুতলয়ে গাইতে আরম্ভ করলো :

দিনে সূর্য যখন ঝকঝকে আলো দেয় আর রাতের চাঁদের আলোয়...

ইতঃস্তত করে সুরটা ধরে নিয়ে, পরিচারিকাটি মৃদু ভীরুকণ্ঠে গাইতে লাগলো :

বড় একা লাগে, মনে হয় হারিয়ে গেছি...

বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, কিন্তু খুব হৃদয়স্পর্শী সুরে উস্তিনাইয়া চরণটি পূরণ করলো :

ব্যাকুল বাসনায় আমার বুক ফেটে যায়। তারপর সে বেশ উল্লাসের সঙ্গে একটু দম্ভভরেই বললো ঃ

"এই হলো শুরু! তোমায় আমি গান বাঁধতে শিখিয়ে দেবো, ভাই, সুতোকাটার মতোই সহজ কাজ...। এবার গান গাওয়া যাক।"

যেন ব্যাঙেদের শোকার্ত ডাক আর গির্জার ঘণ্টাগুলোর অলস ধ্বনি শুনছে এমনিভাবে ক্ষণিকের জন্য চুপ করে থেকে সে আবার বেশ নিপুণভাবে কথা আর সুর তুলে নিলো ঃ

শীতের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা নয় বসন্তের ছোট ছোট ঢেউতোলা নদীও নয়...

পরিচারিকাটি উস্তিনাইয়ার কাছ ঘেঁসে এসে তার সাদা রুমালবাঁধা মাথাটি উস্তিনাইয়ার গোলগাল কাঁধের ওপর রাখলো, চোখ বুঁজে এবার আরও সাহসভরে, তীক্ষ্ণ কম্পিত কণ্ঠে গেয়ে চললো ঃ

বাড়ির থেকে শুধু একটু খবর

আমার সান্ত্বনা বয়ে নিয়ে আসে...

"দেখলে তো!" নিজের হাঁটু চাপড়ে বিজয়োল্লাসে উস্তিনাইয়া বলে উঠলো। "বয়স যখন কম ছিল তখন এর থেকে আরও ভালো গান বাঁধতে পারতাম। মেয়েরা বলতো 'উস্তিনাইয়া একটা গান বাঁধো।' ওঃ, তখন নিজেকে একেবারে উজাড় করে দিতাম না কি! বেশ, এবার কি রকম হবে?"

"আমি জানি না," চোখ খুলে, হেসে পরিচারিকাটি বললো।

জানলার ধারেতে রাখা ফুলগুলোর মধ্যে দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। গায়িকারা আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু আমি বেশ ভালো ভাবেই দেখতে পাচ্ছিলাম উস্তিনাইয়ার খসখসে, বসন্তের দাগওয়ালা গাল, তার ছোট কানটি, তার হলুদরঙের রুমালে যেটি ঢাকা পড়েনি, তার ধূসর সজীব চোখ, তার জে পাখির ঠোঁটের মতো খাড়া নাক আর তার চৌকো পুরুষালি চিবুক। খুবই চতুর, প্রগলভ স্ত্রীলোক, পরিপক্ক মদ্যপায়ী আর সাধু সন্ন্যাসীদের জীবন কথা শুনতে ভালোবাসে। ঐ রাস্তার সব থেকে বড় গুজব রটনাকারী আর, তার ওপর, শহরের সব গোপন কথার সে ছিল আধার। তার গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারার পাশে, শীর্ণ কৃশতনু পরিচারিকাটিকে একটি শিশুর মতো লাগছিল। পরিচারিকাটির হাঁ মুখটিও একটি শিশুর হাঁ মুখের মতো; সে তার ছোট ছোট ভারী ঠোঁট দুটো ফোলালো, যেন এইমাত্র কেউ তাকে ভর্ৎসনা করেছে, আর সে যেন আবার ভর্ৎসনা খাবার ভয় পাচ্ছে আর কাঁদবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

স্যোয়ালো পাখিরা রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ উড়ে বেড়াচ্ছে, তাদের বাঁকা বাঁকা ডানাগুলো প্রায় মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ডাঁশ মশাগুলো নিচুতে উড়ছে — রাত্রে যে বৃষ্টি হবে এটা তার একটা নির্ভুল লক্ষণ। আমার জানলার উলটোদিকের

বেড়ার ওপর একটা কাক বসে আছে, নিশ্চলভাবে, যেন কাঠে কাঠে খোদাই করা হয়েছে তাকে, কালো কালো পুঁতির মতো চোখ দিয়ে সে স্যোয়ালো পাখীদের দেখছে। গির্জার ঘণ্টা বাজা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু ব্যাঙগুলো আগের থেকে আরও একটু সুরেলাভাবে ডাকছে ; নিস্তব্ধতা যেন আরও নিবিড় আরও উষ্ণ বলে মনে হচ্ছিল।

আকাশে লার্ক পাখীরা গান গাইছে

শস্য ক্ষেতে 'কর্ন ফ্লাওয়ার' (একজাতীয় ফুল)

ফুটছে,

বুকের ওপর দিয়ে হাত দুটো আড়াআড়িভাবে রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে উস্তিনাইয়া করুণ সুরে গেয়ে উঠলো। পরিচারিকাটি তাকে অনুসরণ করলো সাহসের সঙ্গে সুরেলা কণ্ঠে।

আহা আমার দেশের ক্ষেতগুলো যদি এক

পলকের জন্যও দেখতে পেতাম,

আর উস্তিনাইয়া মেয়েটির চড়া, কম্পিত কণ্ঠকে দক্ষভাবে সাহায্য করে কোমল আর মোলায়েম সুরে গেয়ে উঠলো এই মর্মস্পর্শী কথাগুলো :

আর আমার দয়িতের সঙ্গে বনে বনে

ঘুরে বেড়াতে পারতাম!....

তারা গান শেষ করে অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলো, জড়াজড়ি করে। অবশেষে উস্তিনাইয়া মৃদু বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো :

"গানটা নেহাৎ মন্দ বাঁধিনি আমরা, তাই না?

আমার তো মনে হচ্ছে খুবই ভালো হয়েছে...!"

"দেখো!" উস্তিনাইয়াকে বাধা দিয়ে মৃদু কণ্ঠে পরিচারিকাটি বলে উঠলো।

তারা রাস্তার ওপর দিয়ে ডানদিকে তাকালো। সূর্যের আলোয় স্নাত দীর্ঘকায় এক যাজক বেগুনী রঙের একটা ক্যাসক (যাজকদের আলখাল্লা) পরে রাস্তা দিয়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে বেশ গুরুত্বপূর্ণভাবে চলেছে, ফুটপাথের ওপর ছন্দপূর্ণভাবে তার দীর্ঘ যষ্টি ঠুকতে ঠুকতে। তার যষ্টির রূপোর হাতল আর তার প্রশস্ত বুকের ওপরের সোনার ক্রুশ সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে।

কাকটা তার ছোট ছোট কালো পুঁতির মতো চোখ দিয়ে তির্যকভাবে যাজকের দিকে তাকিয়ে, অলসভাবে তার ভারী ডানাদুটো ঝাপটে অ্যাশ গাছের একটা ডালে গিয়ে বসলো, তারপর সেখান থেকে ধূসর একটা গোলার মতো ঝুপ করে বাগানে নেমে পড়লো।

মেয়ে দুটি উঠে দাঁড়ালো, যাজককে নিচু হয়ে অভিবাদন করলো। তাদের সে লক্ষ্যও করলো না। তারা দাঁড়িয়েই রইলো, তাদের চোখগুলো যাজককে অনুসরণ করে চললো যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মোড় ফিরলো।

"হ্যাঁ গো মেয়ে," তার মাথায় রুমালটা ঠিক করতে করতে উস্তিনাইয়া বললো। "শুধু যদি আমার বয়সটা কম হতো আর দেখতে একটু সুন্দর হতাম..."

কে যেন ক্রুদ্ধভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে ডাক দিলো :

"মারিয়া। ...মাশকা!"

"ঐ ওরা আমায় ডাকছে..."

পরিচারিকাটি ভীত সন্ত্রস্ত, খরগোশের মতো দৌড়ে চলে গেলো, আর উস্তিনাইয়া আবার বসে পড়ে, চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে তার হাঁটুর ওপরের রঙচঙা সুতীব্র ফ্রকটা ঠিক করতে লাগলো।

ব্যাঙগুলো ডেকেই চললো। শ্বাসরুদ্ধকর বাতাস বনের মধ্যেকার হ্রদের মতোই স্থির নিষ্কম্প। রঙের একটা মহোৎসবের মধ্য দিয়ে দিনটা কেটে যাচ্ছিল। টেশা নদীর ওপারের ক্ষেতগুলোর ওপর দিয়ে একটা ক্রুদ্ধ গুরু গুরু শব্দ ভেসে এলো — অনেক দূরে মেঘ ডাকছে ভালুকের মতো গর্জন করে।

[Maxim Gorky রচিত "How a Song was Composed" গল্পের ছায়াবলম্বনে]

শরতের এক সন্ধ্যায়

ম্যাক্সিম গোর্কি

শরতের এক সন্ধ্যায় একবার খুবই অসুবিধাজনক আর অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলাম। সদ্য এক শহরে পৌঁছে দেখি একেবারে কপর্দকহীন অবস্থা, মাথা গোঁজার একটা আস্তানা পর্যন্ত নেই, সেখানের একটা লোককেও চিনি না।

গোড়ার ক'দিন অতিরিক্ত জামাকাপড় যা কিছু সঙ্গে ছিল সব বিক্রি করে দিলাম ; শহর ছেড়ে চলে গেলাম উসতাই-এর শহরতলিতে — পারঘাটগুলো সব সেখানেই। নৌকো চলাচল মরসুমে কর্মব্যস্ততায় জায়গাটা সরগরম হয়ে থাকে — কিন্তু তখন একেবারে নিস্তব্ধ, জনমানব শূন্য — অক্টোবর মাস প্রায় শেষ হয় হয়।

ভেজা বালুর ওপর দিয়ে পা টেনে টেনে চলতে চলতে বালুর ওপরে লক্ষ্য রাখছিলাম, খাবারের ছিটেফোঁটাও যদি মেলে এই আশায়, খালি বাড়ি আর দোকান ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ভাবছিলাম ভরাপেট কী রকম সুখদায়ক।

আমাদের সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থায় শরীরের ক্ষুধার থেকে মনের ক্ষুধা মেটানো অনেক সহজসাধ্য। রাস্তাগুলোর মধ্যে দিয়ে ঘোরবার সময় চোখে পড়বে, চারপাশের মনোরম সব অট্টালিকা — বাইরের দিক থেকে তো বটেই, সেগুলোর ভিতরও যে সমানভাবেই মনোরম এ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। এসব দেখেই হয়তো মনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান এবং অন্য ধরনের মহত্তম সব প্রসঙ্গ সম্বন্ধে এক সুখকর চিন্তাধারা। উপযুক্ত গরম পোশাকে সজ্জিত নানা লোকজন চোখে পড়বে — তারা সব সভ্য, ভদ্র, তারা তোমাকে পথ ছেড়ে দেবে, তোমার অস্তিত্বের মত দুঃখজনক ঘটনাকে তারা অগ্রাহ্য করাই শ্রেয় মনে করে। সত্যি বলতে কি, দুবেলা ভালো করে পেট ভরে খেতে পায় এমন লোকের মনের থেকে একজন ক্ষুধার্ত লোকের মন অনেক বেশি পরিপুষ্ট, এই তথ্য থেকে ভরাপেট খাবারে অভ্যস্ত লোকেদের অনুকূলে বেশ কৌতুকজনক এক সিদ্ধান্তে আসা যায়! ....

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, বৃষ্টি পড়ছিল — উত্তর দিক থেকে বয়ে আসছিল দমকা একটা বাতাস। খালি দোকানঘর আর স্টলগুলোর মধ্যে দিয়ে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস

বয়ে গিয়ে কাঠের তক্তা মেরে বন্ধকরা সরাইখানার জানালাগুলোর ওপর দমাদম বাড়ি মারছিল, বাতাসের বাড়ি লেগে নদীর জল ফেনিয়ে উঠছিল, ঢেউগুলো সশব্দ বালুকাময় তটের ওপর আছড়ে পড়ছিল, তাদের সাদা সাদা চূড়ো ঝাঁকিয়ে একে অন্যের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন সুদূরের দিকে ধেয়ে চলেছিল। মনে হচ্ছিল নদী যেন শীতের আগমনের আভাস পেয়ে বরফের শিকলের ভয়ে পালাচ্ছে। বরফের শিকল দিয়ে উত্তরে বাতাস হয়তো সেই রাতেই তাকে বেঁধে ফেলতে পারে। ভারাক্রান্ত আকাশ যেন নিচে নেমে এসেছে, একভাবে একনাগাড়ে ঝির ঝির বৃষ্টি ঝরিয়ে চলেছে সে। ভেঙেপড়া বিকলাঙ্গ দুটো উইলো গাছ আর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা উলটানো এক নৌকা আমার চার পাশে প্রকৃতির শোক-গাথার বিষণ্ণতা যেন আরো বাড়িয়ে তুলেছিল।

তলা ভাঙা নৌকো, ঠাণ্ডা বাতাসে বিপর্যস্ত করুণ, বুড়ো দুটো গাছ ··· সব কিছু যেন বিধ্বস্ত, বন্ধ্যা, মৃত, আর অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ করে চলেছে আকাশ। আমার চারপাশে শুধু অন্ধকারাচ্ছন্ন জনমানব শূন্য এলাকা। মনে হচ্ছিল এই মৃত্যুর মাঝখানে আমি যেন একমাত্র জীবন্ত বস্তু, এই হিমশীতল মৃত্যু যেন আমার জন্যও প্রতীক্ষা করে রয়েছে।

আর তখন আমার বয়স মাত্র সতেরো বছর—কী চমৎকার সেই বয়স!

ঠাণ্ডা ভেজা বালুর ওপর দিয়ে চলতে লাগলাম, ঠাণ্ডা আর ক্ষুধার সম্মানে দাঁতে দাঁত ঠুকে তাল দিতে দিতে। খাবারের খোঁজে ব্যর্থ সন্ধান করতে করতে হঠাৎ একটা স্টলের পাশ দিয়ে গিয়ে মোড় ফিরতেই চোখ পড়লো মেয়েলি পোশাক পরা গুটিশুটি মেরে বসে থাকা এক মূর্তির ওপর, বৃষ্টিতে ভেজা পোশাক তার নোয়ানো কাঁধে লেপটে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম কি করছে সে। দেখলাম হাত দিয়ে বালি খুঁড়ে সে একটা স্টলের নিচে ঢোকবার চেষ্টা করছে।

"আরে, ওকি করছো?" গুঁড়ি মেরে তার পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

মৃদু চিৎকার করে সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এখন যখন সে উঠে দাঁড়িয়ে তার আতঙ্কভরা বিস্ফারিত ধূসর চোখ দুটো মেলে আমার দিকে তাকালো, তখন দেখলাম সে আমারই বয়সী একটি মেয়ে। মুখখানা তার খুবই সুশ্রী কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বড়ো বড়ো তিনটে কালসিটের দাগে সে মুখ শোভিত। ঐগুলোই সব নষ্ট করে দিয়েছে, অবশ্য কালসিটের দাগগুলো কিন্তু আশ্চর্যরকমভাবে সমতা বজায় রেখেছে : চোখ দু'টোর নিচে একই আকারের দুটো আর নাকের ওপরে কপালের ঠিক মাঝখানে একটু বড় আকারের একটা। এই সমতা দেখে মনে হয় এ কোনো এক শিল্পীর হাতের কাজ — মানুষের মুখের চেহারা বিকৃত করার কাজে সিদ্ধহস্ত হয়ে গেছে সে শিল্পী।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, আস্তে আস্তে তার চোখ থেকে আতঙ্কের ভাব মিলিয়ে গেল ···। হাতের বালি ঝেড়ে ফেলে, মাথার ওপরের সূতীর রুমালটা একটু ঠিক করে নিয়ে কাঁধ দুটো নিচু করে সে বললো :

"মনে হচ্ছে তুমিও খাবার খুঁজছো ? ··· যাও, ওখানে খোঁড়ো গিয়ে। আমার হাত দুটো একেবারে ভেঙে গেছে। ঐ যে ওখানে ··· !" একটা স্টলের দিকে মাথা হেলিয়ে দেখালো, "ওখানে নিশ্চয় রুটি পাবে ···। ওটাতে এখনও কাজ কারবার চালাচ্ছে ওরা।"

বালি খোঁড়ার কাজে লেগে গেলাম। খোঁড়ার কাজ লক্ষ্য করতে করতে একটু জিরিয়ে নিয়ে সে এসে আমার পাশে বসে পড়ে আমাকে সাহায্য করতে লাগলো।

নিঃশব্দে আমরা কাজ করে চললাম। ফৌজদারী আইন ; নীতিজ্ঞান সম্পত্তির মালিকানার অধিকার এবং অন্যান্য অনেক কিছুর কথা অভিজ্ঞদের মতে যেগুলো জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত সেগুলো ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে ছিল কিনা এখন তা আমি বলতে পারবো না। সত্যি কথা বলতে গেলে আমাকে স্বীকার করতেই হবে স্টলের নিচের বালি খুঁড়তে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে স্টলের ভেতর কি পেতে পারি এই চিন্তা ছাড়া আর সব কিছুর কথা আমি তখন ভুলেই গিয়েছিলাম।

সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারপাশে ঠাণ্ডা, স্যাঁৎস্যাঁতে, অস্বাস্থ্যকর অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠছিল। ঢেউয়ের শব্দ অনেকটা চাপা মনে হচ্ছিল, কিন্তু স্টলের গায়ের কাঠের তক্তাগুলোর ওপর বৃষ্টি আরো শব্দ করে, আরো জোরে বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছিল ···। রাতের পাহারাওয়ালার ঘণ্টার ধ্বনি ইতিমধ্যেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল।

"ওর" নিচেয় মেঝে আছে কি ?" নিচু গলায় আমার সহকারিণী জিজ্ঞাসা করলো। সে যে কিসের কথা বলছে বুঝতে পারলাম না তাই কোনো উত্তর দিলাম না।

"বলছি, স্টলটার কি মেঝে আছে ? যদি তা না থাকে তবে মিথ্যেই আমরা খেটে মরছি। ধরো বিরাট একটা গর্তই খুঁড়ে ফেললাম, তারপর দেখলাম মোটা মোটা কাঠের তক্তা পাতা ···। সেগুলো আমরা চাড় দিয়ে খুলবো কি করে ? তার থেকে তালাটা ভেঙে ফেলা ভালো ···। তালাটাও একেবারে রদ্দি ··· !"

মেয়েদের মাথায় ভালো ফন্দী খুব কমই খেলে। দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে তাদের মাথায়ও ভালো ফন্দী খেলে বটে। আমি চিরকালই ভালো ফন্দীর খুব কদর করি আর যথা সম্ভব তার সুযোগ নেবারও চেষ্টা করি।

তালাটা সন্ধান করে সেটাকে উপড়ে বার করে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সহকারিণীও সাপের মতো কিলবিল করে স্টলের চৌকোনো ফোঁকরের মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ভেতর থেকে তার সপ্রশংস সরব শোনা গেলো :

"সাবাস"—

প্রাচীন বক্তাদের একত্রিত বাগ্মিতাও যদি কারো থাকে তবু বলবো সে রকম কোনো লোকের মুখের স্তুতিগানের থেকেও একটি মেয়ের মুখের ছোট্ট একটা প্রশংসার বাণী আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। কিন্তু তখন আমি এটাকে এখনকার মত এতটা মূল্য দিতাম না, তাই মেয়েটির প্রশংসায় কান না দিয়েই আমি তাকে সংক্ষেপে উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলাম :

"কিছু পেলে ওখানে?"

একঘেঁয়ে সুরে সে এক এক করে তার আবিষ্কারের ফর্দ দিয়ে চললো :

"বোতল ভর্তি একটা ঝুড়ি, খালি থলে একগাদা, ছাতা একটা, লোহার বালতি একটা!"

এর কোনোটাই খাদ্য নয়। বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার সব আশাই নির্মূল হতে চলেছে। হঠাৎ উত্তেজিতভাবে সে চিৎকার করে উঠলো :

"আঃ! ঐ তো ওখানে রয়েছে"—

"কি রয়েছে?" "পাঁউরুটি একখানা!"

"পাঁউরুটি ··· গোটা রুটি ··· শুধু ··· ওটা ভিজে ··· এই নাও ধরো!"

একটা পাঁউরুটি আমার পায়ের কাছে গড়িয়ে এসে পড়লো, আর তার পরেই এলো আমার সাহসী সহকারিণী স্বয়ং। ততক্ষণে আমি একটুকরো পাঁউরুটি ছিঁড়ে মুখে দিয়ে চিবোতে লেগে গেছি ···।

"আমাকে একটু দাও! ··· এখান থেকে আমাদের পালাতেই হবে। কোথায় যাওয়া যায়" — চার পাশের ভেজা শব্দমুখর অন্ধকারের মধ্যে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো।

"ঐ যে ওখানে একটা নৌকো উলটে পড়ে আছে, ওখানে যাবে?"

"চলো!" আমাদের লুটের মাল টুকরো করে ছিঁড়ে মুখে পুরতে পুরতে পা চালালাম ···। বৃষ্টি আরো জোরে জোরে পড়ছিল, নদী গজরাচ্ছিল; বহুদূর থেকে বিদ্রুপমাখা দীর্ঘস্থায়ী একটা শিসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, যেন এক নির্ভীক দানব শিস দিয়ে ধিক্কার দিচ্ছে, পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত যত বিধি নিয়মগুলোকে, শরতের এই করুণ সন্ধ্যাকে — আর এই সন্ধ্যার নায়ক-নায়িকা আমাদের দু'জনকে। শিসের শব্দে আমার বুকের মধ্যটা কেমন যেন করছিলো; তা সত্ত্বেও আমি লোভীর মত খেয়ে চললাম, আমার বাঁপাশে চলতে চলতে মেয়েটিও তাই করে যাচ্ছিল।

"তোমার নাম কি?" তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম — কেন যে জিজ্ঞাসা করলাম তা না জেনেই।

"নাতাশা!" সশব্দে চিবোতে চিবোতে উত্তর দিলো।

তার দিকে তাকালাম, বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। সম্মুখের অন্ধকারের দিকে তাকালাম, মনে হলো আমার ভাগ্যের বিদ্রুপমাখা মুখাকৃতি যেন আমার দিকে তাকিয়ে দুর্জ্ঞেয়ভাবে, ঠাণ্ডাভাবে হাসছে···।

অবিশ্রান্তভাবে বৃষ্টির ধারা নৌকোর গায়ে বাজনা বাজিয়ে চললো, তার মৃদু টিপটিপ শব্দে মনের মধ্যে নানারকমের বিষণ্ণ চিন্তা জাগিয়ে তুলছিল। ভাঙা নৌকোর তলের একটা ফুটো দিয়ে বাতাস সোঁ সোঁ শব্দে বয়ে যাচ্ছিল, সেই ফুটোর মুখে আলগা একটা টুকরো করুণ, অস্বস্তিকর একটা শব্দ করে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ঢেউগুলো তীরে এসে আছড়ে পড়ছিল। তাদের গর্জন একঘেঁয়ে হতাশায় ভরা, তারা যেন অসহনীয় রকমের বৈচিত্র্যহীন আর নৈরাশ্যজনক কোনো এক বিষয় সম্বন্ধে কিছু

বলে চলেছে, এমনই এক বিষয় যার সম্বন্ধে তারা একবোরে ক্লান্ত হয়ে গেছে, যার থেকে তারা পালিয়ে যেতে চাইছে — কিন্তু তা সত্ত্বেও যার সম্বন্ধে তাদের কথা বলে যেতেই হবে। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে ঢেউ ভাঙাব শব্দ মিশে গিয়েছিল, উলটোনো নৌকোটার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল তাপোজ্জ্বল গ্রীষ্ম আর হিমশীতল সিক্ত কুয়াশাচ্ছন্ন শরতের চিরন্তন আনাগোনায় ক্লান্ত, বিরক্ত পৃথিবীর তারাক্রান্ত দীর্ঘশ্বাস। জনহীন তট আর ফেনায়িত নদীর ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল, বাতাস বয়ে যেতে যেতে শোকের গান গাইছিল …।

নৌকোর তলার ঐ আশ্রয়ে কোনো আরাম ছিল না : সংকীর্ণ, স্যাঁতস্যাঁতে তার ওপর আবার নৌকোর তলার ঐ ফুটো দিয়ে বৃষ্টির ঠাণ্ডা ফোঁটা আর দমকা বাতাস আসছিল। নীরবে বসে আমরা ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। মনে পড়ে তখন আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। নাতাশা নৌকোর গায়ে পিঠ দিয়ে বলের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিল। হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে তাদের ওপর থুতনী বেখে বিস্ফারিত চোখে নদীর দিকে তাকিয়েছিল। তার বিবর্ণ মুখখানার মধ্যে চোখগুলো প্রকাণ্ড লাগছিল, তাদের নিচের কালসিটের জন্য। নিশ্চল হয়ে বসেছিল সে, তার সে নিশ্চলতা আর নীরবতা ক্রমশঃ আমার মনে যেন একটা আতঙ্কের ভাব জাগিয়ে তুললো, তার সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু কি করে যে কথা আরম্ভ করবো তা বুঝতে পারছিলাম না।

সেই প্রথমে কথা বললো।

"কি অভিশপ্ত জীবন!" সে মন্তব্য করলো, বেশ স্পষ্ট ও সুচিন্তিতভাবে, গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।

ওটা কোনো অভিযোগ নয়। কারণ অভিযোগ হওয়ায় পক্ষে তার গলার স্বরে ছিল অত্যন্ত বেশি রকমের নির্লিপ্ততার ভাব। এ যেন অনেক চিন্তাভাবনার পর বিশেষ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে সে, এখন শুধু মুখেই সেটা ব্যক্ত করলো মাত্র। তার এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে গেলে আমার নিজের মতকে অস্বীকার করতে হয় তাই আমি চুপ করে রইলাম — আর সেও ওখানে বসে রইলো নিথর হয়ে, আমাকে যেন লক্ষ্য না করে।

"যদি মরে যেতে পারতাম …" নাতাশা আবার শুরু করলো, বেশ শান্ত, চিন্তামগ্নভাবে, এবারেও কিন্তু তার গলার স্বরে অভিযোগের রেশ ছিল না। স্পষ্টই মনে হচ্ছিল জীবন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে নিজের ব্যাপারে বিবেচনা করে শান্তভাবেই সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে জীবনের বঞ্চনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গেলে তার নিজের কথায় "মরে যাওয়ার" থেকে ভালো আর কিছু সে করতে পারবে না।

তার চিন্তাধারার স্বচ্ছতা আমাকে অবর্ণনীয়ভাবে ব্যথিত করলো, মনে হচ্ছিল এমনিভাবে চুপ করে থাকলে আমি হয়তো কেঁদেই ফেলবো …। এই মেয়েটির সামনে সেটা আরোও বেশি লজ্জাজনক হবে, বিশেষ করে সে নিজে যখন কাঁদছে না। ঠিক করলাম কথা বলে ওকে ব্যস্ত রাখবো।

"তোমাকে মারলো কে?" বলবার আর কিছু খুঁজে না পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"এ সব পাশকার কাজ", অনুত্তেজিত অকম্পিত গলায় সে উত্তর দিলে।

"সে আবার কে?"

"আমার ভালোবাসার মানুষ গো ··· এক রুটিওয়ালা।"

"সে কি প্রায়ই তোমাকে মারধর করে?"

"মাতাল হলেই আমাকে ধরে সে মারে ···।"

হঠাৎ আমার কাছে ঘেঁষে এসে বলতে লাগলো তার নিজের কথা, পাশকার কথা। আর তাদের দু'জনের সম্পর্কের কথা। মেয়েটি করে বেশ্যাবৃত্তি আর রুটিওয়ালার আছে লালচে রঙের গোঁফ তার ওপর আবার খুব ভালো হারমোনিকা (একরকম বাদ্যযন্ত্র) বাজায় সে। ওদের বাসাবাড়িতে যেতো, তার আমুদে স্বভাব আর ফিটফাট সাজপোশাকের জন্য মেয়েটির ওকে খুব মনে ধরেছিল। গায়ে থাকতো ওর পনেরো রুবলের কোট পায়ে চুনট করা বুটজুতো।

এইসব কারণে মেয়েটি ওর প্রেমে পড়ে গেলো আর হয়ে গেলো মেয়েটির "নাগর"। নিজেকে এই পদে অধিষ্ঠিত করবার পর — মেয়েটি অন্যান্য খদ্দেরদের কাছ থেকে জলখাবারের যে সব পয়সা পেতো সেগুলো সে আত্মসাৎ করে সেই পয়সায় মাতাল হয়ে মেয়েটিকে ধরে মারতো। এর থেকেও খারাপ হলো সে ক্রমে ক্রমে মেয়েটির চোখের সামনেই অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা শুরু করে দিলো ···।

"তাতে বুঝি আমার মনে লাগে না? অন্যদের থেকে আমি কিছু কম না। হারামজাদা, শুধু আমাকে বোকা বানাচ্ছে। পরশুদিন, আমাদের বাড়িউলি মাসীর কাছ থেকে ছুটি নিলাম একটু বেড়াবো বলে। ওর বাড়ি গিয়ে দেখি আমাদের দুখা মাতাল হয়ে ওর পাশে বসে আছে। ও নিজেও একবারে মদে চুর। ওকে বললাম, "লক্ষ্মীছাড়া ঠগ কোথাকার।" আমাকে ধরে ও আচ্ছা করে মার দিলো। আমায় লাথি মারলো, চুলের ঝুঁটি ধরে টানলো, আরো কতকি করলো। তাতেও আমি কিছু মনে করতাম না, কিন্তু ও কিনা আমার জামা কাপড় সব টেনে ছিঁড়ে দিলে। এখন আমি কি করি? বাড়িউলি মাসীর সামনে এখন আমি যাই কি করে? আমার জামাকাপড় সবকিছু ছিঁড়ে দিয়েছে ও ··· আমার পোশাক ··· আমার সব একেবারে নতুন ছিল ··· আমার মাথা থেকে রুমালটা পর্যন্ত টেনে খুলে ফেলে দিয়েছিল ···। ভগবান। এখন আমার কি হবে" — হঠাৎ সে ভাঙা গলায় আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলো।

বাতাসের গর্জন চলছিল। ক্রমশঃ আরো ঠাণ্ডা আরো তীব্র হয়ে উঠছিল বাতাস। ··· আবার আমার দাঁতে দাঁত লেগে যেতে লাগলো, মেয়েটিও ঠাণ্ডায় কাঁধ দুটো জড়ো করে বসলো। সে আমার এতো কাছে ঘেঁষে এলো যে অন্ধকারের মধ্যেও আমি তার চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম।

"তোমরা পুরুষরা এত নচ্ছার সব! পায়ের তলায় ফেলে তোমাদের পিষে মারতে

চাই, তোমাদের একেবারে পঙ্গু করে দিতে চাই। তোমাদের কাউকে যদি মরতে দেখি তবে তার মুখে আমি থুথু দেবো। তারজন্যে আমার মনে এতটুকু কষ্ট হবে না। নোংরা ইতর জীব সব! তোমরা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো, লেড়ি কুত্তার মত লেজ নাড়ো, কিন্তু একবার যদি বোকামি করে তোমাদের কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করি, তাহলেই আমাদের সব কিছু শেষ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একেবারে মাড়িয়ে চলো ···। যতসব লোচ্চার, অকর্মণ্যের ধাড়ি সব!"

বেশ ভালো করেই মুখ ছোটালো সে, কিন্তু তার সে গালাগালির মধ্যে কোনো জোর ছিল না; "এইসব "লোচ্চার অকর্মার ধাড়িদের" প্রতি তার বিদ্বেষ বা ঘৃণা ছিল না — অন্ততঃ আমি যতটুকু শুনেছিলাম তার থেকে এটুকু বলতে পারি। গলার স্বরের কোনো তারতম্য না করে এমন ঠাণ্ডাভাবে কথাগুলো বলছিল সে যে তার বক্তব্যের সারমর্মের সঙ্গে তার গলার স্বরের কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। কিন্তু তার সে কথাগুলো আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। আমার স্বল্পপরিসর জীবনে আমি নৈরাশ্যবাদী ধাঁচের যথেষ্ট বই পড়েছি, যথেষ্ট বক্তৃতা শুনেছি, তাদের মধ্যে অনেকগুলোই খুব প্রাঞ্জল, প্রত্যয় উৎপাদক — কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে কোনোটাই এমন প্রচণ্ডভাবে আমাকে বিচলিত করতে পারেনি। কারণ মৃত্যুর অবিকল শিল্পীজনোচিত বর্ণনার থেকে মৃত্যু যন্ত্রণা অনেক বেশি স্বাভাবিক ও মর্মান্তিক।

আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল, মনে হয় সেটা বোধ হয় বিশেষ করে ঠাণ্ডার জন্যই, আমার সঙ্গিনীর কথাগুলোর জন্য নয়। মৃদুস্বরে আর্তনাদ করে দাঁতে দাঁত ঘষলাম। সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করলাম গায়ের ওপর ছোট ছোট দুটি হিমশীতল হাতের স্পর্শ। একটি রাখলো আমার ঘাড়ের উপর আর একটি আমার মুখের উপর। সেই সাথে কানে এলো একটা উদ্বিগ্ন, কোমল স্নেহাতুর স্বর :

"কি হলো?"

আমি তো বিশ্বাস করতে তৈরি ছিলাম যে এ প্রশ্ন অন্য কেউ করছে, নাতাশা নয়, যে নাতাশা একটু আগেই জোর গলায় বলছিল সব পুরুষ মানুষই হারামজাদা, যে একটু আগেই পুরুষজাতের সর্বনাশ দেখতে চাইছিল। ব্যস্ত হয়ে আবার সে প্রশ্ন করলো।

"কি হলো, আবার· শীত করছে? শীতে জমে যাচ্ছো নাকি? আচ্ছা অদ্ভুত মানুষ তুমি, প্যাঁচার মত চুপ করে বসে আছো, ওখানে আমাকে বললে না কেন তোমার শীত করছে? চলে এসো ··· এখানে শুয়ে পড়ো ··· লম্বা হয়ে শোও, আমিও শোব ···। এমনি করে। এবার হাত দুটো দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরো। বেশ ভালো করে চেপে ধরো। এবার তোমার গরম লাগা উচিত। এরপর আমার পিঠে পিঠ দিয়ে শোও। যে করে হোক রাতটা আমরা কাটিয়ে দেবই। কেনো ··· তুমি কি মদ খেতে? তোমাকে কি ওরা বরখাস্ত করে দিয়েছে? ··· ও কিছু নয়।"

ও আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে ···। ও আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে।

জনম জনম ধরে যেন আমি নরকে পড়ে মরি। আমার সঙ্গে অদৃষ্টের এ কি

পরিহাস। সেই মুহূর্তে আমি সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য নিয়ে গভীরভাবে সমাজ ব্যবস্থা নতুন করে ঢেলে সাজাবার স্বপ্ন দেখছি, রাজনৈতিক আলোড়নের স্বপ্ন দেখছি, অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ নানারকমের বই সব পড়ছি, সেইসব বইয়ের অন্তর্নিহিত গভীরতা নির্ণয় করা তাদের লেখকদের পক্ষেও সম্ভব নয় — সে সময়ে আমি নিজেকে "এক সক্রিয় তাৎপর্যপূর্ণ শক্তি" হিসাবে গড়ে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আর এই এক বারবণিতা তার শরীর দিয়ে আমাকে গরম রাখছে, চরম দুখিনী, ঘা খাওয়া, বিতাড়িত এক প্রাণী, সমাজে যার কোনো মূল্য নেই যার কোনো স্থান নেই, আমাকে সাহায্য করবার আগে যাকে সাহায্য করার কথা আমার মনেও আসেনি, আর যদি ওর কথাটা মনে এসেও থাকতো, যাকে সাহায্য করতে আমি একেবারেই সক্ষম হতাম না। উঃ ! আমার জীবনে যা ঘটছে তা যে সবই স্বপ্ন, একটা অদ্ভুত বেদনাদায়ক স্বপ্ন — এটা বিশ্বাস করতে আমি তৈরিই ছিলাম।

কিন্তু হায়। কিছুতেই সে কথা নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না, কারণ বৃষ্টির ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফোঁটা গায়ে এসে পড়ছিল, আমার বুকের সঙ্গে চেপে ছিল এক নারী বক্ষ, আমার মুখের ওপর অনুভব করছিলাম তার উষ্ণ নিঃশ্বাস, ভোদকার (রুশ দেশীয় মদ) ঈষৎ গন্ধমাখা সে নিঃশ্বাস, কিন্তু কি ভীষণ জীবন সঞ্চারী। ... বাতাস গর্জে উঠছিল আর থেকে থেকে আর্তনাদ করে উঠছিল, নৌকার গায়ে বৃষ্টি ঝাপটা মারছিল, ঢেউগুলো আছড়ে পড়ে চর্তুদিকে জল ছিটোচ্ছিল আর আমরা দুজনে দুজনকে জাপটে ধরেও ঠাণ্ডায় কেঁপে কেঁপে উঠছিলাম। এসব কিছুই অবিসংবাদিতভাবে সত্য তবু এই সত্যের মত এমন মর্মান্তিক এমন কুৎসিত স্বপ্ন কেউ যে কখনো দেখেনি এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

নাতাশা এমন স্নেহার্দ্র এমন সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলে চললো — যা শুধু নারী জাতির পক্ষেই সম্ভব। তার সেই সহজ সরল বন্ধুত্বমাখা কথাগুলোর প্রভাবে আমার মনের মধ্যে ছোট্ট একটা আগুনের শিখা ধীরে ধীরে জ্বলে উঠলো, সেই শিখা আমার মনের মধ্যের কি একটা জিনিস যেন গলিয়ে দিলে। তারপর আমার চোখে অশ্রুর বন্যা বইলো — সেই বন্যায় ধুয়ে গেলো মনের মধ্যেকার মন্দ অনেক কিছু, অনেক কিছু নির্বুদ্ধিতা অনেক অস্বচ্ছন্দ আর আবর্জনা — সে রাত্রির অনেক আগে থেকেই যা মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছিল। নাতাশা আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো :

"হয়েছে, হয়েছে, সোনা আমার, যথেষ্ট হয়েছে। আর কাঁদে না! খুব হয়েছে। ভগবানের দয়ায় তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে — তুমি ঠিক অন্য কোথাও চাকরি পেয়ে যাবে।"

আমাকে চুমো খেয়ে বললো সে। অগুন্তি ... উষ্ণ সে চুমো ...।

এক নারীর কাছে থেকে পাওয়া সেই আমার জীবনের প্রথম চুমো — আর সেই ছিল আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ, পরের জীবনে যা এসেছে তার জন্য মূল্য অনেক দিয়েছি কিন্তু পরিবর্তে প্রায় কিছু পাইনি বললেই চলে।

"অনেক হয়েছে, এবার কান্না বন্ধ করো তো দেখি, আচ্ছা মজার লোক তুমি।

তোমার কোথাও যাবার জায়গা যদি না থাকে তবে কালকে আমি তোমাকে সাহায্য কববো"—তার উৎসাহমাখা মৃদু গুঞ্জন যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে আমার কানে আসতে লাগলো।

··· ভোর পর্যন্ত দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলাম।

সকাল হলে, নৌকোর তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে এলাম, তারপর শহরে ফিরে চললাম ···। সেখানে বন্ধুর মত দুজন দুজনের কাছে বিদায় নিলাম, আর কখনো আমাদের দেখা হয়নি, যদিও প্রায় ছ'মাস ধরে যত নিকৃষ্ট ধরনের মাতালের আড্ডা আছে তার সবগুলো আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, মিষ্টি সেই নাতাশার জন্য — যার সঙ্গে শরতের সেই রাতটা আমি কাটিয়েছিলাম — এখানে যার কথা আমি বিবৃত করলাম।

যদি ইতিমধ্যে সে মরে গিয়ে থাকে — তবে বলবো তার পক্ষে মঙ্গলই হয়েছে — সে যেন শান্তিতে বিশ্রাম করতে পারে। আর যদি সে বেঁচে থাকে — তার অন্তরে যেন সে শান্তি পায়। সে যেন তার পদস্খলন সম্বন্ধে সচেতন না হয় — তা হলে সেটা হবে অনর্থক যন্ত্রণা ভোগ — যে যন্ত্রণা জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে না।

[মাক্সিম গোর্কীর "One autumn evening" গল্পের ছায়াবলম্বনে।]

একটি ছেলে

রচনা : ম্যাক্সিম গোর্কি

ছোট্ট এই গল্পটা বলা কঠিন— এতই সাদাসিধে এটা। আমি যখন এক তরুণ বালক, গ্রীষ্মের আর বসন্তের রবিবারগুলোয় আমাদের রাস্তার বাচ্চাদের এক সঙ্গে জড়ো কবতাম— আর তাদের নিয়ে যেতাম মাঠে মাঠে, বনবাদাড়ের মধ্যে। পাখীদের মতো প্রাণচঞ্চল এই ক্ষুদে মানুষগুলোর সঙ্গে আমি বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখে চলতে চাইতাম।

বাচ্চাগুলো শহরের ধুলোভরা গুমোট রাস্তাগুলো ছেড়ে যেতে খুশি হতো, তাদের মায়েরা তাদের সঙ্গে গোটা গোটা রুটিই দিয়ে দিতো, আমি মিষ্টি লজেন্স কিছু কিনে কাভাস (Kavass) এর একটা বোতলে জল ভরে নিতাম আর শহরের মধ্যে দিয়ে মাঠঘাট পেরিয়ে নিঃশঙ্ক বাচ্চা ভেড়াদের পিছু পিছু রাখালের মতো বসন্তের সাজে সাজা সুন্দর নরম সবুজ জঙ্গলের দিকে যেতাম।

আমরা শহর ছাড়তাম, সাধারণত সকালের দিকে, ভোর বেলাকার ভজনার জন্য গির্জার ঘণ্টাগুলো যখন বাজতে থাকতো, ঘণ্টাগুলোর শব্দ আর বাচ্চাদের ক্ষিপ্র পায়ে ওড়ানো ধুলোকে সঙ্গী করে। দুপুরে, দিনের উত্তাপ যখন তুঙ্গে, আমার বন্ধুরা এসে জড়ো হতো জঙ্গলের কিনারায় ; খাওয়া দাওয়া সেরে, ক্ষুদে মানুষগুলো ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমোতো ঝোপঝাড়গুলোর ছায়ায়, ওদিকে একটু বড় বয়সের বাচ্চারা আমার চারপাশ ঘিরে সমবেত হয়ে একটা গল্প বলার জন্য মিনতি করতো, আর আমিও তাই বলতাম, তারা যেমন করতো আমিও তেমনি স্বেচ্ছায় তাদের সঙ্গে বক্ বক্ করে যেতাম। আর যৌবনের স্পর্দ্ধিত আত্মবিশ্বাস আর জীবন সম্বন্ধে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান সম্পর্কে হাস্যকর দম্ভ, যেটা এরই অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ, সত্ত্বেও নিজেকে আমার প্রায়ই প্রাজ্ঞদের মাঝখানে বিশ বছরের এক শিশু বলে মনে হতো।

আমাদের মাথার ওপর বিস্তৃত চিরন্তন আকাশের আচ্ছাদন, আমাদের সমুখে জঙ্গলের উর্বর বৈচিত্র্য একটা বিচক্ষণ নীরবতায় মগ্ন হয়ে আছে, একটা বাতাস দ্রুত বযে যায়, একটা মৃদু ফিসফিসানি ছুটে চলে যায়, জঙ্গলের সুগন্ধভরা ছায়াগুলো কেঁপে ওঠে আর আবার প্রাণ ভরে যায় পরম সুখকর নীরবতায়।

সাদা সাদা মেঘমন্দ গতিতে ভেসে বেড়ায় আকাশের নীল বিশালতার মধ্যে ; রৌদ্রে উত্তপ্ত পৃথিবীর থেকে দেখে আকাশকে এমন ঠাণ্ডা মনে হয় আর অবাক লাগে তার মাঝে মেঘগুলো গলে যাচ্ছে দেখে।

আর আমার চারপাশে এইসব চমৎকার ক্ষুদে মানুষগুলো, ডেকে আনা হয়েছে জীবনের সমস্ত দুঃখ আর সমস্ত সুখ জানার জন্য।

ঐগুলো ছিল আমার সুখের দিন, ওরা ছিল সত্যিকারের আনন্দোৎসব, জীবনের অন্ধকার দিনগুলোর দ্বারা এরই মধ্যে কলুষিত আমার মন বাল-সুলভ চিন্তা ও অনুভূতিগুলো সহজ জ্ঞানে নিজেকে অবগাহন করাতো আর নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করাতো।

একদিন এক দঙ্গল বাচ্চাদের নিয়ে আমি যখন শহর থেকে বেরিয়ে মাঠের মধ্যে এসে পড়েছি, তখন আমাদের দেখা হলো অচেনা একজনের সঙ্গে— ক্ষুদে এক ইহুদী, নগ্ন পা, পরনে ছিন্ন সার্ট, কালো-ভ্রু, ভেড়ার বাচ্চার মতো ক্ষীণকায় আর কোঁকড়ানো চুলওয়ালা। কোনো একটা ব্যাপারে মনটা খারাপ ছিল আর স্পষ্টতই সদ্য সদ্য সে কাঁদছিল, তার নিষ্প্রভ, চোখদুটোর পাতাগুলো ফোলা ফোলা আর লাল, তার ক্ষুধার্ত মুখের নীলচে বিবর্ণতার মধ্যে থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বাচ্চাদের দঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে, সে রাস্তার মাঝে থমকে থেমে গেলো, সকালের ঠাণ্ডা মাটির ওপর সুদৃঢ়ভাবে শক্ত করে পা রেখে দাঁড়ালো, তার সুঠাম হাঁ মুখের কালচে ঠোঁট দুখানা আতঙ্কে হাঁ হয়ে গিয়েছিল— আর পরের মুহূর্তেই সে দ্রুত একটা লাফ দিয়ে ফুটপাতের ওপর গিয়ে পড়লো।

'ধর ওটাকে'! বাচ্চারা একটা আনন্দোচ্ছল ঐক্যতানে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, 'ক্ষুদে ইহুদী, ক্ষুদে ইহুদীটাকে ধর।' আমি আশা করেছিলাম সে ছুটে পালাবে, তার বড় বড় চোখওয়ালা মুখে আতঙ্কের প্রতিফলন, ঠোঁট দুটো কাঁপছিল, বিদ্রূপমুখর ভিড়ের হট্টগোলের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে রইলো আর বেড়ার গায়ে কাঁধ দুটো ঠেসে হাতদুটো পিছন দিকে মুড়ে যেন সে আরো লম্বা হয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে নিজেকে রুখলো।

তারপর হঠাৎ সে খুব শান্তভাবে, স্পষ্ট করে আর আনুষ্ঠানিকভাবে বললো :

'তোমরা আমার একটা মজার খেলা দেখতে চাও কি?'

আমি প্রথমে এই প্রস্তাবটাকে আত্মরক্ষার একটা উপায় বলে মনে করেছিলাম— বাচ্চারা সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী হয়ে পড়লো আর তার কাছ থেকে সরে গেলো, শুধুমাত্র অপেক্ষাকৃত বড়রা আর অধিকতর নিষ্ঠুর যারা, তারা তার দিকে সন্দিগ্ধ আর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো— আমাদের রাস্তার বাচ্চাদের সঙ্গে অন্য রাস্তাগুলোর বাচ্চাদের সম্পর্ক ভালো ছিল না, ওরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব' দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো আর অন্যদের বিশেষ অধিকারগুলোর দিকে নজর দিতে শুধু যে ভালোবাসতো না তা নয়, বস্তুত নজরই দিতো না।

ছোটরা ব্যাপারটা অনেক সহজভাবে নিয়েছিল।

'চলে এসো, খেলাটা দেখাও।'

সুদর্শন ক্ষীণকায় ছোট্ট ছেলেটি বেড়ার ধার থেকে সরে এলো, তার ক্ষীণ ছোট্ট দেহটি পিছনের দিকে হেলিয়ে দিয়ে, হাতের আঙুলগুলো দিয়ে মাটি ছুলো আর পা দুটো তার ওপর দিকে তুলে হাত দুটোর ওপর ভর করে দাঁড়ালো, এই বলেঃ

'ওঠ'।

আর তারপর তার হাত পা-গুলো ক্ষিপ্রভাবে খেলাতে খেলাতে সবেগে ঘুরে গেলো সে, যেন আগুনের ছেঁকা লেগেছে তার। তার সার্টের আর পাৎলুনের ফুটোগুলো দিয়ে তার শীর্ণ দেহের বিবর্ণ চামড়া দেখা যাচ্ছিল, কাঁধের হাড়, হাঁটু আর কনুইগুলো তির্যকভাবে বেরিয়েছিল। আর তার কণ্ঠার হাড়গুলো যেন একটা জোয়ালের মতো লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আর একবার যদি সে পিছনে নুয়ে যায় তাহলে ঐ সরু সরু, ছোট ছোট হাড়গুলো ফট করে ফেটে আর ভেঙে যাবে। তার প্রচণ্ড চেষ্টার জন্য সে ঘামছিল, তার পিঠের কাছের সার্টটা সব ভিজে গিয়েছিল; প্রতিটি কসরতের পর একটা কৃত্রিম নিষ্প্রাণ হাসি হেসে সে বাচ্চাদের মুখের দিকে মিটমিট করে তাকাচ্ছিল আর তার নিষ্প্রভ কালো চোখদুটো যেন যন্ত্রণাতেই বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল। এটা দেখতে খারাপ লাগছিল: চাউনিটা অদ্ভুতভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছিল আর সে চাউনিতে কেমন একটা অ-শিশুসুলভ চাপা উত্তেজনার ভাব। বাচ্চারা হৈ হৈ করে তাকে উৎসাহ দিচ্ছিল, তাদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যেই তাকে অনুকরণ করছিল, ধুলোর মধ্যে ডিগবাজী খাচ্ছিল, পড়ে যাচ্ছিল, অপটু অঙ্গ চালনায় ব্যথা পেয়ে, ব্যর্থতা হিংসা আর সাফল্যের চীৎকার করছিল।

কিন্তু এই কলহাস্যময় মুহূর্তগুলোয় হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ছেদ পড়লো যখন ছেলেটি ক্ষিপ্রভাবে অঙ্গচালনার কসরত থামিয়ে অভিজ্ঞ এক শিল্পীর সদাশয় দৃষ্টিতে বাচ্চাদের দিকে তাকালো আর তার শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বললো ঃ

'এবারে আমাকে কিছু দাও'।

ওরা সব নীরব হয়ে গেলো, আর কে এক একজন জিজ্ঞাসা করলো ঃ

'পয়সা?'

'হ্যাঁ', ছেলেটি বললো।

'বেশ কথা বললে!'

'পয়সা পেলে আমরাও ঠিক ঐরকম ভালো করেই করতে পারতাম.....।'

এই অনুরোধ ছোট্ট দর্শকের মধ্যে শিল্পী সম্বন্ধে একটা বিরূপ আর তাচ্ছিল্যের ভাব জাগিয়ে তুললো। বাচ্চারা হাসতে হাসতে আর মৃদু গাল পাড়তে পাড়তে মাঠের দিকে পাড়ি দিলো। অবশ্যই তাদের কারো কাছে পয়সা ছিল না, আর আমার কাছে ছিল মাত্র সাত কোপেক। দু'টো নিয়ে আমি ধুলোমাখা তেলোয় রাখলাম, ছেলেটি তার আঙুল দিয়ে সেগুলো ছুঁয়ে, সুন্দর একটা হাসি হেসে বললো ঃ

'ধন্যবাদ।'

সে দূরে সরে গেলো। আমি দেখলাম তার পিঠের ওপরের সার্টটা কালো কালো দাগে ভরা আর তার ডানা দু'টোর সঙ্গে সেঁটে আছে।

'দাঁড়াও, ওটা কি?'

সে থেমে পড়লো, ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকালো আর তেমনি সুন্দর একটা হাসি হেসে শান্তভাবে বললোঃ

'পিঠের ওটা? ইষ্টারের সময় মেলায় খেলা দেখাতে গিয়ে আমরা একটা ট্র্যাপিজ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম— বাবা এখনও বিছানায় পড়ে, কিন্তু আমি আবার ঠিক হয়ে গেছি।'

আমি সার্টটা ওঠালাম— পিঠের চামড়ার ওপর বাঁ দিকের কাঁধ থেকে নিচের উরু পর্যন্ত বিস্তৃত একটা বড়সড় কালো ক্ষত, পুরু, শুকনো একটা মামড়িতে ঢাকা; কসরতের সময় জায়গায় জায়গায় মামড়ি ফেটে গেছে আর ফাটাগুলো দিয়ে লাল লাল রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

'এখন আর লাগে না', হাসিমুখে সে বললো, 'লাগে না শুধু চুলকায়....'

আর, এক বীরের যোগ্য সাহসের সঙ্গে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, একজন ভারিক্কি প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের মতো কণ্ঠে বললোঃ

'তুমি ভাবছো এখন আমি আমার নিজের জন্য রোজগার করছিলাম? আমি দিব্যি করে বলছি— না! আমার বাবা— আমাদের একটা কপর্দকও নেই। আর আমার বাবার খুব বেশি রকমই চোট লেগেছে। তাহলে তুমি বুঝতেই পারছো, একজনকে তো কাজ করতেই হবে। তার ওপর আমরা হচ্ছি ইহুদী আর সকলেই আমাদের ঠাট্টা করে...... বিদায়!'

হাসিমুখেই কথা বলছিল সে, বেশ উৎফুল্লভাবে, তারপর আমার দিকে তার কোঁকড়া চুলওয়ালা মাথাটা ঝাঁকিয়ে, তাড়াতাড়ি চলে গেলো, হাঁ করা বাড়িগুলো তাদের কাঁচের চোখগুলো মেলে যেগুলো তার দিকে তাকিয়েছিল, চরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে সেগুলো পার হয়ে।

এই সমস্ত কিছুই এত অকিঞ্চিৎকর আর সাদাসিধে, তাই নয় কি? কিন্তু আমার জীবনের কঠিন দিনগুলোতে প্রায়ই আমার এই ছেলেটির সাহসের কথা মনে পড়েছে। এই ছেলেটিব সাহসের কথা স্মরণ করেছি— কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

আসমানি স্তেপভূমি

রচনা : মিখাইল শোলোকভ

বৃদ্ধ জাখার আর আমি ডন নদীর ধারে একটা বুনো কাঁটাঝোপের তলায়, রৌদ্রদগ্ধ ন্যাড়া একটা ঢিবির ওপর শুয়েছিলাম। বাদামী রঙের একটা চিল একটা মেঘের আঁশালো ধারির নিচে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল। পাখিদের পুরীষ লাঞ্ছিত কাঁটাঝোপের পাতাগুলো আমাদের কোনো ছায়াই দিচ্ছিল না। গুমোট গরমে কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করছিল ; ডন নদীর পাকানো পাকানো ফুটকি কাটা জলের কিংবা পায়ের নিচের খাঁজকাটা তরমুজের খোলাগুলোর দিকে তাকালে, মুখের মধ্যে চটচটে একটা লালা এসে যাচ্ছিল কিন্তু মুখ থেকে সেটা ফেলে দিতেও আলসেমি লাগছিল।

নিচেয় খোদলের মধ্যে শুকিয়ে আসা পুকুরের কাছে ভেড়াগুলো গাদাগাদি করে একটা দঙ্গল পাকিয়ে একসঙ্গে জড়ো হয়েছিল। জগতের কাছে ক্লান্ত ভাবে তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তারা তাদের ধূলো মাখা লেজগুলো নাড়ছিল আর ধুলোর তাড়নে ক্লিষ্টভাবে হাঁচছিল। বাঁধের ধারে একটা নধরকান্তি ভেড়ার ছানা মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে এক ধুলোয় মলিন হলুদ রঙের ভেড়ির দুখ খাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে তার মাথা দিয়ে তার মার বাঁটের মধ্যে সজোরে ঠেলা মারছিল। ভেড়িটা আর্তনাদ করে তার পিঠটা বাঁকিয়ে দিচ্ছিল, দুধটা যাতে ভালো করে বয়ে যায়। আমার মনে হলো ভেড়ির চোখে যেন যন্ত্রণার আভাস।

বৃদ্ধ জাখার আমার দিকে পাশ করে বসেছিল। পশমের বোনা শার্টটা খুলে ফেলে দিয়ে প্রায় অন্ধের মতো চোখদুটো কুঁচকে শার্টের খাঁজ আর সেলাইয়ের কাছে কি যেন খুঁজছিল। সত্তর বছর পুরতে তার এখনো বারো মাস বাকি। তার অনাবৃত পিঠটা নানা জটিল রেখায় কুঞ্চিত, তাঁর কাঁধের তির্যক হাড়গুলো চামড়ার মধ্যে দিয়ে ঠেলে বার হয়ে আসছে ; কিন্তু চোখদুটো তার নীল, যৌবনদীপ্ত, সাদা ভুরুর নিচে দৃষ্টি সতর্ক, তীক্ষ্ণ।

তার কম্পিত, গ্রন্থিল আঙুলগুলো দিয়ে যে উকুনটা সে ধরেছিল, সেটা সে ধরেই রেখেছিল সন্তর্পণে, আলতো ভাবে, তারপর নিজের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে মাটিতে সেটাকে নামিয়ে রেখে শূন্যে একটা ক্রুশ চিহ্ন এঁকে বিড়বিড় করে বললোঃ

"উকুন, তুমি গুটিগুটি সরে পড়ো। তুমি তো প্রাণে বাঁচতে চাও, তাই না? সেই তো হলো কথা …। তবে অনেক রক্ত শুষেছো তুমি … বেটা জমিদার কোথাকার …।'

ফোঁৎ করে একটা শব্দ করে শার্টটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে তার কাঠের মগের ঈষদুষ্ণ জলে দীর্ঘ একটা চুমুক দিলো। প্রতিটি ঢোক গেলার সময় তার কণ্ঠ মণি ওঠানামা করছিল ; তার চিবুক থেকে গলা পর্যন্ত সিক্ত চামড়ার দুটো ভাঁজ ঝুলছিল, জলের ফোঁটা তার দাড়ির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো, তার হলুদ রঙের চোখের পাতা ভেদ করে সূর্য রক্তিমভাবে জ্বলতে লাগলো।

জগের মুখ বন্ধ করে, সে আড়চোখে আমার দিকে তাকালো, আমার চোখে চোখ পড়তে, শুষ্কভাবে তার ঠোঁট কামড়াতে লাগলো আর দূরে স্তেপভূমির দিকে তাকিয়ে রইলো। খোঁদলের ওধারে ধোঁয়াটে ভাবে একটা কুয়াশা উঠছিল, রৌদ্রদগ্ধ মাটির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসে থাইমগুল্মের মিষ্টি গন্ধ। দু'এক মিনিট বাদে বৃদ্ধ তার রাখালের বাঁকানো লাঠি তার তামাকের রসে রঞ্জিত আঙুল দিয়ে আমার ওপাশে সরিয়ে রাখলো।

"খাদের ওপাশে পপলার গাছগুলোর মাথা দেখতে পাচ্ছো কি? ওটাই হলো টোমালিন বংশের জমিদারি, পপলারোভকা। আর পপলারোভকার কৃষকদের বসতি হলো ওরই কাছে ; বিগত দিনে ওরা ছিল ভূমিদাস। আমার বাবা তাঁর সারাটা জীবন ছিল ঐ ভদ্রলোকটির কোচম্যান। আমাকে তার অভাগা ছেলেকে সে বলতো কেমন করে মিঃ ইয়েভগ্রাফ টোমিলিন প্রতিবেশী এক ভূস্বামীর কাছ থেকে পোষা একটা সারসের বিনিময়ে তাকে এনেছিল। আমার বাবার মৃত্যুব পর তার জায়গায় আমিই কোচম্যান নিযুক্ত হয়েছিলাম। ভদ্রলোকটির নিজের তখন বয়স প্রায় ষাটের কাছে। বেশ পুরুষ্ট চেহারা, বনেদী রক্ত বইছে নাড়িতে। তার যৌবনে সে জারের রক্ষী বাহিনীতে ছিল। কিন্তু তার কার্যকাল শেষ হলে সে ডন নদীর ধারে তার জীবন কাটাবার জন্য চলে আসে। কসাকেরা তার ডনের ধারের জমি দখল করে কিন্তু রাজকোষ তাকে সারাটভ প্রদেশে সাত হাজার একর জমি বরাদ্দ করে দেয়। সেই জমি সে সারাটভের কৃষকদের ইজারা দেয়, আর নিজে পপলারোভকাতে বসবাস করে।

"উদ্দাম প্রকৃতির লোক ছিল সে। সর্বদাই মিহি কাপড়ের জর্জিয়ান কোট পরতো আর সঙ্গে রাখতো একটা ছোরা। গাড়িতে করে সে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে বেড়াতো ; আমরা পপলারোভকা থেকে বেরিয়ে এলেই সে আমাকে হুকুম করতো ঃ

"ওদের কষে চাবুক লাগা! নোংরা ভূত কোথাকার!"

"আমি ঘোড়াদের চাবুক লাগাতাম। আমরা একেবারে পুরোদমে ছুটে চলতাম, বাতাসের ফুসরত মিলতো না আমাদের চোখের জল শুকিয়ে দেবার। আমরা রাস্তার ওপরের একটা খানার কাছে পৌছে যেতাম, বসন্তকালের জল প্রবল জলোচ্ছ্বাস

রাস্তার মধ্যে খানাখন্দ তৈরি করতো। সামনের চাকাগুলো থেকে কোনো শব্দ শোনা যেত না। কিন্তু পিছনের চাকাগুলো 'কড়াৎ' করে উঠতো। আমরা আধ মাইল মতো যেতাম, আর তারপরেই ভদ্রলোকটি গর্জন করে উঠতো : 'গাড়ি ফেরা'। আমি গাড়ি ফিরিয়ে নিযে পুরোদমে আবার গাড়ি চালিয়ে ঐ খানার কাছ পর্যন্ত যেতাম। তিনবার পর্যন্ত ঐ হতভাগা খানার ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের গাড়ির স্প্রিং ভেঙে যেতো কিংবা গাড়ির একটা চাকা খুলে বেরিয়ে আসতো। আমার মনিব তখন ঘোঁৎ ঘোঁত করতে করতে বেরিয়ে এসে হাঁটা পায়ে পাড়ি দিতো, আর আমি তার পিছু পিছু চলতাম ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে। নিজেকে আনন্দ দেবার তার আবার আরো একটা উপায়ও ছিল : গাড়ি করে আমরা তার জমিদারি থেকে বেরোতাম সে এসে আমার পাশে চালকের আসনে বসতো। আমার হাত থেকে চাবুকটা সে কেড়ে নিতো। 'বোমে জোতা ঘোড়াটাকে সুড়সুড়ি দে'। আমি বোমে জোতা ঘোড়াটাকে একেবারে পুরোদমে ছোটাতাম, আর ক্রমাগত সে পাশের একটা ঘোড়াকে চাবুক মেরে যেতো। বরাবরই আমরা তিনঘোড়ার গাড়ি (Troika) চালাতাম, পাশের ঘোড়া হিসাবে আমাদের থাকতো সব থেকে খাঁটি জাতের ডন ঘোড়া : সাপেব মতো, মাথাগুলো একপাশে হেলিযে তারা মাটি কামড়াতো।

"তাদের মধ্যে একটাকে সে চাবুক মেরেই চলতো, বেচারা জন্তুটা একেবারে ফেনায় ফেনায ভরে যেতো। তারপর তার ছোরাটা বার করে, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে লাগামটার গায়ে বাব বার ছোরা চালাতো; ক্ষুর দিয়ে চুল কাটার মতো সে লাগামটাকে একটু একটু করে কাটতো। ঘোড়াটা ডিগবাজি খেয়ে পাঁচ ছ'ফিট যেতো তারপর হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে যেতো, নাক দিযে তার রক্ত পড়তে থাকতো। ঐখানেই তার ইতি হতো। পাশের অন্য ঘোড়াটাকেও সে চাবুক মেরে যেতো যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটাও বেদম হয়ে যেতো, তাতে ওর কিছু এসে যেতো না, তার মজা হলেই হলো, গাল দুটো তার একেবারে লাল হয়ে যেতো।

"আমরা যেখানে যাবো বলে যাত্রা করতাম সেখানে কচিৎ গিয়ে পৌছতাম : হয় গাড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে যেতো, নয় তো ঘোড়াগুলোকে দৌড় করিয়ে মেরে ফেলা হতো, আমরা যাত্রা শেষ করতাম পায়ে হেঁটে। সে একটা অসৎ চরিত্রের লোক ছিল। কিন্তু সে সব এখন অতীতের কথা, ভগবান আমাদের বিচার করবেন। আমার বউয়ের সঙ্গে সে ভাব জমিয়েছিল; আমার বউ বাড়ির ঝিয়ের কাজ করতো। শত ছিন্ন শার্ট পরে সে স্টার্জন মাছের মতো গর্জন করতে করতে চাকরদের বাসায় ধেয়ে আসতো। দেখতাম কামড়ে কামড়ে আমার বউয়ের বুক দুটো একেবাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, চামড়াগুলো ফালা ফালা হয়ে ঝুলছে। একদিন রাত্রে সে আমাকে এক হাতুড়ে বদ্যি ডাকতে পাঠিয়েছিল। জানতাম বদ্যির কোনো প্রয়োজন নেই, কি ঘটছে আন্দাজ করেছিলাম, তাই রাত্রে আমি স্তেপভূমিতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইলাম তারপর ফিরে গেলাম। শস্য-মাড়াই জায়গাটা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে জমিদারিতে ফিরে গেলাম, ঘোড়াগুলো ফল বাগানে রেখে আমার চাবুকটা সঙ্গে নিয়ে চাকরদের বাসায়,

আমার নিজের ঘরে চলে গেলাম। দরজায় ক্যাঁচ করে একটা শব্দ করলাম, ইচ্ছা করেই বাতি জ্বালাইনি তারপর বিছানার ওপর থেকে একটা শব্দ শুনতে পেলাম। আমার মনিব উঠে পড়তেই আমি চাবুক নিয়ে মারতে লাগলাম, চাবুকের ডগায় এক টুকরো সিসে বাঁধা ছিল। শুনতে পেলাম সে জানালা বেয়ে উঠছে, অন্ধকারে তার কপালে এক ঘা কষিয়ে দিলাম। সে জানালা থেকে লাফিয়ে পড়লো, আমার বউকে কয়েক ঘা চাবুক কষিয়ে আমি শুতে গেলাম। পাঁচদিনবাদে আমাদের সদর গ্রামে যেতে হয়েছিল। আসনের ওপরের কম্বলটায় বোতাম আঁটতে আরম্ভ করেছি, এমন সময় সে আমার চাবুকের ডগাটা ভালো করে দেখলো। হাতে নিয়ে সেটা উলটে পালটে পরীক্ষা করলো, সিসেটা হাত দিয়ে অনুভব করে জিজ্ঞাসা করলো ঃ

"বেটা, কুকুরের রক্ত, তোর চাবুকে সিসে লাগিয়েছিস কেন ?"

"আপনি নিজেই তো অনুগ্রহ করে আমাকে হুকুম দিযেছিলেন,' আমি উত্তর দিলাম।

"সে আর কিছু বললো না, প্রথম খানা পর্যন্ত সে শিষ দিতে লাগলো। আমি কিন্তু ধীরে ধীরে আমার আসনে ঘুরে বসলাম, দেখলাম সে কপালের ওপর দিযে নামিযে চুল আঁচড়েছে আর টুপিটা চোখের ওপর পর্যন্ত নামিয়ে পরেছে।

"কয়েক বছর পরে তার পক্ষাঘাত হয়। আমরা তাকে তার গাড়ি করে উস্ত — মেদিভেদিৎসায় নিয়ে গিয়ে ডাক্তার বদ্যি ডাকিয়েছিলাম ; বিরস হয়ে সে মাটিতে শুয়ে রইলো। তার পকেট থেকে মুঠো মুঠো রুবল বার করে সে মাটিতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো আর চিৎকার করতে লাগলো ভাঙা গলায় ঃ

"ওরে সাপের দল, আমাকে সারিয়ে তোল। আমি তোদের সর্বস্ব দেবো।"

"তার আত্মার শান্তি হোক, তার টাকা পয়সা নিয়েই সে মরলো। তার ছেলে, একজন সেনাধিকারিক, ছিল তার উত্তরাধিকারী। যখন সে খুব ছোট তখন জ্যান্ত অবস্থায় কুকুরের বাচ্চাদের সে ছাল ছাড়িয়ে নিতো, ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তাদের ছেড়ে দিতো। সেও তার বাপের মতোই গোল্লায় গিয়েছিল। কিন্তু বড় হয়ে সে অমনি যা তা করে সময় কাটানো বন্ধ করেছিল। সে ছিল লম্বা, রোগা আর মেয়েদের মতো তার চোখের কোলে সব সময় কালি পড়ে থাকতো। সুতো লাগানো সোনার প্যাঁশনে (Pince-neg) চোখে পড়তো। জার্মান যুদ্ধের সময় সাইবেরিয়াতে এক যুদ্ধবন্দী শিবিরের সেনাধ্যক্ষ হয়েছিল সে কিন্তু বিপ্লবের পর সে আমাদের এলাকায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময় আমার মরা ছেলে বাবদে ঘরে আমার দুই জোয়ান বয়সের নাতি। জ্যেষ্ঠ সেমিয়নের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আনিকেই তখনও পর্যন্ত নেহাতই এক বালক মাত্র। আমি তাদের সঙ্গেই বসবাস করছিলাম। আমার জীবনেব শেষ দিকটা বেশ সুষ্ঠু একটা গিঁটে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। বসন্তকালে আবার একটা বিপ্লব হলো। আমাদের কৃষকরা তার জমিদারি থেকে যুবক ভদ্রলোকটিকে বিতাড়িত করলো আর সেইদিনই সভায় সেমিয়ন কৃষকদের নিজেদের মধ্যে ভদ্রলোকটির জমিজমা ভাগ করে নিতে আর তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে

যেতে রাজি করালো। আর তারা করলোও তাই ঃ তারা তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র টেনে বার করে আনলে আর জমি করা হলে চষতে আরম্ভ করলো। দিন সাতেক কিংবা তারও কমদিন পরে আমরা গুজব শুনলাম যে ভদ্রলোটি কশাকদের নিয়ে আসছে আমাদের বসতি ধূলিসাৎ করতে। আমরা তাই অস্ত্রশস্ত্র আনার জন্য স্টেশনে দুটো গাড়ি পাঠালাম। ঈস্টার পর্বের আগের সপ্তাহে ওরা রেডগার্ডদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে ফিরে এলো, আমরা পপলারোভকে ঘিরে পরিখা কাটলাম। সেই পরিখা ভদ্রলোকটির পুকুব পর্যন্ত বিস্তৃতি ছিল।

"ঐ ওখানে, যেখানে থোকো থোকো থাইম হয়ে রযেছে, ওখানটা দেখতে পাচ্ছো? ঐ ধারেই পপলারোভকার লোকেরা তাদের পরিখার মধ্যে অপেক্ষা করেছিল। আমার নাতিরা, সেমিয়ন আর আনিকেই-ও ছিল। মেয়েরা সকালে প্রথমেই ওদের জন্য খাবার নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর তখন ঘোড়সওয়ারদের দেখা গেলো পাহাড়ের ওপর। তারা লম্বা একটা সারি বেঁধে ছড়িয়ে পড়লো, তাদের বাঁকা তলোয়ারগুলো থেকে নীল আভা বার হচ্ছিল। শস্য মাড়াইয়ের জাযগা থেকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তাদের দলপতি একটা তলোয়ার ঘোরাচ্ছে আর ঘোড়সওয়াররা পাহাড়ের ওপর থেকে মটরের দানার মতো নিচে নেমে এলো। চলনের ভঙ্গি দেখে আমি ভদ্রলোকটির সাদা ঘোড়াকে চিনতে পারলাম আর ঘোড়াকে দেখে তার সওয়ারকেও চিনতে পারলাম। দু-দু'বার আমাদের লোকেরা তাদের প্রতিহত করলো, কিন্তু তিনবারের বার কসাকেরা পিছন দিক থেকে তাদের আক্রমণ করলো, কৌশল খাটালো আর তারপরই শুরু হলো হত্যাকাণ্ড। রাত্রের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো। আমার কুটির থেকে রাস্তায় বার হয়ে দেখি কসাকেরা একদল লোককে কোঠাবাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আমার লাঠিটা তুলে নিয়ে দ্রুতপায়ে সেখানে গেলাম।

"আমাদের পপলারোভকার কৃষকেরা উঠোনে এক জায়গায় জড়ো হয়ে রয়েছে ঐখানের ঐ ভেড়াদের মতো। সর্বত্র কসাকদের ছড়াছড়ি। আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ

"ভাই সব, আমার নাতিরা সব কোথায়?"

"শুনলাম দলের মাঝখান থেকে দুজনেই চিৎকার করে ডাকলো। নিজেদের মধ্যে কিছু কথাও হলো, তারপর দেখলাম ভদ্রলোকটি বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে বলে উঠলো ঃ

"ওখানে কে, জাখার বাবা না কি?"

"হ্যাঁ, আমি হুজুর।"

"এখানে কি দরকার?"

"আমি তার কাছে বারান্দায উঠে গেলাম আর হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম ঃ

"বিপদের হাত থেকে আমার নাতিদের উদ্ধার করতে এসেছি, হুজুর। দয়া করুন, হুজুর। সারাটা জীবন আমি আপনার বাবার সেবা করে এসেছি, তাঁর আত্মার শান্তি

হোক। আমার নিষ্ঠার কথা মনে করুন, হুজুর, আমার বৃদ্ধ বয়সের প্রতি করুণা করুন।"

কিন্তু সে বললো ঃ

"এখন শোনো, জাখার বাবা ঃ আমার বাবাকে যে সেবা তুমি করেছো, তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তোমার নাতিদের আমি ছাড়তে পারবো না। তারা হচ্ছে যত নষ্টের মূল। এটা তোমাকে নিতে হবে, বুড়ো।"

"আমি তার পা জড়িয়ে ধরলাম, বারান্দায় তার পায়ে লুটোপুটি খেলাম।

"দয়া করুন, হুজুর। আমার বড় আদরের হুজুর, একবার মনে করুন জাখাব বাবা কি ভাবে আপনার সেবা করেছে, আমাকে শেষ কবে দেবেন না, হুজুর। আমার সেমিয়নের একটা কচি বাচ্ছা রয়েছে।

'সে একটা সুগন্ধি সিগারেট ধরালো, তারপর ধোঁওয়া ছেড়ে বললো ঃ

"যাও, ঐ হারামজাদাদের বলো, আমার ঘরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তারা যদি ক্ষমা চায় তবে তাই হবে। আমার বাবার কথা মনে করে আমি তাদের চাবুক লাগাবো আর আমার দলে ভর্তি করে নেবো। তাদের নিষ্ঠা দিয়ে তারা হয তো তাদের লজ্জাজনক অপরাধ স্খালন করবে।"

"আমি উঠোনে ছুটে গিয়ে আমার নাতিদের বললাম, তাদের হাতের আস্তিন ধরে টানাটানি করতে লাগলাম ঃ

"ওরে ও বোকা ছোকরারা, তোরা যা একবার, সে তোদের ক্ষমা না করা পর্যন্ত মাটি ছেড়ে উঠবি না।"

"সেমিয়ন যদি একবারও মাথা তুলতো। কিন্তু না, সে উবু হয়ে বসে গাছের একটা ডাল দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগলো। আনিকেই আমার দিকে তাকিযেই রইলো, তারপর চিৎকার করে উঠলো ঃ

"তোমার মনিবের কাছে যাও তুমি, সে বললো "আর তাকে বোলো ঃ জাখার তার সারাটা জীবন পা চেটেছে, তার ছেলেও তাই করেছে, কিন্তু তার নাতিরা তা করতে চায় না। ওকে তুমি সেটা বলতে পারো।'

"তাহলে তুই যাবি না, খানকির বাচ্ছা কোথাকার?"

"না, আমি যাবো না।"

"হারামজাদা, তুই নিজে বাঁচবি কি মরবি তার তোয়াক্কা করিস না, কিন্তু সেমিয়নকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? কার ঘাড়ে তুই তার বউ আর বাচ্ছাকে চাপিয়ে যাচ্ছিস?

"আমি লক্ষ্য করলাম সেমিয়নের হাত কাঁপতে আরম্ভ করেছে, গাছের ডালটা দিয়ে সে আরো গভীরভাবে মাটি খুঁড়তে লাগলো, কিসের খোঁজে তা ভগবানই জানেন। কিন্তু সে একটা কথাও বললো না। একটা ষাঁড়ের মতোই নিশ্চুপ হয়ে রইল সে।

"দাদু তুমি যাও আমাদের আর জ্বালিও না', আনিকেই বললো।

"আমি যাবো না, নির্বুদ্ধির ঢেঁকি কোথাকার। যদি কিছু অঘটন ঘটে তাহলে সেমিয়নের আনিসিয়া আত্মঘাতী হবে ...।"

"সেমিয়নের হাতের ডালটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেলো।

"আমি অপেক্ষা করে রইলাম। তবু সে কিছু বললো না।

"সেমিয়ন, দাদু আমার। মাথা ঠাণ্ডা কর, অন্নদাতা আমার। ভদ্রলোকের কাছে একবাব চল।"

"মাথা ঠাণ্ডা আমরা করেছি। আমরা যাবো না। তুমি যাও গিয়ে নাকে খৎ দাও', আনিকেই তর্জনগর্জন করতে লাগলো।

"কিন্তু আমি উত্তরে বললাম ঃ

"তোরা কি আমাকে ভদ্রলোকের পায়ে পড়ার জন্য তিরস্কার করছিস? পায়ে যদি পড়েই থাকি তাতেই বা কি হলো? আমি বুড়ো মানুষ মার বুকের দুধের স্বাদ পাবার জায়গায় আমি ভদ্রলোকের চাবুকের স্বাদ পেয়েছি। আমার নাতিদের পায়ে পড়তেও আমার কোনো লজ্জা নেই।"

"আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম, মাটিতে মাথা ঠেকালাম তাদের অনুনয় করলাম। অন্য কৃষকরা মুখ ঘুরিয়ে বসলো, ভান করলো যেন কি ঘটছে তা তারা দেখতে পাচ্ছে না।"

"চলে যাও, দাদু চলে যাও বলছি, না হলে আমি তোমায় খুন করে ফেলবো, আনিকেই গর্জন করতে লাগলো। তার ঠোঁটের কোনায় গ্যাঁজলা উঠছিল আর তার চোখে ফাঁদে আটকা পড়া নেকড়ে বাঘের মতো হিংস্র দৃষ্টি।

"আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, ভদ্রলোকের কাছে আবার ফিরে গেলাম। তার পা দুটো নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম; সে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো না; আমার হাত দু'খানা একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল, মুখ দিয়ে একটা কথাও বার করতে পারলাম না। সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ

"কিন্তু তোমার নাতিরা কোথায?

"ওদের ভয় করছে ..."

"ও, ওদের তাহলে ভয় করছে।' আর কিছু বললো না সে। বুট দিয়ে আমার মুখে একটা লাথি মেরে সে আর একবার বারান্দায় বেরিয়ে গেলো।'

বৃদ্ধ জাখারের নিঃশ্বাস পড়ছিল খুব জোরে জোরে আর থেমে থেমে; পুরো একটা মিনিট তার মুখটা কুঁচকে গেলো, একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। নিদারুণ চেষ্টায় সে তার কান্না রুখলো, এক বৃদ্ধের কান্না; হাত দিয়ে শুকনো ঠোঁটদুটো মুছে সে মুখটা ফিরিয়ে নিলো। চিলটা তার বিস্তারিত পাখা দুটো নামিয়ে ঘাসের ওপর নেমে এসে মাটির থেকে ছোঁ মেরে ছোট্ট সাদা বুকওয়ালা একটা বাসটার্ড পাখি তুলে নিলো। ছোটোখাটো একটা বয়সের ঝড়ের মতো পালকগুলো ঝরে পড়লো, ঘাসের ওপর ঝরে পড়ার সময় তাদের উজ্জ্বলতা অসহনীয় রকমের তীক্ষ্ণ আর জ্বালা ধরানো। বৃদ্ধ জাখার নাক ঝাড়লো, তার বোনা শার্টের প্রান্তে আঙুলগুলো মুছে আবার বলে চললো ঃ

"তার পিছু পিছু আমি বারান্দায় বেরিয়ে গেলাম, দেখলাম সেমিয়নের বউ আনিসকা তার বাচ্ছাকে নিয়ে দৌড়ে আসছে। ঐ চিলটার মতোই সে তার স্বামীর কাছে ছুটে চলে গেলো, সেমিয়নের বাহুর বাঁধনে পাথর হয়ে গেল ...।"

"ভদ্রলোকটি সার্জেন্টকে ডেকে সেমিয়ন আর আনিকেই কে দেখালো। সার্জেন্ট ছয়জন কসাক সঙ্গে নিয়ে দুই ভাইকে ভদ্রলোকটির ফল বাগানের দিকে টেনে নিয়ে চললো। আমি তাদের পিছু নিলাম; আনিসকা কিন্তু বাচ্চাটা উঠোনের মাঝখানে ফেলে রেখে ভদ্রলোকটির অনুসরণ করলো। সেমিয়ন তাদের সকলের আগে আগে চললো, খুব দ্রুত পায়ে আস্তাবলের কাছে পৌঁছে সে বসে পড়লো।

"তুমি বসছো কেন?' ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করলো।

"বুটজুতো পরে পায়ে লাগছে, আর সইতে পারছি না।' এই বলে সে হাসলো।

"সে তার বুট জোড়া খুলে আমার হাতে দিলো।

"এই নাও দাদু, এগুলো ধরো আর তোমার স্বাস্থ্যের জন্য এগুলো পরবে। ভালো বুট, ডবল সোল দেওয়া।'

"আমি বুট জোড়া হাতে নিলাম, আবার চলা শুরু করলাম। তারা গিয়ে বাগানের বেড়ার সামনে দাঁড়ালো, কসাকেরা বেড়ার গায়ে পিঠ লাগিয়ে ওদের দু'জনকে দাঁড় করালো। ওদের বন্দুকগুলো ভরলো, ভদ্রলোকটি ছোট একটা কাঁচি দিয়ে হাতের নখ কাটতে কাটতে কাছেই দাঁড়ালো, হাতগুলো তার খুবই সাদা। আমি তাকে বললাম:

"হুজুর, ওদের জামা কাপড়গুলো খুলে ফেলতে দিন। জামাকাপড়গুলো ভালো আছে, গরিব মানুষ আমরা, আমাদের কাজে লাগবে, ওগুলো পরবো আমরা।

"ওগুলো ওরা খুলে ফেলতে পারে।'

"আনিকেই তার পাৎলুনটা খুলে ফেললো তারপর সেটা উলটো করে ঝুলিয়ে বেড়ার গায়ে রাখলো। তার তামাকের থলি পকেট থেকে বার করে সে একটা সিগারেট ধরালো তারপর ধোঁওয়ার চক্র তৈরি করতে করতে, থুথু ফেলতে ফেলতে পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়ালো। সেমিয়ন জামাকাপড় সব খুলে উলঙ্গ হয়ে গেলো; এমন কি তার অর্ন্তবাস পর্যন্ত খুলে ফেললো, কিন্তু কি করে জানিনা সে টুপিটা খুলতে ভুলে গিয়েছিল, স্পষ্টই বোঝা গেলো যে সে ভুলেই গিয়েছিল। এক মুহূর্ত আমি শীতে কাঁপছি, আর পর মুহূর্তে আমি গরমে দগ্ধ হচ্ছি। আমি আমার মাথাটা চেপে ধরলাম, যে কোন কারণেই হোক আমার ঘামটা ছিল ঠাণ্ডা, ঝরনার জলের মতোই ঠাণ্ডা। আমি তাকাই আর দেখি ওরা ওখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। সেমিয়নের বুক ভর্তি লোম, উলঙ্গ কিন্তু মাথায় টুপি। আনিসিয়া মেয়ে সুলভভাবেই তাকিয়ে দেখলো তাঁর স্বামী টুপি মাথায় উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে ওকগাছের গা বেয়ে ওঠা হুপ-লতার মতো স্বামীকে জড়িয়ে ধরলো। সেমিয়ন তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললো:

"সরে যা পাগলী! সকলের সামনে কি করছিস একবার চিন্তা করে দেখ। ঐভাবে আমার কাছে ধেয়ে আসছিস দেখছিস না আমি উলঙ্গ হয়ে আছি ... ভারী লজ্জার কথা ...।'

"কিন্তু আনিসিয়া তার চুল ছিঁড়তে লাগলো আর তার স্বরে চিৎকার করতে লাগলো ঃ

"আমাদেব দুজনকেই গুলি করে মারো।'

"ভদ্রলোকটি তার কাঁচিটা পকেটে পুরে জিজ্ঞাসা করলো ঃ

"তোমাকেও গুলি করে মারবে?'

"করো গুলি, গোল্লায় যাও তুমি।'

আনিসিয়া ভদ্রলোকটিকে বললো।

"ওকে ওর স্বামীর সঙ্গে বাঁধো', সে হুকুম দিলো।

"তখন আনিসিয়ার হুঁস হলো, সে পিছু হঠলো ; কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে! কসাকেরা তাকে তার স্বামীব সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে হেসে উঠলো। আনিসিয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, বোকা মেয়েটা সাথে সাথে তার স্বামীকেও মাটিতে ফেলে দিলো। ভদ্রলোকটি তাদের কাছে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞাসা করলো ঃ

"যে বাচ্ছাটাকে তোমরা রেখে যাচ্ছো তার মুখ চেয়েও হয়তো তোমরা ক্ষমা চাইবে।'

"আমি তাই চাইছি', সেমিয়ন আর্তনাদ করে উঠলো।

"ভালো, তাহলে সেটা ভগবানের কাছে চাইতে হবে, আমাব কাছে চাওয়ার পক্ষে অনেক দেবি হয়ে গেছে।'

"আর মাটিতে শোয়া অবস্থাতেই তাদের গুলি করে মারা হলো। প্রথম গুলিটাব পরে আনিকেই টলছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে যায়নি। প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল, তারপর হঠাৎ উলটে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোকটি তার কাছে গিয়ে খুব অনুকম্পা ভরা গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল ;

"তুমি কি বাঁচতে চাও? যদি চাও তো ক্ষমা চাও। 'আর পঞ্চাশ ঘা বেত, তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাও!'

"আনিকেই মুখের মধ্যে অনেকখানি থুথু জমিয়ে ছিল ; কিন্তু ভদ্রলোকটির দিকে সেটা ছুঁড়ে দেবার মতো শক্তি তার ছিল না, সেটা তার দাড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়লো। রাগের চোটে সে একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাতে আর লাভ কি হলো। তার শরীর ফুঁড়ে তিনটে গুলি চলে গিয়েছিল।

"ওকে রাস্তায় টেনে নিয়ে যাও', ভদ্রলোকটি হুকুম চালালো।

"কসাকেরা ওটে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বেড়ার ওপর দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ইতিমধ্যে কসাকদের একটা কোম্পানি পপলাবোভকা থেকে গাড়ি চালিয়ে গ্রামে এলো, তাদের সঙ্গে দুটো কামান ছিল। ভদ্রলোকটি মোরগের মতো লাফিয়ে বেড়ার ওপর উঠে পরিত্রাহি চিৎকার করলো ঃ

'ড্রাইভার, গাড়ি চালাও জোরসে। ওকে ঘুরে যেওনা।'

'আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে গেলো। আমি দুহাত দিয়ে সেমিয়নের জামাকাপড় আর বুটজোড়াটা চেপে ধরেছিলাম কিন্তু আমার পা দুটো আমাকে ধরে

রাখতে পারলো, আমার তলা থেকে বেঁকে দুমড়ে গেলো। ঘোড়াগুলো ওদের মধ্যে ঐশ্বরিক একটা স্ফুলিঙ্গ ছিল, ওদের মধ্যে একটাও আনিকেইকে মাড়িয়ে গেলো না, সবকটাই তাকে টপকে গেলো। আমি বেড়ার গায়ে ঢলে পড়লাম, চোখ বন্ধ করতে পারছিলাম না, মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গিয়েছিল ···। কামানের গাড়ির চাকাগুলো আনিকেইয়ের পা দু'খানার ওপর দিয়ে চলে গেলো। পা দু'খানা মুখের মধ্যে রাই বিস্কুট চিবানোর মতো মড়মড় শব্দ করে উঠলো, ছোট ছোট টুকরো হয়ে গুঁড়িয়ে গেলো। ভেবেছিলাম মারাত্মক যন্ত্রণায় সে নিশ্চয় মরেই যাবে, কিন্তু সে এমনকি চিৎকার পর্যন্ত করেনি, গোঙায়নি পর্যন্ত ···। দেহের মধ্যে মাথাটা গুঁজে সে শুয়েছিল, আর মুঠো মুঠো রাস্তার ধুলো নিয়ে মুখের মধ্যে পুরছিলো। মাটি কামড়াচ্ছিল আর ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়েছিল, তার চোখের পলক পড়ছিল না, চোখ দুটো তার ছিল উজ্জ্বল আর আকাশের মতো শান্ত ···।

"বত্রিশজনকে মিঃ টমিলিন সেদিন গুলি করে হত্যা করেছিল। একমাত্র আনিকেই বেঁচে ছিল শুধু তার ঔদ্ধত্যের জন্য।

বৃদ্ধ জাখার তার মগে দীর্ঘ আর তৃষ্ণার্ত একটা চুমুক দিলো। তার বিবর্ণ ঠোঁটদুটো মুছে সে অনিচ্ছার সঙ্গে শেষ করলো।

'সময়ে সব কিছু ঢাকা পড়ে গিয়েছে। যা পড়ে আছে তা হলো ঐ পরিখাগুলো — যেগুলোর মধ্যে আমাদের কৃষকেরা লড়াই করেছিল আর জমি দখলে এনেছিল। সেগুলোর মধ্যে ঘাস জন্মাচ্ছে আর জন্মাচ্ছে স্তেপভূমির গুল্ম ···। আনিকেইয়ের পা দুটো ওরা বাদ দিয়ে দিয়েছে, এখন সে হাতে ভর দিয়ে চলে, দেহটাকে মাটির ওপর দিয়ে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে। দেখে তাকে বেশ প্রফুল্লই মনে হয়, প্রতিদিন সেমিয়নের বাচ্চা ছেলে দরজার গায়ে দু'জনের মাপ নেয়। ছেলেটা খুব তাড়াতাড়ি ওর থেকে লম্বা হয়ে যাচ্ছে ···। শীতকালে আনিকেই বুকে হেঁটে গলিতে বেরিয়ে যেতো, লোকেরা যখন গোরু মোষদের নদীতে জল খাওয়াতে নিয়ে যেতো তখন সে তাদের দেখে হাত তুলতো আর রাস্তার ওপর ছুটে গিয়ে বসে থাকতো। আতঙ্কে বলদগুলো বরফের ওপর ছুটে গিয়ে পিছল জমির ওপর নিজেদের একেবারে নাকাল করে ফেলতো ; কিন্তু সে শুধু হাসতো। একদিন কিন্তু একটা দৃশ্য আমার চোখে পড়েছিল ···। বসন্তকালে আমাদের কমিউনের ট্রাক্টর কসাকদের সীমানার ধার বরাবর জমি চষছিল, সে নিজেকে ট্রাক্টরের সঙ্গে বেঁধে ওটায় চড়ে ওখানে চলে গিয়েছিল। কিছুটা দূরে আমি ভেড়া চরাচ্ছিলাম। দেখলাম ওরা আমার আনিকেইকে চষা জমির ওপর নামিয়ে দিলো। ভাবছিলাম ও কি করবে। দেখলাম ও চারিদিকে তাকালো, আশেপাশে কাউকে কোথাও না দেখে, সে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো, মাটির সেই ঢেলাগুলো — লাঙ্গলের ফলা যেগুলোকে উলটে গেছে—তাদের বুকে চেপে ধরলো, ঢেলাগুলোর গায়ে হাত বোলালো, তাদের চুমু খেলো ···। ওর বয়স এখন পঁচিশ বছর, কিন্তু আর কখনও জমি চষতে পারবে না ···। আর সেটাই ওর খারাপ লাগে।'

আশমানি স্তেপভূমি ধোঁয়াটে নীলাভ গোধূলিতে ঝিমোচ্ছে, শুকিয়ে আসা থাইমের

ওপর থেকে মৌমাছিরা তাদের দিনের শেষ ফসল আহরণ করছে। ফুলো ফুলো হালকা রঙের চুলওয়ালা পালক-ঘাস উদ্ধতভাবে তাদের পালকের চুলের গোছা দোলাচ্ছিল। একপাল ভেড়া পপলারোভকার দিকের পাহাড় বেয়ে আস্তে আস্তে নেমে এলো। বৃদ্ধ জাখার আর একটা কথাও না বলে, তার লাঠিতে ভর দিয়ে চলে গেলো। রাস্তার ওপরে পাতা সূক্ষ্ম কারুকার্য করা ধূলোর তোয়ালের ওপর আমি অনেক চিহ্ন দেখতে পেলাম ঃ একটা ছিল নেকড়ের পায়ের ছাপের মতো, একটার পর একটা, ফাঁক ফাঁক আর বহু বিস্তৃত ; অপরটা রাস্তাটাকে তির্যক ডোরায় টুকরো টুকরো করে গেছে ঃ পপলারোভকা ট্রাক্টরের চাকার চিহ্ন।

যেখানে গরমকালের রাস্তা গিয়ে মিশেছে বিস্তৃত, কলাগাছ জন্মানো হেটম্যানের বড় রাস্তায়, সেখানে দুটো চিহ্ন পৃথক হয়ে গেছে। নেকড়ের পায়ের ছাপ চলে গেছে সবুজ, দুর্ভেদ্য কাঁটা আর গুল্মের ঘন ঝোপে আচ্ছন্ন একটা খাদের মধ্যে, রাস্তার ওপর ফেলে রেখে গেছে, প্যারাফিনের ধোঁওয়ার শ্বাসরুদ্ধকর আর গন্ধওয়ালা একটা চিহ্ন।

[মিখাইল শোলোকভের The Azure Steppe গল্পটির ছায়াবলম্বনে।]

ঘৃণা

রচনা : মিখাইল শোলোকভ

"শত্রুকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতে না শিখলে তাকে পরাজিত করা যায় না।"
(পিপলস কমিসার অফ ডিফেন্স -- ইউ এস এস আর
জে স্তালিন — এ অর্ডার অব দ্য ডে, মে ডে, ১৯৪২)

যুদ্ধের সময় মানুষের মতো গাছদেরও নিজ নিজ ভাগ্য থাকে। আমি দেখেছি বিশাল এক বনভূমিকে আমাদের কামানের গোলায় ধ্বংস হয়ে যেতে। খুবই সম্প্রতি, অমুক গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়ে জার্মানরা এখানে বেশ ভালোভাবে গেড়ে বসেছিল. ভেবেছিল বহুদিন থাকবে এখানে, কিন্তু গাছগুলোর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু তাদেরও ধ্বংস করে দিয়েছিল। ভাঙা গুঁড়িগুলোর তলায় মৃত জার্মানরা পড়েছিল, ফার্ন আর ব্র্যাকেন-এর সজীব শ্যামলিমার মধ্যে তাদের খণ্ডবিখণ্ড দেহগুলো পচছিল ; কামানের গোলায় বিদীর্ণ পাইন গাছগুলোর আঠার সুগন্ধ ঐসব পচা দেহগুলোর শ্বাসরুদ্ধ করা, অস্বাস্থ্যকর তীব্র পূতিগন্ধ ঢেকে দিতে ব্যর্থ হচ্ছিল। গোলার আঘাতে সৃষ্ট তার মেটে রঙের পোড়া আর ক্ষণভঙ্গুর ধারওয়ালা গর্তগুলো নিয়ে, মনে হচ্ছিল মাটি যেন কবরের গন্ধ নিঃসারিত করছে ....।

আমাদের গোলার আঘাতে সৃষ্ট আর কর্ষিত ঐ ফাঁকা জায়গাটায় বিরাজ করছিল নীরব আর মহীয়ান মৃত্যু ; কিন্তু ঐ ফাঁকা জায়গাটারই ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল নিঃসঙ্গ এক সিলভার বার্চ, কোন এক অলৌকিক ঘটনা বলে টিঁকে গিয়েছিল আর গোলার টুকরোর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত শাখাগুলোকে বাতাসে নাড়া দিচ্ছিল আর তার চকচকে, চটচটে কচি পাতাগুলোর মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছিল।

খোলা জায়গাটার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। আমার একটু আগে এক তরুণ সিগনালার হালকাভাবে বার্চের গুঁড়িটা স্পর্শ করে আন্তরিক, সস্নেহ বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল, "এর মধ্যে দিয়ে কি করে বেঁচে বেরিয়ে এলে, তুমি ?"

কিন্তু একটা পাইন গাছের গায়ে গোলা লাগলে সেটা, যেন কাস্তে দিয়ে তাকে কাটা হয়েছে এমনিভাবে পড়ে যায়, রেখে যায় তার গা বেয়ে আঠা গড়ানো টুকরো হয়ে যাওয়া গাছের গোড়াটা, ওক গাছ মৃত্যুবরণ করে অন্যভাবে।

জার্মান কামানের এক গোলা নামহীন এক নদীর ধারের প্রাচীন একটা ওক গাছের ওপর এসে পড়েছিল। হাঁ করা এবড়োখেবড়ো ক্ষতটা অর্ধেকটা গাছের প্রাণশক্তি শুষে নিয়েছিল কিন্তু বাকি অর্ধেকটা বিস্ফোরণের ঘায়ে নদীর ওপর ঝুঁকে পড়ায়, বসন্তকালে আবার চমৎকারভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, আর পাতায় পাতায় ছেয়ে গিয়েছিল। আজও পর্যন্ত নিঃসন্দেহে, অঙ্গহীন সেই ওক গাছটির নিচের দিকের শাখাগুলো স্রোতের জলে স্নান করে আর ওপর দিকের শাখাগুলো সাগ্রহে সূর্যের দিকে তাদের খোদাই করা পাতাগুলো বিস্তার করে দেয়।

দীর্ঘকায়, কিছুটা নুয়ে পড়া, উঁচু উঁচু চওড়া কাঁধ দুটোয় তার চিলের মতো কেমন একটা ভাব যেন ছিল। লেফটেন্যান্ট গেরাসিমভ ট্রেঞ্চে ঢোকার মুখটাতে বসে, শত্রুর সেদিনের ট্যাঙ্ক আক্রমণ তার ব্যাটিলিয়ান যেটাকে প্রতিহত করেছিল তারই অবস্থাগত একটা বিবরণ আমাদের দিচ্ছিল।

তার শীর্ণ মুখটা ছিল শান্ত, প্রায় নিরাসক্ত বলা যায়, তার আরক্ত চোখদুটো ক্লান্তিতে কুঞ্চিত। গুরুগম্ভীর গলায় সে কথা বলছিল আর মাঝে মাঝে তার গ্রন্থিল লম্বা লম্বা আঙুলগুলো অন্য হাতের আঙুলগুলো জড়িয়ে ধরছিল ; অব্যক্ত দুঃখ কিংবা গভীর এবং বেদনাদায়ক চিন্তাভাবনাব অত্যন্ত বাঙ্ময় এই ভঙ্গি আশ্চর্যজনকভাবে, তার শক্তিশালী কাঠামো, তার পুরুষোচিত তেজোদ্দীপ্ত মুখ -- এর কোনটার সঙ্গেই খাপ খাচ্ছিল না।

হঠাৎ সে কথা বলা বন্ধ করলো, তার মুখে একটা পরিবর্তন দেখা গেল ; তার রোদে পোড়া গালগুলো ফ্যাকাশে হয়ে গেল, পেশিগুলো কেঁপে উঠলো আর সামনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখদুটো প্রচণ্ড, দুর্দমনীয় এমন একটা ঘৃণায় জ্বলে উঠলো যে আমিও অনিচ্ছাকৃতভাবে তার দৃষ্টি অনুসরণ করার জন্য ঘুরে তাকালাম। আমাদের প্রতিরোধের অগ্রবর্তী সীমানার থেকে তিনজন জার্মান বন্দী জঙ্গল পার হচ্ছিল রোদে জ্বলা গ্রীষ্মের টিউনিকপরা, ট্রেঞ্চ ক্যাপ মাথার পিছনে হেলানো এক রেড আর্মির সৈনিকের তত্ত্বাবধানে।

রেড আর্মির সৈনিকটি মন্থরগতিতে, ছন্দময়ভাবে তার রাইফেল দোলাতে দোলাতে হেঁটে চলেছিল, সূর্যের আলোয় তার বেয়নেটটা বিপজ্জনকভাবে ঝলকে উঠছিল। জার্মানরাও হেঁটে চলেছিল মন্থর গতিতে, অনিচ্ছুকভাবে, তাদের হলদে রঙের কাদামাখা নিচু নিচু বুটজুতো পরা পাগুলো টেনে টেনে।

ট্রেঞ্চের কাছে পৌঁছতেই, সামনে যে জার্মান বন্দীটি হাঁটছিল বাদামী রঙের গোঁফদাড়ি ভর্তি বসা গালে বয়স্ক একটি লোক -- আমাদের দিকে জ্বলন্ত হিংস্র দৃষ্টিতে তাকালো, তারপর চট করে ঘুরে নিজের বেল্টে ঝোলানো হেলমেটটা ঠিক করলো। লেফটেন্যান্ট গেরাসিমভ লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রেড আর্মি সৈনিকটির উদ্দেশ্যে চীৎকার করে উঠেছিল :

"কি করছো কি ? ওদের হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছো। অনেক হয়েছে এবার কেটে পড়ো, আর বেশ তাড়াতাড়ি করেই !"

স্পষ্টতই সে আরো কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু দারুণ রাগে সে দম হারিয়ে ফেলেছিল। চট করে ফিরে সে দৌড়ে ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ এক লেফটেন্যান্ট যে ওখানে উপস্থিত ছিল, নিজের থেকেই আমার সুবিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তর দিয়েছিল।

"এ ব্যাপারে কিছু করার নেই", নিচু গলায় সে বলেছিল। "ওটা ওর নার্ভাস এর ব্যাপার। জার্মানরা ওকে বন্দী করেছিল -- তুমি সেটা জানতে না? ওর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখো। সেখানে অনেক কিছু ভয়াবহ ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে ওকে যেতে হয়েছে, আর তারপর থেকে, স্বাভাবিকভাবেই জীবন্ত কোনো জার্মানকে ও সহ্য করতে পারে না — হ্যাঁ, কোনো জীবন্ত জার্মান। মৃত কোনো জার্মান-এর দিকে তাকাতে ওর কিছু মনে হয় না। বলা যেতে পারে, তার থেকেও খানিকটা পরিতৃপ্তি পায়, কিন্তু বন্দীদের ওপর একবার যদি ওর চোখ পড়ে তাহলে হয় ও চোখ বন্ধ করে ফেলে নয়তো মড়ার মতো ফ্যাকাশে মেরে যায়, কিংবা ঘুরে চলে যায়।"

লেফটেন্যান্ট আমার আরো কাছে এসে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল। "ওর সঙ্গে আমি দু'বার যুদ্ধ করতে গিয়েছি। ও একেবারে একটা ঘোড়ার মতোই শক্তি ধরে, আর ও যে কি করে সেটা তুমি একবার দেখলে পারো ....। আমার কালে আমি অনেক কিছু দেখেছি কিন্তু ও যেভাবে ওর চারদিকে বন্দুকের কুঁদো আর বেয়নেট চালায় — আমি তোমাকে বলছি সেটা একেবারে ভয়ঙ্কর।"

সেই রাত্রে জার্মান ভারী কামানগুলো বিরক্তিকর গোলাবর্ষণ চালিয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ বাদে বাদেই শোনা যাচ্ছিল দূরে চাপা গুড়গুড় একটা শব্দ, আর তার খানিকক্ষণ বাদেই মাথার ওপরকার তারাভরা আকাশে কামানের গোলার তীক্ষ্ণ একঘেঁয়ে ঘ্যানঘ্যানানির শব্দ, শব্দটা একেবারে তুঙ্গে উঠে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছিল তারপর আমাদের পিছনে বড় রাস্তার দিকে, দিনের বেলায় যেটা যুদ্ধরত সৈনিকদের সামনের সারিতে গোলাবারুদ বয়ে আনা ট্রাকগুলোয় ছেয়ে থাকতো, তারই কোথাও হলদে রঙের আগুনের একটা ঝলক দেখা যাচ্ছিল আর কানে আসছিল বাজ পড়ার মতো একটা বিস্ফোরণের শব্দ।

গোলাগুলোর মাঝখানের বিরতিতে, জঙ্গল নিশ্চুপ হয়ে গেল, আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম ডাঁশ মশার তীক্ষ্ণ ভনভনানি আর কাছেরই জলা থেকে সচকিত ব্যাঙেদের ডাক।

একটা হেজেল-এর ঝোপের কাছে আমরা শুয়েছিলাম আর লেফটেন্যান্ট গেরাসিমভ ছোট্ট একটা ডাল দিয়ে মশা তাড়াতে তাড়াতে, ধীরভাবে আমাদের তার গল্প বলছিল। সেই গল্পটার যতটা আমার মনে আছে ততটা আমি এখানে লিখছি।

"যুদ্ধের আগে পশ্চিম সাইবেরিয়ার এক কারখানায় আমি ছিলাম এক মেকানিক। গত বছর, সঠিকভাবে বলতে গেলে — ১৯৪১ সালের ৯ই জুলাই সেনাবাহিনী থেকে আমার ডাক আসে। আমার স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার পরিবার, আর তার ওপর আমার বাবা আছেন, তিনি আবার পঙ্গু। তবে আমাকে বিদায় দেবার

সময় আমার স্ত্রী অবশ্যই একটু কান্নাকাটি করেছিল, আর আমাকে বলেছিল, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত নিজের দেশ আর দেশবাসীদের রক্ষা করার জন্য লড়াই করে যেয়ো। তোমার যদি প্রাণও দিতে হয় তাহলেও যে করেই হোক আমাদের জিততেই হবে।" আমার মনে পড়ে, তার কথায় হেসে ফেলে আমি বলেছিলাম, "তুমি নিজেকে আমার স্ত্রী বলে মনে করো না কি পরিবারের আন্দোলনকারী বলে মনে করো ? আমার তো মনে হয় আমি কি করতে যাচ্ছি সেটা বোঝার মতো বয়স আমার হয়েছে, আর জেতার কথা বলছো — আমরা ঐ ফ্যাসিস্তগুলোর গলা টিপে ধরে যুদ্ধ জিতে আসবো, সে নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না।"

"আমার বাবা অবশ্য আরো কঠিন ধাতুতে তৈরি, কিন্তু তার কাছ থেকেও কিছু উপদেশ না শুনে ছাড়া পেলাম না। মনে রেখো ভিক্টর, বাবা বলেছিল, 'গেরাসিমভ পরিবারের লোকরা একেবারে ফেলনা নয়। বংশপরম্পরায় তুমি হলে একজন শ্রমজীবী, তোমার ঠাকুর্দার বাবা কাজ করতো স্ট্রগোনভের জন্য ; শত শত বছর ধরে আমাদের পরিবার দেশের লোহা বানাচ্ছে, আর এই যুদ্ধে তোমাকেও হতে হবে সেই লোহার মতো। আমাদের সরকার আমাদেরই তৈরি, যুদ্ধ শুরু হবার আগে তোমাকে তারা রিজার্ভ-এর কমান্ডার হিসাবে রেখেছিল, এখন শত্রুকে তোমার উচিত শিক্ষা দিতে হবে।'

"আমরা তাই করবো বাবা" আমি বলেছিলাম।

স্টেশনে যাবার পথে আমি ডিস্ট্রিক্ট পার্টি কমিটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে থেমেছিলাম। আমাদের সেক্রেটারি ছিল, নীরস, কাঠখোট্টা গোছের লোক, যুক্তি করতেই ভালবাসতো — আমার স্ত্রী আর বাবা যদি বিদায়কালীন উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে না পেরে থাকে, তাহলে ঐ মানুষটি কমপক্ষে আধঘণ্টার একটা বক্তৃতা না দিয়ে কি আমাকে ছাড়তে পারবে। কিন্তু ঠিক তার উলটোটাই ঘটেছিল। 'বসো, গেরাসিমভ', সে বলেছিল। 'আগেকার দিনে কোথাও যাত্রা করার আগে দু-এক মিনিট বসার প্রথা ছিল।"

"আমরা চুপ করে খানিকক্ষণ বসেছিলাম, তারপর সে উঠে দাঁড়ালে দেখেছিলাম তার চশমার কাঁচগুলো কেমন যেন ঝাপসা লাগছে ......। আরে, আমি ভাবছিলাম, এতো অদ্ভুত সব ব্যাপার দেখছি। তারপর সে বলেছিল, 'বেশি কিছু বলার নেই কমরেড গেরাসিমভ, তোমাকে মনে পড়ে তুমি যখন এতটা লম্বা ছিলে, গলায় পায়োনীয়ারের লাল টাই পরা ঝুলো ঝুলো কান এক বাচ্চা মাত্র। তারপর তোমাকে ইয়ং কমিউনিস্ট লিগের একজন সদস্য হিসাবে মনে পড়ে, আর এখন প্রায় দশ বছর ধরে তোমাকে পার্টির সদস্য হিসাবে জানি। ঐ জার্মান শূয়োরদের প্রতি কোনো দয়ামায়া দেখিও না। তোমার ওপর পার্টি সংগঠনের পূর্ণ আস্থা আছে।' এই প্রথমবার আমরা পরস্পরকে চুম্বন করলাম — আর কেন জানি না সেক্রেটারিকে আর অমন নীরস বলে মনে হচ্ছিল না।

"অমন সস্নেহে আমার সঙ্গে কথা বলায় আমি বেশ খুশি মনে ডিস্ট্রিক্ট কমিটির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।"

আমার স্ত্রীও আমার মনটা অনেক ভালো করে দিয়েছিল। রণক্ষেত্রগামী স্বামীকে বিদায় দেওয়াটা কোনো স্ত্রীর পক্ষেই বিশেষ করে আনন্দজনক নয় এটা তো তুমি ভালো করেই বুঝতে পারো। আর আমার স্ত্রীও একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল, সে সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা বলতে চাইছিল কিন্তু কিছুই তার মাথায় আসছিল না। ট্রেনটা তখন চলতে শুরু করেছিল আর সেও ট্রেনের সাথে সাথে ছুটে চলেছিল, কিছুতেই আমার হাত ছাড়ছিল না আর একনাগাড়ে বলে চলেছিল:

'ভিটিযা নিজেকে দেখাশোনা কোরো, আব যুদ্ধ করতে গিয়ে যেন ঠাণ্ডা লাগিও না।' 'সত্যি, নাদিযা আমাকে তুমি কি মনে করো? ঠাণ্ডা লাগানোব কথা তো চিন্তাই কবা যায় না। ওখানেব আবহাওয়া তো খুবই স্বাস্থ্যকব আর মাঝামাঝি ধরনের।' ওকে ছেড়ে যাচ্ছি বলে আমার মন খারাপ লাগছিল কিন্তু একই সঙ্গে ওব মিষ্টি বোকা-বোকা কথায় মনটা আবার বেশ ভালোও লাগছিল। তারপর জার্মানদের প্রতি ঠাণ্ডা একটা বাগ আমাকে পেযে বসেছিল। 'আমাদের বিশ্বাসঘাতক প্রতিবেশীর দল, তোমরাই যখন যুদ্ধটা প্রথমে শুরু করেছো — তখন সাবধান।' আমি মনে মনে ভাবছিলাম: 'এমন ধোলাই দেবো যে তোমরা জীবনে কখনো ভুলতে পারবে না।'

কিছুক্ষণের জন্য সে চুপ করে ছিল, সীমানায় আকস্মিক মেশিনগানের গুলি বিনিময়ের শব্দ শুনছিল। যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি আকস্মিকভাবেই শব্দটা থেমে গিয়েছিল।

"যুদ্ধের আগে আমরা জার্মানি থেকে সাধারণ যন্ত্রপাতি পেতাম। সেগুলো একত্রিত করার সময় আমি প্রতিটি অংশ পাঁচ-ছ'বার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবদিক থেকে দেখতাম। ঐসব যন্ত্রপাতিগুলো যে দক্ষ হাতের তৈরি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। আমি জার্মান লেখকদের লেখা বই পড়তাম আর কেমন করে জানি জার্মানির লোকদের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠেছিল। এটা অবশ্য ঠিকই যে আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম এমন গুণী আর পরিশ্রমী একটা জাতকে ঐ জঘণ্য হিটলারী শাসন সহ্য করতে হচ্ছে ....। কিন্তু সেটা যাই হোক না কেন, তাদের নিজেদের ব্যাপার...। তারপর পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

"যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পথে আমি চিন্তা না করে পারছিলাম না : ওদের সৈন্যবাহিনী দুর্বল নয় আর প্রযুক্তিগত দিক থেকেও ওরা বেশ শক্তিমান। আর ভেবে দেখতে গেলে ঐ রকম এক শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা আর তাদের পাঁজরা ভেঙে দেওযা সত্যিই খুব আকর্ষণীয় ব্যাপার। আমরাও ১৯৪১ সালে অতটা সরল ছিলাম না। অবশ্য, আমাকে এটা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের এই প্রতিপক্ষের কাছ থেকে খুব বেশি রকমের সততা আশা করিনি — ফ্যাসিবাদের কাছ থেকে ঐ ধরনের কোনো কিছু আশা করতে পারা যায় না— কিন্তু তাহলেও জার্মানদের মতো এইরকম নীতিজ্ঞানহীন একটা প্রতিপক্ষের সঙ্গে যে আমাকে লড়াই করতে হবে একথা আমি কখনো চিন্তাই করিনি। আমরা পরে সেই প্রসঙ্গে আসছি ......।

"জুলাই মাসের শেষে আমাদের দলটি যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছায়। ২৭ তারিখের ভোরে

আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করি। প্রথমে, নতুন ছিলাম বলে — ব্যাপারটা বেশ একটু ভয়াবহ হয়েছিল। ওদের ট্রেঞ্চ মর্টার (ট্রেঞ্চে গোলানিক্ষেপকারী এক অস্ত্র) দিয়ে আমাদের একেবারে নাজেহাল করে দিয়েছিল, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে, আমরা ব্যাপারটা খানিকটা বুঝতে পেরে, ওদের খানিকটা কাবু করে দিয়েছিলাম, আর গ্রামগুলোর একটা থেকে ওদের তাড়িয়ে দিয়ে ছিলাম। ঐ যুদ্ধে আমরা একটা দলকে — সব মিলিয়ে জনা পনেরোর মতো হবে -- বন্দী করেছিলাম। ঘটনাটা যেন এইমাত্র ঘটলো এমনি পরিষ্কারভাবে আমার মনে আছে। ওদের নিয়ে এসেছিল — খুবই আতঙ্কিত আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল ওদের। আমার লোকজন ততক্ষণে অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই নিজেদের জিনিস থেকে কিছু না কিছু বন্দীদের দিয়েছিল : খানিকটা তামাকপাতা কিংবা একটা সিগারেট, কেউ আবার তাদের চাও দিয়েছিল। আর ওরা তাদের পিঠ থাবড়ে তাদের 'কামরাড' বলে ডেকেছিল। "তোমরা লড়াই করছো কেন, কামরাড?" ঐ ধরনের সব কথা বলেছিল।

"আমাদের মধ্যে থেকে একজন, অনেকদিন ধরে যে সৈন্যবাহিনীতে আছে, খানিকক্ষণ ধরে এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখে বলে উঠেছিল : 'তোমাদের ঐসব বন্ধুদের দেখে নাল ফেলাটা একটু বন্ধ করো তো। এখানে ওরা সকলেই "কামরাড" বনে যাচ্ছে। একটু সবুর করো, ওদের নিজেদের লাইনের পিছনে ওরা কি করছে, আমাদের আহত লোকদের আর অসামরিক লোকদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করছে সেটা আগে দেখো। তার কথা শুনে আমাদের মনে হয়েছিল কে যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল আমাদের গায়ে ঢেলে দিয়েছিল। তারপর সে ওখান থেকে চলে গিয়েছিল।

'তারপর শীঘ্রই আমাদের সৈন্যবাহিনী একটা আক্রমণ শুরু করেছিল আর তখনই আমরা সত্য করেই দেখতে পেয়েছিলাম ওরা কি করছে .... গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে, শত শত মহিলা, শিশু আর বৃদ্ধদের গুলি করে মেরেছে, রেড আর্মির বন্দীদের মৃত দেহগুলোর অঙ্গহানি করেছে, মহিলা আর বালিকা, তাদের মধ্যে অনেকেই নেহাৎ শিশু বললেই চলে, তাদের ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

"একজনের কথা বিশেষকরে আমার মনে পড়ে : প্রায় এগারো বছরের এক বালিকা। ও নিশ্চয় স্কুলে যাচ্ছিল যখন, জার্মানরা ওকে একটা বাগানের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়, ধর্ষণ করে আর তারপর হত্যা করে। ওখানে সে পড়েছিল আলুক্ষেতের মধ্যে, থেঁতলে যাওয়া আলুর চারাগুলোর ওপর, ছোট্ট একরত্তি একটা জিনিস, নেহাৎই শিশু, চারপাশে তার রক্ত ছেটানো বইগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল ....। তার মুখটা একেবারে ভয়াবহ দেখাচ্ছিল, তলোয়ারের ঘায়ে ফালাফালা। তখন পর্যন্ত তার স্কুলের ব্যাগটা সে আঁকড়ে ধরেছিল, ব্যাগের মুখটা খোলা। আমরা তার দেহটা কেপ দিয়ে ঢেকে দিয়ে মিনিট দুয়েক নীরবে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর সৈন্যরা তেমনি নীরবে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমি রয়ে গিয়েছিলাম, আর মনে পড়ে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ফিসফিস করে সমানে বলে চলেছিলাম, বারকোভ আর পোলোভিনকিন।

'ফিজিক্যাল জিয়োগ্রাফি ম্যানুয়েল ফর হায়ার গ্রেস স্কুলস'। ঘাসের ওপর পড়ে থাকা বইগুলোর মধ্যে একটা নাম। যে বইটা আমি চিনতাম। কেন না আমার ছোট্ট মেয়েটা ফিফ্‌থ ফর্মে পড়তো ....।

"এটা ঘটেছিল রুজহিন এর কাছে। মাকভিরিতে, আমরা একটা নালার কাছে এসে পড়েছিলাম যেখানে ধরা পড়া রেড আর্মির লোকদের যৎপরোনাস্তি দৈহিক যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। তুমি নিশ্চয় কসাইখানায় গিয়েছো, যাওনি কি? তাহলে বুঝতে পারবে ঐ জায়গাটা কেমন দেখতে লাগছিল ....।

"ঐসব দেহের জমাট রক্তমাখা ধড়গুলো ঐখানের গাছগুলো থেকে ঝুলছিল। হাত-পাগুলো কুপিয়ে কেটে ফেলা হয়েছিল, গায়ের অর্ধেক চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল ....। আরো আটজনের দেহ নালার মধ্যে স্তূপাকার হয়ে পড়েছিল। কোন লোকের যে কোন অঙ্গ বলতে পারা যাচ্ছিল না। ওটা ছিল কাটা মাংসের একটা স্তূপ মাত্র। আর তার ওপর থালার মতো থাক থাক করে সাজানো ছিল রেড আর্মির আটটা ট্রেঞ্চ ক্যাপ ....।

"তুমি হয়তো মনে করো, আমি যা দেখেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। না, সেটা একেবারে অসম্ভব। সেটা বর্ণনা করার কোনো ভাষা নেই। সেটা তোমাকে নিজের চোখে দেখতে হবে। অনেক হয়েছে, এবার অন্য কথায় আসা যাক", লেফটেন্যান্ট গেরাসিমভ অনেকক্ষণ চুপ করেছিল।

"এখানে কি সিগারেট খাওয়া যায়?" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়, তবে আগুনটা যেন দেখা না যায়", নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে ভাঙা গলায় বলেছিল, তারপর বলে চলেছিল ঃ "তুমি বুঝতেই পারছো জার্মানরা যা করেছিল সে সব চোখে দেখার পর আমরা খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। সেটা তো অনুমানই করা যায়। এটা আমরা সকলেই বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা মানুষের সঙ্গে লড়াই করছি না, করছি কতকগুলো রক্তলোলুপ জঘন্য ইতর ধরনের প্রাণীর সঙ্গে। এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যে অধ্যবসায়ের সঙ্গে জার্মানরা লেদ মেশিন আর যন্ত্রপাতি বানাতো সেই অধ্যবসায়ের সঙ্গে তারা এখন আমাদের লোকেদের মেরে ফেলছে, ধর্ষণ করছে, হত্যা করছে। তারপর আবার আমাদের পিছু হটে আসতে হয়েছিল, কিন্তু তবু আমরা মরিয়া হয়ে সমানে লড়াই করে গিয়েছিলাম।

"আমাদের সৈন্যবিভাগটির প্রায় সকলেই ছিল সাইবেরিয়ার লোক। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউক্রেন মাটির প্রতিটি ইঞ্চির জন্য আমরা দৃঢ়ভাবে লড়াই করেছি। আমাদের এলাকার বহু লোকই ইউক্রেনে প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু জার্মানদের আরো বেশি মূল্য দিতে হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা হারছিলাম বটে কিন্তু ওদেরও আমরা খুবই বেগ দিচ্ছিলাম।"

তার সিগারেটে দু-একটা টান দিয়ে সে একটু অন্য ধারায় বলে চলেছিল।

"চমৎকার দেশ এই ইউক্রেন, আর দৃশ্যও সব দেখার মতো। ছোট বড় প্রতিটি গ্রামই আমাদের কাছে আমাদের নিজেদের গ্রামগুলোর মতোই প্রিয়। হয়তো তাদের

রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের রক্ত দিতে আমরা কার্পণ্য করিনি বলেই, লোকে বলে রক্তের বন্ধনই হলো প্রকৃত বন্ধন ....। আর ঐসব গ্রামগুলোর কোনো একটা থেকে আমাদের হঠে আসতে হতো তখন আমাদের বুকেব ভেতরটা টনটন করতো, অসহনীয়ভাবে টনটন করতো। দুঃখ হতো, সাংঘাতিক দুঃখ হতো। আমরা কি না এই জায়গাটা পরিত্যাগ করে যাচ্ছি, পরস্পরের চোখের দিকে আমরা তাকাতে পারতাম না।

"......... তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমি কখনো জার্মানদের হাতে বন্দী হবো। কিন্তু তাই ঘটেছিল। প্রথমে আমি আহত হই সেপ্টেম্বর মাসে, কিন্তু আমি আমার বিভাগের সঙ্গেই থেকে গিয়েছিলাম। পোলভাটা এলাকায় ডেনিসোভস্কার ধারে যুদ্ধ করার সময দ্বিতীয়বার আমি আহত হই, আর বন্দীও হই।

"জার্মান ট্যাঙ্কগুলো আমাদের সেনাবাহিনীর বাম পার্শ্বদেশ ভেঙে ফেলেছিল আর সেই ফাঁকটার মধ্যে দিয়ে তাদের পিছু পিছু জার্মান পদাতিক বাহিনী স্রোতের মতো হুড়মুড়করে ঢুকে এসেছিল। আমরা একেবারে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়ে গিয়েছিলাম তবু লড়াই করে আমরা তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। সেদিন আমার বিভাগটির বেশ বেশিরকম ক্ষতি হয়েছিল। আমরা দু'বার ট্যাঙ্ক আক্রমণ প্রতিহত করেছিলাম, শত্রুর ছ'টি ট্যাঙ্ক আর একটা সাঁজোয়া গাড়িতে আগুন লাগিয়ে কিংবা অচল করে দিয়েছিলাম আর একটা ভুট্টার ক্ষেতের মধ্যে প্রায় একশো কুড়িজনের মতো হিটলারবাদীদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলাম। কিন্তু এই সময় ওরা ওদের ট্রেঞ্চ মর্টার গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আসায় বেলা চারটে পর্যন্ত যে উঁচু জাযগাটা আমরা ধরে রেখেছিলাম সেটা পরিত্যাগ করতে হয়। সকাল থেকেই আবহাওয়া ছিল গুমোট। আকাশে এক ফোঁটা মেঘ ছিল না আর সূর্যের তাপ ছিল এতোটা প্রখর যে মনে হচ্ছিল যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সবেগে গোলার পর গোলা বর্ষিত হচ্ছিল, আর আমার মনে আছে আমরা এতোই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলাম যে আমাদের সৈনিকদের ঠোঁটগুলো ফুলে কালো হয়ে গিয়েছিল আর এমন ভাঙা গলায় আমি ওদের ওপর হুকুমদারি করছিলাম যে নিজেই নিজের গলা চিনতে পারছিলাম না। আমরা বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা পার হচ্ছিলাম এমন সময় একটা গোলা এসে ঠিক আমার সামনে ফাটলো। আবছাভাবে মনে পড়ে, আমি দেখলাম কালো মাটি আর ধূলোর একটা স্তম্ভ — সেই সব। গোলার একটা টুকরো আমার হেলমেটের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছিল, আর দ্বিতীয় একটা টুকরো আমার একেবারে ডান কাঁধে এসে লেগেছিল।

'কতক্ষণ যে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, আমার মনে নেই, জোরে জোরে পা ফেলার শব্দে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল।মাথা তুলে দেখলাম আমি যেখানে পড়ে গিয়েছিলাম সেখানে আর শুয়ে নেই। আমার টিউনিকটা নেই আর আমার কাঁধটা যেমন তেমন করে ব্যান্ডেজ করা। আমার হেলমেটটা উধাও হয়ে গেছে। আমার মাথায় একটা ব্যান্ডেজ জড়ানো আছে কিন্তু সেটা ঠিকমতো করে বাঁধা নেই, তারই

শেষপ্রান্তটা আমার বুকের ওপর এসে পড়েছে। আমার মাথায় এসেছিল আমার লোকজনেরা নিশ্চযই আমাকে মাঠ থেকে বয়ে নিয়ে এসেছে আর আনার সময় মাথায ব্যান্ডেজ করেছে। অনেক কষ্টে যখন মাথা তুললাম তখন তাদেরই দেখতে পাবো বলে আশা করেছিলাম। কিন্তু না, আমার দিকে ছুটে আসছিল আমাদের লোকেবা নয়, জার্মানরা। তাদেরই পায়ের শব্দে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। এবার আমি তাদের একেবারে পবিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম সিনেমার পর্দায় দেখার মতো কবে। আমি চারপাশ হাতড়েছিলাম : হাতেব কাছে রিভলবার বা রাইফেল কিংবা হ্যান্ড গ্রেনেড, এসব কিছুই ছিল না। কে যেন — হযতো আমারই বিভাগের কোনো লোক — আমার অস্ত্রগুলো আর আমার ডেসপ্যাচ কেসটা সরিযে নিয়ে গেছে।

"তাহলে এই হলো সমাপ্তি", নিজের মনে মনেই আমি ভাবছিলাম। সেই মুহূর্তে আর কি ভাবছিলাম? এটা যদি তুমি তোমার নতুন উপন্যাসের জন্য জানতে চাও তাহলে বলবো ফাঁকগুলো তুমি নিজেই পূরণ করে নাও। সত্যি বলতে কি, সেই মুহূর্তে কিছু চিন্তা কবার সমযই আমার ছিল না জার্মানবা কাছেই এসে গিযেছিল আব আমি শুয়ে মরতে চাইছিলাম না। সেটা আমি একেবারেই চাইছিলাম না। কিছুতেই আমি শুয়ে মরতে পাববো না, সেটা বুঝতে পেরেছো? তাই বহু চেষ্টা করে উঠে, নিজেকে খাড়া রাখার জন্য দু'হাত দিয়ে মাটির ওপর ভর করে হাঁটু গেড়ে বসেছিলাম।

"তারা যখন এসে আমার কাছে পৌঁছালো ততক্ষণে আমি উঠে দাঁড়িযেছি। হ্যাঁ, ওখানে আমি টলায়মান অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলাম আর ভীষণ ভয় হচ্ছিল যে কোনো মুহূর্তে হয়তো পড়ে যাবো আব পড়ে গেলে ওরা ওদের বেয়নেট দিযে আমাকে খতম করে দেবে। ওদেব একটা মুখও আমার মনে নেই। কথা বলতে বলতে হাসতে হাসতে ওরা আমাকে ঘিরে ধরেছিল। 'আমাকে মেরে ফেল, পাজি নচ্ছারের দল।' আমি চিৎকাব কবে উঠেছিলাম, 'আমি পড়ে যাবাব আগে আমাকে খতম করে দে।' তাদের মধ্যে থেকে একজন তার রাইফেলের বাঁট দিযে আমাকে মেবেছিল — কিন্তু কোনোরকমভাবে আমি আবার উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ওরা সশব্দে হেসে উঠেছিল। ওদের মধ্যে থেকে একজন হাত নেড়ে ইঙ্গিত করেছিল যেন সে বলেছিল : ভাগো এখান থেকে। আর আমিও চলে এসেছিলাম।

'আমার মাথার ক্ষতটা থেকে রক্ত গড়িযে পড়ে আমার মুখের ওপর জমাট বেঁধে ছিল, ওটার থেকে তখনও উষ্ণ, চটচটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। আমার কাঁধটাও ব্যথা করছিল, আর আমার ডান হাতটা তুলতে পারছিলাম না। এখন আমার মনে পড়ে আমি শুধু চাইছিলাম শুয়ে পড়তে, কোথাও না যেতে, কিন্তু তবু – আমি হেঁটে চলেছিলাম ....।

'না, আমি মরতে তো একেবারই চাইছিলাম না, আর তার থেকে বেশি চাইছিলাম না বন্দী হয়ে থাকতে। ভীষণভাবে চেষ্টা করে, মাথা ঝিমঝিমানি আর গা গোলানোর

ভাব দমন করে আমি এগিয়ে চলেছিলাম, তাহলে আমার মধ্যে জীবনীশক্তি এখনও আছে, আমি এখনও চলতে ফিরতে পারছি। কিন্তু ওঃ, পিপাসায় দারুণ কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমার মুখের ভেতরটা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল আর সমস্ত সময় আমাব পা-দুটো তাদের খুশিমতো চলছিল বটে, কিন্তু আমার চোখের সামনে অন্ধকার কুয়াশা যেন ভেসে বেড়াচ্ছিল। আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ার মুখে ছিলাম কিন্তু তবু আমি এগিয়ে চলেছিলাম, নিজের মনে মনে ভাবছিলাম, 'একটু জল আর একটু বিশ্রাম পেলেই আমি পালাবো।'

"আমরা যারা বন্দী হযেছিলাম, তাদের সকলকে জঙ্গলের ধারে এনে সার বেঁধে দাঁড় করানো হয়েছিল। আমাদের প্রতিবেশী ইউনিট থেকেও অনেকে ছিল। আমার রেজিমেন্ট থেকে শুধুমাত্র দু'জন লালসেনাকে চিনতে পেরেছিলাম — দু'জনেই ৩য় সৈন্যবিভাগের। বন্দীদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল আহত।

"একজন জার্মান লেফটেন্যান্ট ভাঙা ভাঙা রুশ ভাষায় জানতে চেযেছিল আমাদের মধ্যে কোনো কমিসার বা কমান্ডার আছে কি না। কেউ উত্তর দেয়নি। সে আবার ফাটা ফাটা ভাবে বলেছিল, "কমিসাররা, আর অফিসাররা — দু-পা এগিযে এসো!' কেউ নড়েনি।

"লেফটেন্যান্টটি লাইনের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়েছিল আর কতকটা ইহুদীদের মতো দেখতে পনেরো কি ষোলজন বন্দীকে বাছাই করেছিল। তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেছিল 'জুড (Jude)?' আর কোনো উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই তাদের লাইন থেকে বেরিয়ে আসতে বলেছিল। যে বন্দীদের মধ্যে সে বাছাই করেছিল তাদের মধ্যে শুধুমাত্র ইহুদীই ছিল না, ছিল আর্মেনিয়ান, রাশিয়ান যাদের রঙ কিছুটা মাটো আর চুল ছিল কালো। তাদের দূরে নিয়ে গিয়ে আমাদের চোখের সামনেই অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে গুলি করে মেরেছিল। তারপর দায়সারা গোছভাবে আমাদের তল্লাশি করে আমাদের পকেটবই আর ব্যক্তিগত যা কিছু ছিল সব হস্তগত করলো। আমার পার্টি কার্ডটা পকেটবুকে রাখার অভ্যাস কখনোই ছিল না; ওটা আমার প্যান্টের ভেতরকার একটা পকেটে ছিল তাই সেটা ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। সত্যি, মানুষ এক অদ্ভুত জীব। আমি নিশ্চিতভাবেই জানতাম আমার প্রাণটা একটা সুতোয় ঝুলছে, আর পালাবার চেষ্টা করতে গিয়েও যদি মারা না পড়ি তাহলেও পথেই মারা পড়বো—আমার এত রক্তক্ষয় হয়েছে আর আমি বাকিদের সঙ্গে তাল রাখতে পারবো না। অথচ তল্লাশি শেষ হয়ে যাবার পর যখন জানতে পারলাম যে পার্টিকার্ডটা তখনও আমার কাছেই আছে, তখন এত আনন্দ হলো যে আমার পিপাসার কথা আমি ভুলে গেলাম।

"পংক্তিতে বিন্যস্ত করে আমাদের পশ্চিমদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রাস্তার ধার দিয়ে ডজনখানেক জার্মান মোটর সাইক্লিস্ট সহ বেশ জবরদস্ত রক্ষীরা মার্চ করে চললো। আমাদের খুব দ্রুত পায়ে চলতে হচ্ছিল, আমি খুব তাড়াতাড়ি শক্তি হারিয়ে ফেলছিলাম। দু'বার আমি পড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু প্রতিবারই আমি

তাড়াতাড়ি করে উঠে চলতে শুরু করে দিয়েছিলাম কারণ আমি জানতাম খুব বেশিক্ষণ যদি আমি পড়ে থাকি তাহলে ওদের লম্বা সারিটা আমাকে পার হয়ে চলে যাবে আর আমাকে ঐখানে, ঐ রাস্তার ওপর সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হবে। আমার ঠিক আগেই একজন সার্জেন্ট-এর তাই হয়েছিল। তার পায়ে চোট লেগেছিল, কোনোরকমে সে নিজেকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সাংঘাতিকভাবে গোঙাচ্ছিল সে আর মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠছিল। আমরা এক কিলোমিটার মতো যাবার পর সে চিৎকাব করে বলে উঠেছিল : 'না আর পারছি না, বিদায়, কমরেডরা!' আর রাস্তার মাঝখানে বসে পড়েছিল।

"অন্যেরা তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে আবার মাটিতে বসে পড়েছিল। যেন স্বপ্নে দেখেছি এমনিভাবে তাকে আমার মনে পড়ে — শুষ্ক, ফ্যাকাশে, তরুণ মুখ, কোঁচকানো ভুরু, আর যন্ত্রণার অশ্রুতে ভরা চোখদুটো।

"সে পিছনে পড়েছিল। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখেছিলাম মোটর সাইকেলে করে একজন লোক তার কাছে এগিয়ে এসে, মোটর সাইকেলে বসা অবস্থাতেই নিজের পিস্তল বার করে সার্জেন্টটির কানের ওপর চেপে ধরে গুলি করলো। আমরা নদীর ধারে পৌঁছাবার আগেই জার্মানরা আরো কয়েকজন পিছিয়ে পড়া লালসেনাকে গুলি করে মেরেছিল।

"এইবার আমরা নদী, ভাঙা ব্রিজ আর পার হবার জায়গাটার পাশে আটকে থাকা একটা লরি দেখতে পেয়েছিলাম। আর ঠিক সেখানেই আমি মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম? না, অজ্ঞান আমি হইনি। আমি শুধু রাস্তার ওপর সটান লম্বা হয়ে পড়েছিলাম আর আমার মুখের মধ্যেটা ধুলোয় ভরে গিয়েছিল, রাগে আমি দাঁত কিড়মিড় করছিলাম, দাঁতের মধ্যে বালি কিরকির করছিল, কিন্তু আমি উঠতে পারছিলাম না। আমার কমরেডরা মার্চ করে আমাকে পেরিয়ে চলে যাচ্ছিল। 'উঠে পড়ো শিগগির', যেতে যেতে তাদের মধ্যে একজন মৃদু গলায় বলেছিল 'তা না হলে ওরা তোমায় মেরে ফেলবে।' আমি আঙুল দিয়ে আমার মুখের ভিতরটা খোঁচাচ্ছিলাম, আমার চোখদুটো টিপে ধরছিলাম যন্ত্রণা যাতে করে আমাকে আবার উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে ......।

"ওদের লম্বা পঙক্তিটা আমাকে পার হয়ে গিয়েছিল আর আমার কানে এসেছিল আমার দিকে এগিয়ে আসা মোটর সাইকেলের চাকার শব্দ। কোনো রকমে আমি উঠে দাঁড়াতে পেরেছিলাম। মোটর সাইক্লিস্টের দিকে না তাকিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে আমি নিজেকে বাধ্য করেছিলাম ঐ পঙক্তিটাকে ধরে ফেলতে আর শেষের দিকের একটা জায়গায় ঢুকে পড়েছিলাম। ট্যাঙ্ক আর লরি চলাচল করার ফলে নদীর জলটা কর্দমাক্ত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে সেই জলই পান করেছিলাম — সেই উষ্ণ, বাদামী রঙের কাদা, আর ঝরনার অতি পরিষ্কার জলের থেকেও ঐ জলটা আমাদের অনেক বেশি মিষ্টি লেগেছিল। জলটা নিয়ে আমি আমার মাথায় আর কাঁধে ছিটিয়েছিলাম। সেটাতে নিজেকে অনেকটা চাঙ্গা মনে হলো।

আর আমার শক্তি ফিরে এলো। এখন আর আমি পড়ে যাবো না, আর রাস্তায় পড়ে থাকবো না। এই আশা নিয়ে আমি হেঁটে যেতে পারবো ....।

'নদীটা পিছনে ফেলে সবে একটু এগিয়েছি এমন সময় সারিবদ্ধ কতকগুলো মাঝারি ধরনের জার্মান ট্যাঙ্ক দেখতে পেয়েছিলাম। আমরা যে বন্দী এটা বুঝতে পেরে অগ্রবর্তী ট্যাঙ্কের চালক তার গতি বাড়িযে সোজা একেবারে আমাদের পঙক্তির মধ্যে চলে এসেছিল। সামনের সারিগুলো চাকার নিচে খণ্ড খণ্ড হয়ে থেঁতলে গিযেছিল। মোটর সাইক্লিস্টরা আর সহযাত্রী রক্ষীদের বাকি সকলে সেই দৃশ্য দেখে অট্টহাস্য করে উঠেছিল, আর ট্যাঙ্কবাহিনীর লোকেরা, যারা ট্যাঙ্কের ঢাকনাগুলোর মধ্যে থেকে মাথা বার করেছিল, তাদের চিৎকার করে কি যেন বলেছিল, আর হাত নেড়েছিল। তারা আবার আমাদের সার বেঁধে দাঁড় করিযে রাস্তার একধার দিযে তাড়িযে নিয়ে চলেছিল। হ্যাঁ, ওদের ঐ জার্মানদের রসিকতার ধারণাটা যে অদ্ভুত সে বিষযে কোনো সন্দেহ নেই ....।

"সেদিন সন্ধ্যায় কিংবা রাত্রে আমি পালাবার চেষ্টাই করিনি, কারণ আমি জানতাম আমার পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না — রক্ত ক্ষয়ে আমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, তাছাড়া আমাদের ওপর খুব কড়া নজর রাখা হয়েছিল। আর পালাবার কোনোরকম চেষ্টার ফলই খুব খারাপ হতো। কিন্তু পালাবার চেষ্টা করিনি বলে পরে নিজেকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি করেছি! পরের দিন, জার্মানরা যেখানে তাদের ঘাঁটি গেড়েছে এমন একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জার্মান পদাতিকবাহিনীর সৈন্যরা আমাদের দেখবার জন্য রাস্তার ধারে গাদি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর সহযাত্রী রক্ষীর দল আমাদের দু'জন দু'জন করে যেতে বাধ্য করেছিল। সদ্য যারা বণক্ষেত্রে আসছিল তাদের চোখে আমাদের হেয় করতে চাইছিল। আর আমরাও দু'জন দু'জন করে গিযেছিলাম। যে পিছিয়ে পড়ছিল কিংবা পড়ে যাচ্ছিল তাকেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হচ্ছিল। সন্ধ্যার মধ্যে আমরা যুদ্ধবন্দী শিবিরে পৌঁছে গিযেছিলাম।

"ওটা আসলে ছিল মেশিন আর ট্রাক্টর স্টেশন, বেশ ভালো করে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে বন্দীদের ভেতরে জড়ো করা হয়েছিল। শিবির রক্ষীদের হাতে আমাদের সঁপে দেওয়া হয়েছিল। আর ওরাও রাইফেলের বাঁট দিয়ে আমাদের গুঁতো মারতে মারতে ভেতরে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ শিবিরটাকে নরক বললে নেহাত কম বলা হবে। প্রথমত ওটাতে কোনো শৌচাগার ছিল না।যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই বন্দীদের মলমূত্র ত্যাগ করতে হতো আর তারপর সেই দুর্গন্ধওয়ালা আবর্জনার স্তূপের মধ্যে বসতে বা শুতে হতো, আমাদের মধ্যে যারা বেশি দুর্বল ছিল তারা কখনোই উঠে দাঁড়াতো না। দিনে একবার করে আমাদের খাবার আর জল দেওয়া হতো। তার অর্থ আমরা এক মগ করে জল আর এক মুঠো করে কাঁচা ভুট্টার দানা কিংবা সূর্যমুখীর ছাতা ধরা বীজ পেতাম। আর কিছু নয়। মাঝে মাঝে কোনো কিছু দিতেই ভুলে যেতো .....।

"দু-একদিন বাদেই প্রচণ্ড বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল। আমাদের একেবারে হাঁটু পর্যন্ত পাঁক আর কাদা হয়ে গিয়েছিল। সকালের দিকগুলোয় ভিজে জবজবে লোকগুলোর গা থেকে ঘোড়াগুলোর মতো ধোঁওয়া বেরুতো; বৃষ্টি কিন্তু এক মিনিটের জন্যও থামতো না ....। প্রতি রাত্রে বেশ কয়েক ডজন করে লোক মারা যেত। খাবারের অভাবে আমরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম। আর আমার গায়ের ক্ষতগুলো আমাকে খুবই কষ্ট দিতো।

'ছ'দিনের দিন আমার মনে হয়েছিল আমার মাথা আর ঘাড়ের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে। ক্ষতগুলোয় পুঁজ হয়ে গিয়েছিল। তারপর সেগুলো থেকে দুর্গন্ধ বেরুতে লাগলো। শিবিরের ধারে যৌথ খামারের আস্তাবল ছিল, সেখানে গুরুতরভাবে আহত লাল সৈন্যরা শুয়ে থাকতো। সকালে আমি রক্ষীদের সার্জেন্টের কাছে গিয়ে ডাক্তার দেখাবার অনুমতি চেয়েছিলাম — শুনেছিলাম ডাক্তার আহতদের কাছেই থাকে। জার্মান এন সি ও রুশ ভাষা বেশ ভালো করেই বলতে পারতো। 'তোমাদের ডাক্তারের কাছে যাও হে বাশিযান', সে বলেছিল। 'ডাক্তার তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।'

"ব্যঙ্গটা তখন আমি বুঝিনি, তাই অনুমতি পেয়ে খুশি হয়ে, কোনো রকমে আস্তাবলে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

"সেনাবাহিনীর ডাক্তার দরজায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। সে নিজেই যে মৃত্যুপথযাত্রী তাকে দেখামাত্রই আমি সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। একেবারে মড়ার আকার, জীর্ণ দশা, যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে তার জন্য প্রায় অর্ধউন্মাদ। আহতরা সব স্তূপীকৃত জমির সারের ওপর শুয়েছিল, আর সেই সারের দুর্গন্ধে দম প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ওদের বেশিরভাগেরই ঘা গুলোর মধ্যে পোকা থিকথিক করছিল, আহতদের মধ্যে যাদের শরীরে এতটুকুও সামর্থ্য ছিল, তারা নিজেদের আঙুলের নখ বা কাঠি দিয়ে পোকাগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করছিল ....। তাদের পাশেই ছিল মৃত বন্দীদের একটা স্তূপ, কারো সময় হয়নি সেগুলো সরাবার।

"ওটা দেখেছো?' ডাক্তার বলেছিল। 'তাহলে তোমাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি? আমার কাছে না আছে ব্যান্ডেজ না আছে অন্য কিছু। ভগবানের দোহাই, তুমি চলে যাও। ঐ নোংরা ব্যান্ডেজগুলো নিয়ে যাও আর ঘায়ের ওপর ছাই ছড়াও। দরজার কাছে টাটকা ছাই কিছুটা রাখা আছে।'

"তার কথা মতোই কাজ করছিলাম। দরজায় জার্মান এন সি ও-র সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে দাঁত বার করে হাসছিল। 'তারপর, ডাক্তারকে কেমন লাগলো? তোমাদের সৈনিকদের ডাক্তারটি খুব ভালো। তোমাকে কোনো সাহায্য করলো কি?' কোনো কথা না বলেই তাকে পেরিয়ে চলে আসতে চাইছিলাম কিন্তু ও আমার মুখে একটা ঘুঁসি মেরে চিৎকার করে উঠেছিল : 'ও, তুমি তাহলে আমার কথার কোনো উত্তর দেবে না, শুয়োর কোথাকার।' আমি পড়ে গিয়েছিলাম আর ও আমার বুকে

আব মাথায লাথি মেরে চলেছিল ক্লান্ত হয়ে না পড়া পর্যন্ত। সেই জার্মানটার কথা আমি জীবনে ভুলবো না, কখনোই না। এরপরেও আমাকে সে বেশ কয়েকবার প্রহার করেছে। কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখতে পেলেই সে বেরিয়ে আসতে হুকুম করতো আর নীরবে একাগ্রভাবে আমাকে প্রহার করতে আরম্ভ করতো ......।

"তুমি ভাবছো এসব আমি কি করে সহ্য করতাম? যুদ্ধের আগে, আর একজন মেকানিক হবার আগে আমি কামা নদীতে জাহাজে মাল বোঝাই আর খালাস করার কাজ করতাম, আর একসঙ্গে আমি এক হন্দর ওজনের দু'দুটো বস্তা বয়ে নিয়ে যেতে পারতাম। হ্যাঁ, আমার গায়ে বেশ জোর ছিল, সেটা নিয়ে অনুযোগ করার কিছু নেই, আর সাধারণভাবে শরীরও বেশ ভালো ছিল। কিন্তু এখানে প্রধান জিনিসটা হলো, আমি মরতে চাইছিলাম না, আমার মৃত্যুকে প্রতিহত করার ইচ্ছেটা ছিল প্রবল। আমাদের দেশের জন্য লড়াই করতে আমাকে সৈন্যবাহিনীতে ফিরে যেতেই হবে, আর আমি শেষ পর্যন্ত ফিরে গিয়েওছিলাম, শত্রুর বিরুদ্ধে পুরোপুরি বদলা নেবো বলে!

"ঐ শিবিরটা ছিল একটা স্থানান্তর-কেন্দ্র গোছের, প্রায় একশো কিলোমিটার দূবে আব একটা শিবিরে আমাকে স্থানান্তবিত করা হযেছিল। প্রথমটার সঙ্গে এটার কোনোই পার্থক্য ছিল না : কাঁটাতার দেওযা সেই লম্বা লম্বা খুঁটি, বন্দীদের মাথার ওপর এক চিলতে আচ্ছাদনও ছিল না — একেবারেই না। খাবারও ছিল সেই রকম, তবে মাঝে মাঝে কাঁচা ভুট্টার জায়গায সিদ্ধ কবা ছাতা-ধরা শস্য জুটতো, কিংবা তারা কয়েকটা মরা ঘোড়ার মৃতদেহ টেনে নিয়ে আসতো আর নিজেদের মধ্যে ভাগ কবে নেবার ভার দিতো বন্দীদের। অনাহারে মরবো না বলেই আমরা খেতাম আর আমাদের দলের লোকজন অনাহারেই মরতো শ'যে শ'যে ......। তারপর অবস্থাটার আরো অবনতি ঘটাতে ঠাণ্ডা পড়ে গিয়েছিল ; সারা অক্টোবর মাস ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলেছিল, আর সকালেব দিকে তুষারপাত হতো। ঠাণ্ডাতে আমাদের দারুণ কষ্ট হতো। আমি মৃত এক লাল সৈনিকের একটা টিউনিক আর গ্রেটকোট যোগাড় করে পবতে পেরেছিলাম, কিন্তু সেগুলোও আমাকে ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা কবতে পারেনি। ততোদিনে অভুক্ত থাকার ব্যাপারে আমরা অভ্যস্ত হযে গিয়েছিলাম।

"যেসব সৈনিকরা আমাদের পাহারা দিতো তারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল — তারা যা কিছু চুরি কবতো তাতেই বেশ শাঁসে জলে হয়ে গিয়েছিল। তারা ছিল একই দোষে দুষ্ট। দুরাত্মাদের এমন একটা সমন্বয খুঁজে পাওযা কঠিন। তাদের আমাদের ধারাটা ছিল এইরকম। সকালে একজন কর্পোরাল কাঁটাতারের বেড়ার ধারে এসে দোভাষীর মাধ্যমে ঘোষণা করতো : 'এখন র‍্যাশান দেওযা হবে। সেটা দেওয়া হবে বাঁ ধারে।'

"কর্পোরাল চলে যেতো। দাঁড়াতে সক্ষম এমন প্রতিটি লোক বাঁ ধাবে গিযে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়তো। তারপর আমরা অপেক্ষা করে থাকতাম — একঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, এমনকি তিনঘণ্টা পর্যন্ত। শ'য়ে শ'যে কম্পিত, জীবন্ত কঙ্কালের দল তীব্র বাতাসের মধ্যে দাঁড়িযে থাকতো, দাঁড়িয়ে থাকতো আর অপেক্ষা করতো।

"জার্মানরা হঠাৎ উল্টোদিকে বেরিয়ে আসতো। কাঁটাতারের ওপর দিয়ে ঘোড়ার মাংসের টুকরোগুলো ছুঁড়ে দিতো। ক্ষুধার্ত লোকের দল একেবাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে অন্যদিকে ছুটে যেত। কদামাখা মাংসের টুকরোগুলোর জন্য একেবাবে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।

"জার্মানরা তখন একেবাবে হেসে গড়িয়ে পড়তো। তারপর দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতো মেশিনগান থেকে গুলি ছোঁড়ার পালা আর সেটাকে অনুসরণ করতো চিৎকার আর আর্তনাদ। বন্দীরা আবার বাঁদিকে ছুটে যেত। মাটিতে তখন পড়ে থাকতো মৃত আর আহতদের দল ....। রোগাটে ধরনের ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট, যে ছিল শিবিরের সুপারিনটেন্ডেন্টও বটে — তখন দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে আসতো আর কোনো রকমে হাসি চেপে সে বলতো :

'আমাব কাছে খবব এলো র‍্যাশান·দেবার সময় বিশ্রি একটা ঘটনা নাকি ঘটেছে। এরকম ঘটনা যদি আবার ঘটে তাহলে তোমাদের সবকটা রাশিয়ান শূয়োরকে কোনো রকম দয়া দেখাবো না সব কটাকে গুলি করে মারবো!' অফিসারের পিছনে ভিড় করে আসা জার্মান সৈনিকরা একেবারে হেসে গডিয়ে পড়তো। এই ধরনের আমোদই তারা ভালোবাসতো।

"আমরা নীরবে মৃতদের শিবিরের উঠোন থেকে সরিয়ে নিয়ে গিযে কাছেরই এক খানার মধ্যে সমাধিস্থ করেছিলাম ......।

"শিবিরের ভেতরেও তারা নিয়মিতভাবে আমাদের ঘুষি, লাঠি, রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারতো। মাঝে মাঝে তারা একঘেয়েমিজনিত বিরক্তি থেকে আমাদের মারতো আর মাঝে মাঝে নিছক কৌতুকের জন্য। আমার ঘাগুলো শুকিয়ে আসতো তারপর আবার বেড়ে যেত হয অবিরাম আর্দ্রতায় নয়তো মারেব চোটে, আর যন্ত্রণাও হতো অসহনীয় রকমের। কিন্তু সেটাও আমি সহ্য করতাম, আমার মুক্তির আশাটা আঁকড়েধরে আমি এসব কিছুর মধ্যে দিযে বেঁচেছিলাম ....। কর্দমাক্ত মাটির ওপর শুয়ে আমরা ঘুমোতাম ; ওরা আমাদের এক টুকরো খড় পর্যন্ত দিত না। আমরা একসঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকতাম আর শুতামও তেমনি করে। আর সারা রাত ধবে যুদ্ধ চলতো : যারা একদম তলায় ও কাদার ওপর শুয়ে থাকতো তারা একেবারে ঠাণ্ডায় জমে যেত। আর যারা ওপরের দিকে থাকতো তারাও ঠিক ঠাণ্ডায় ঐ ভাবেই জমে যেতো। না হতো ঘুম না হতো বিশ্রাম, হতো শুধু দারুণ যন্ত্রণাভোগ।

"যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছি এমনিভাবে দিনগুলো কেটে যেত, প্রতিটা দিন কাটার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছিলাম। ছোট একটা শিশুও আমাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারতো। কখনো কখনো আতঙ্কের সঙ্গে আমি আমার শীর্ণ শুকনো হাতগুলোর দিকে তাকাতাম আর ভাবতাম : 'এখান থেকে কি করে বেরুবো?' আর গোড়াতেই পালিযে যাবার চেষ্টা করিনি বলে নিজেকেই গাল দিতাম। আমাকে যদি ওরা মেরে ফেলতো, তাহলে এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতাম।

"শীত এসে গিয়েছিল। আমরা তুষারসরিয়ে জমাট বাঁধা মাটিব ওপর শুয়ে ঘুমোতাম। একভাবে আমরা সংখ্যায় কমে যাচ্ছিলাম ....। শেষকালে ঘোষণা করা হয়েছিল যে কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের কাজ করতে পাঠানো হবে। আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। সকলের বুকে আশা জেগে উঠেছিল, খুবই ক্ষীণ কিন্তু তবু একটা আশা আমাদের পালিয়ে যাবার সুযোগ হয়তো একটা মিলবে।

"সে রাত্রিটা ছিল নিঃস্তব্ধ আর তুষারাচ্ছন্ন। ভোরেব আগে আমাদের কানে এসেছিল গোলাগুলির শব্দ। আমার চারপাশে সবাই সজীব হয়ে উঠেছিল। বন্দুকেব গুলির আওয়াজ আবার শোনা গেলে কে একজন চিৎকার কবে উঠেছিল :

'কমরেডগণ, এ তো আমাদের সেনাবাহিনী — আক্রমণ করছে।'

"তারপর যা ঘটেছিল তা কল্পনার অতীত। সমস্ত শিবির প্রায় দাঁড়িয়ে উঠেছিল, এমন কি যারা বহুদিন ধরে উঠে দাঁড়াতে পারতো না, তারাও। চারপাশে শোনা যাচ্ছিল ফিসফিসানি আর চাপা কান্না ......। আমার কাছেই কে একজন কাঁদছিল, ঠিক একজন মেয়ের মতো ....। আর আমিও ..... । আমি পর্যন্ত ......।"

এটা বলতে বলতে লেফটেন্যান্ট গেরাসিমভ-এর গলা ভেঙে গিয়েছিল। একটুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়েছিল, তারপর আরো একটু শান্ত কণ্ঠে বলছিল : "আমার গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো আব ঠাণ্ডা বাতাসে জমে গেল .....। কে একজন ক্ষীণকণ্ঠে 'ইন্টারন্যাশনাল' গাইতে আরম্ভ করেছিল : তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল আমাদের ভাঙা ভাঙা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠগুলো। রক্ষীরা আমাদের লক্ষ্য করে টমিগান আর রাইফেল ছুঁড়েছিল। একটা হুকুম জারি করা হয়েছিল : 'শুয়ে পড়ো সব।' বরফের মধ্যে সটান হয়ে শুয়ে পড়ে শিশুর মতো কাঁদতে আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু সেই চোখের জল ছিল গর্বের আর আনন্দেরও বটে, আমাদের দেশবাসীদের জন্য সে গর্ব। জার্মানরা আমাদের মেরে ফেলতে পারে, আমরা তো নিরস্ত্র আর ক্ষিদের তাড়নায় দুর্বল, তারা আমাদের দৈহিক যন্ত্রণা দিতে পারে কিন্তু আমাদের মনোবল ভেঙে দিতে পারেনি আর কখনো পারবেও না। ভুল ধরনের লোকদের ওরা বন্দী করেছে। সেটা আমি তোমায় স্পষ্টই বলছি।"

সে রাত্রে আমি লেফটেন্যান্ট গেরাসিমভ-এর কাহিনীর শেষটা আর শুনিনি। হেড কোয়ার্টারস থেকে জরুরী ডাক এসেছিল। কয়েকদিন পরে আবার আমাদের দেখা হয়েছিল। ট্রেঞ্চের ভেতবটায় ছ্যাতলা আর পাইন গাছের আঠার গন্ধ। সে একটা বেঞ্চের ওপর বসে ছল সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তার প্রকাণ্ড হাড়ওয়ালা কব্জিদুটো তার হাঁটুর ওপর রেখে, অঙ্গুলিবদ্ধ হয়ে। ওর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল হয়তো বন্দীশিবির থেকেই ঐ অভ্যাস তার হয়েছে, ঘন্টার পর ঘন্টা ঐভাবে হাতগুলো অঙ্গুলিবদ্ধ করে বসে থাকা, নীরবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, গুরুভার নিস্ফলা চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়ে ....।

"তুমি জানতে চাও আমি কি করে পালিয়ে এলাম? ব্যাপারটা ঘটেছিল এইভাবে। যে রাত্রে আমরা গোলাগুলির আওয়াজ শুনি কয়েকদিন পরেই আমাদের

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার কাজে লাগানো হয়েছিল। তুষারপাতের পর বরফ গলতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি পড়ছিল। শিবির থেকে আমাদের উত্তর দিকে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। রাস্তায় আবার সেই পূর্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল : বন্দীদের মধ্যে পরিশ্রান্ত হয়ে কেউ পড়ে গেলেই তাকে গুলি করে পথের ওপর ফেলে রেখে যাওয়া হচ্ছিল ....।

"পথে আমাদের মধ্যে থেকে একজন বরফে জমে যাওয়া একটা আলু তুলে নিয়েছিল বলে একজন জার্মান এন সি ও তাকে গুলি করেছিল। আমরা তখন একটা আলুর ক্ষেত পার হচ্ছিলাম। ঐ লোকটা ছিল একজন ইউক্রেনিয়ান সার্জেন্ট, নাম তার গণচার, অভিশপ্ত ঐ আলুটা তুলে নিয়ে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল সে। ঐ এন সি ও সেটা দেখতে পায়। কোনো কথা না বলে গণচার-এর কাছে গিয়ে তার মাথার পিছনে গুলি করে। আমাদের লম্বা পঙক্তিটাকে থামতে বলা হয়েছিল. বলা হয়েছিল আবার সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে। 'এসব হলো জার্মান সম্পত্তি।' এন সি ওটি ব্যাখ্যা করে বলেছিল। 'অনুমতি ছাড়া ঐসব জিনিসে কেউ হাত দিলে তাকে গুলি করে মারা হবে।'

"যাবার পথে আমাদের একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। আমাদের দেখামাত্রই মেয়েরা বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে রুটির টুকরো আলু ছুঁড়ে দিচ্ছিল। আমাদের মধ্যে কিছু লোক সেগুলো কুড়িয়ে নিতে পেরেছিল, অন্যেরা পারেনি : রক্ষীরা বাড়িগুলোর জানলা লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল, আর আমাদের হুকুম করেছিল জোরে জোরে পা চালাতে। কিন্তু বাচ্ছাদের ভয় পাওয়াতে পারেনি। রাস্তায় তারা আমাদের থেকে অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়ে সেখানেই রুটি রেখে দিয়ে গিয়েছিল, যেতে যেতে আমরা যাতে করে সেগুলো তুলে নিতে পারি। আমি যে একটা বড় গোছের সিদ্ধ করা আলু পেয়েছিলাম সেটা আমার মনে আছে। সেটা আমি আমার পাশের লোকটার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম। খোসা শুদ্ধই আমরা সেটা খেয়েছিলাম। আর সত্যিই আমার জীবনে এমন সুস্বাদু কিছু খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার যেসব কাজ আমাদের দিয়ে করাচ্ছিল সেগুলো ছিল জঙ্গলের মধ্যে। রক্ষীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর আমাদের বেলচা দেওয়া হয়েছিল। আমি কিন্তু তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলো জোরদার করার কথা চিন্তা করছিলাম না, আমি চাইছিলাম সেগুলো ধ্বংস করে দিতে।

"সেইদিন সন্ধ্যায় আমি মন স্থির করে ফেলেছিলাম : আমরা যে গর্তটা খুঁড়ছিলাম তার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিযে এসেছিলাম, বেলচাটা বাঁহাতে নিয়ে, তারপর একজন রক্ষীর কাছে গিয়েছিলাম .... আমি লক্ষ্য কবেছিলাম বাকি জার্মানরা কিছুটা দূরে একটা খানার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমাদের দলটার ওপর যে নজর রাখছিল সেই রক্ষীটি ছাড়া অন্য কোন রক্ষী আমাদের কাছেপিঠে কোথাও ছিল না।

"দেখো আমার বেলচাটা ভেঙে গেছে", রক্ষীটির কাছে গিয়ে আমি বিড়বিড় করে

বলেছিলাম। ক্ষণিকের জন্য আমার মাথায় এসেছিল প্রথম ঘায়ে যদি ওকে ফেলে দেবার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে না পারি তাহলে আমি খতম হয়ে যাবো। জার্মানটা আমার মুখের ভাবে নিশ্চয় কিছু লক্ষ্য করেছিল, কেননা সে কাঁধটা নামিয়ে তার টমিগানটা খুলে আনছিল। আমি তখন বেলচা দিয়ে তার মুখে একটা ঘা মেরেছিলাম। ওর মাথায় আঘাত করতে পারছিলাম না কেন না ওর মাথায় হেলমেট ছিল। তাহলেও তাকে জোরে আঘাত করার মতো যথেষ্ট শক্তি আমার ছিল, আর সে নিঃশব্দে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল ....।

"এবার একটা টমিগান আর তিনটে ক্লিপ আমার হাতে এসেছিল। আমি দৌড়তে চাইছিলাম, কিন্তু দেখলাম আমি দৌড়তে পারছি না। সেশক্তি আমার ছিল না আর সেটাই আসল কথা। আমি থেমে দম ফিরে পেয়ে আবার ধীর পায়ে চলতে আরম্ভ করেছিলাম। খানার অপর পাশের জঙ্গলটা ছিল আরো ঘন তাই আমি সেই দিকেই গিয়েছিলাম। ঠিক কতবার যে পড়েছিলাম, উঠেছিলাম, আবার পড়েছিলাম ..... সেটা এখন আমার মনে পড়ছে না। কিন্তু প্রতি মিনিটে আরো একটু করে দূরে চলে যাচ্ছিলাম। কাঁদতে কাঁদতে, ক্লান্তিতে বেদম হয়ে, আমি পাহাড়ের অপর দিকের ঝোপের মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন দূরে, আমার পিছনে টমিগানের গুলির শব্দ আর চিৎকার শুনতে পেয়েছিলাম। আমাকে ধরা এখন আর অত সহজ নয়।

"সন্ধ্যা হয়ে যাবে শীঘ্রই। কিন্তু জার্মানরা যদি আমার পিছু নেয় আর আমার কাছাকাছি এসে যায় — তাহলে শেষগুলিটা আমি রাখবো আমার নিজের জন্য। সেই চিন্তাটাই আমাকে চাঙ্গা করে তুলেছিল আর আমি আমার চলার বেগ কমিয়ে আরো সাবধানে হাঁটছিলাম।

"সে রাত্রিটা আমি জঙ্গলেই কাটিয়েছিলাম। আধ কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম ছিল কিন্তু ভয়ে আমি আর তার ধারে কাছে ঘেঁসিনি পাছে জার্মানদের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যায়।

"পরের দিন কয়েকজন পার্টিজান আমাকে তাদের সঙ্গে নিয়েছিল। তাদের আশ্রয়ে আমি দু'সপ্তাহ মতো ছিলাম — শরীরে বল না পাওয়া পর্যন্ত। আমার পার্টি কার্ড দেখানো সত্ত্বেও তারা গোড়াতে আমার সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। শিবিরে থাকাকালীন আমার কোটের আস্তরের সঙ্গে কার্ডটা সেলাই করেই নিয়েছিলাম। কিন্তু পরে, আমি তাদের আক্রমণ অভিযানে অংশ নিতে আরম্ভ করলে আমার সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়। কতজন জার্মানকে আমি মেরেছি তার একটা হিসাব রাখার গোড়াপত্তন হয় এখান থেকেই, খুব সাবধানে আমি সে হিসাব রেখে যাচ্ছি, সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়ছে, এখন প্রায় একশোর কাছে পৌঁছেছে।

"জানুয়ারি মাসে পার্টিজানরা আমাকে যুদ্ধ সীমানা পার করিয়ে দিয়েছিল। প্রায় একমাস আমি হাসপাতালে ছিলাম। সেখানেই তারা আমার কাঁধ থেকে গুলির টুকরো বার করে দেয়, আর আমার বাকি অসুখগুলো, শিবিরে থাকার সময় আমার রিউম্যাটিজম ইত্যাদি যে হয়েছিল — যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের চিকিৎসা

স্থগিত রাখতে হবে। আমার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য হাসপাতাল থেকে আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এক সপ্তাহ আমি বাড়িতে ছিলাম। তার থেকে বেশিদিন আর আমি সেখানে থাকতে পারিনি।ফিরে আসার জন্য আমার মনটা আকুল হয়ে উঠেছিল ; যতই বলো না কেন,আমার স্থান তো এইখানেই, একেবারে সমাপ্তি পর্যন্ত।'

ট্রেঞ্চের মুখটাতে আমরা বিদায় নিয়েছিলাম। চিন্তিতভাবে জঙ্গলের রৌদ্রোজ্জ্বল ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লেফটেন্যান্ট গেরাসিমভ বলেছিল:

"...... আর আমরা শিখেছি সত্যিকার সঠিকভাবে লড়তে, আর ঘৃণা করতে ও ভালোবাসাতে। যুদ্ধ হলো একটা শান পাথর যা সমস্ত আবেগগুলিকে শানিয়ে প্রখর করে দেয়। তুমি মনে করো ভালোবাসা আর ঘৃণাকে পাশাপাশি রাখা যায় না। পুরনো সেই প্রবাদটা তো তুমি জানো : 'কুরঙ্গম আর ভীরু কুরঙ্গীকে এক জোয়ালে কখনোই জোতা যায় না।' আর এখানে তুমি দেখতে পাবে শুধুমাত্র একই জোয়ালে জোতা নয় তারা একই সঙ্গে জোয়াল টেনে নিয়ে চলেছে বেশ ভালোভাবেই। জার্মানরা আমার দেশের যা করেছে, আমার নিজের যা করেছে তার জন্য আমি তাদের মনপ্রাণ দিযে ঘৃণা করি আবার একই সঙ্গে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি আমার দেশবাসীদের ভালোবাসি, আর আমি চাই আর কখনো যেন তাদের জার্মানদের গোলামি করতে না হয়। সেই জন্যই আমি আর আমরা সকলে এমন প্রচণ্ডভাবে লড়াই করি ; শুধুমাত্র এই দুটি আবেগই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে আমাদের জয়ের পথে নিয়ে যাবে। দেশের প্রতি ভালোবাসা আমরা হৃদয়ে পোষণ করি এবং হৃদয়ের স্পন্দন থেমে না যাওয়া পর্যন্ত সেই ভালোবাসা আমরা হৃদয়ে পোষণ করে যাবো কিন্তু আমাদের ঘৃণাটা থাকে বেয়নেটের ডগায়। একটু বিশদভাবে যদি এটা প্রকাশ করে থাকি, তার জন্য ক্ষমা কোরো, কিন্তু আমি এটাই মনে করি।" লেফটেন্যান্ট তার কথা শেষ করেছিল। আর আমাদের দেখা হবার পর এই প্রথম সে এক শিশুর মতো প্রাণখোলা হাসি হেসেছিল।

আর এই প্রথম আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে বত্রিশ বছরের এই লেফটেন্যান্ট, যে যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সে এসেছে, তার কঠিন মুখে সেগুলোর চিহ্ন বিদ্যমান থাকলেও, সে এখনও একটা ওক গাছের মতোই বলিষ্ঠ, তার রগের কাছের চুলগুলো চোখ ধাঁধানো রকমের সাদা। মহান যন্ত্রণার মধ্যে অর্জিত সেই শুভ্রতা এতোই নির্ভেজাল যে তার ট্রেঞ্চ ক্যাপের গায়ে লেগে থাকা মাকড়সার জালের একটা তন্তু রগের কাছে হারিয়ে গেছে, অনেক চেষ্টা করেও আমি সেটাকে খুঁজে পেলাম না।

মিখাইল শোলোকভের "Hate" গল্পটির ছায়াবলম্বনে।

চাকরির প্রথম দিন

মাও টুন

কোনো একটা অফিসে কাজ করা তার পক্ষে খুব সুখকর যে হবে না, মিস হুয়াং এটা অনুমানই করেছিল, কিন্তু সেখানে তার জীবন বিষময় করে তোলার বস্তুগুলো সে কল্পনাও করতে পারেনি।

সকাল সাড়ে আটটায মিস হুয়াং কোম্পানির প্রধান অফিসে গিয়ে ঢুকলো। চাকরিজীবী হিসাবে তার জীবনের প্রথম পাতার প্রথম পংক্তি শুরু হলো নিচুগলায় আলোচনারত কিছু লোকের চাপা হাসি দিয়ে। প্রধান অফিসে আলো খুবই কম। পূবমুখী ও উত্তরমুখী জানালাগুলো বেশ বড় হলেও সামনের আকাশছোঁয়া বড় বড় বাড়িগুলো দৃষ্টিপথ অবরোধ করেছে। জানালার কাঁচের শার্সিগুলোর মধ্য দিয়ে সূর্যের আলোর পরিবর্তে এসে পড়ছে উলটোদিকের অফিসগুলোর বৈদ্যুতিক বাতির আভা। ছাত থেকে ঝুলছিল ফুলের আকারের হাতমুখ ধোবার গামলার মত বড় একটা ঝাড়বাতি, তার মধ্যেকার পাঁচটা বাল্বই জ্বালা ছিল। কিন্তু সদ্য সদ্য মে মাসের ঝলমলে রৌদ্রালোক ছেড়ে এসে মিস হুয়াং-এর মনে হলো যেন সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। বড় ঘরের মধ্যে যে সব নতুন নতুন, অদ্ভুত জিনিস তার জন্য প্রতীক্ষা করছিল — সেগুলো সে আর সেই মুহূর্তে দেখতে পেলো না।

চাপা হাসির শব্দ সে অবশ্য বেশ পরিষ্কারভাবেই শুনতে পাচ্ছিল। এর মধ্য থেকে একটা কথা বেরিয়ে এসে কানে লাগলো, কথাটা শুনে মনে হলো বক্তা যেন নাকটা টিপে কথা বললো : "ঐ যে আসছে!" খুব একটা স্পর্শকাতর না হলেও মিস হুয়াং-এর মনে হলো ঐ চাপা হাসি যেন তাকেই উপলক্ষ্য করে। বুকটা দমে গেলো তার, আপনা থেকেই তার দৃষ্টি চলে গেল যে দিক থেকে হাসির শব্দ আসছিল সেই দিকে। অভদ্র ঐ লোকগুলির চেহারা কেমন সেটাই দেখতে চাইছিল সে।

দরজা থেকে দু'ফিটেরও কম দূরে, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মিস হুয়াং।

তারপর কে একজন তার কাছে এগিয়ে এলো। "হুয়াং তোমার জায়গা ঐখানে।"

পরিচিত ঐ কণ্ঠস্বর তার স্কুলের পুরনো বন্ধু মিস চ্যাং-এর। অফিসে একমাত্র চ্যাংকেই সে চিনতো। কিন্তু এখন, কেন তা সে ভগবানই জানেন, চ্যাংকে হঠাৎ কেমন যেন অপরিচিত বলে মনে হলো। মাত্র আগের দিন সন্ধ্যাতেই মিস হুয়াং তার

সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, তখন তো চ্যাং তার চিরাচরিত সাধাসিধা সাজ পোশাক পরে সেই চিরাচরিত চ্যাং-ই ছিল। অথচ এখন ঝাড়বাতির আলোয় যে মেয়েটি তার দিকে এগিয়ে আসছে তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঝলমলে লাল সবুজ রঙের পোশাক।

এত সেজেছে কেন সে? মিস হুয়াং-এর আশ্চর্য লাগছিল। এত অবাক হয়ে গিয়েছিল সে, যে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতেই ভুলে গেলো। "ও", যান্ত্রিকভাবে সে উত্তর দিলো আর যান্ত্রিকভাবেই মিস চ্যাংকে অনুসরণ করে সারি সারি শূন্য ডেস্ক পার হয়ে ঘরের পশ্চিম দিকের একটা জানালাবিহীন কোণায় গিয়ে পৌঁছালো। এখানে অবশেষে মিস হুয়াং দেখতে পেলো জানালাগুলোর পাশে ডজনখানেক লোক দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ দুই-ই ছিল, দূর থেকে তারা এমনভাবে ওর দিকে তাকিয়েছিল যেন কোনো এক আজব ধরনের প্রাণী ও।

দারুণ অসোয়াস্তি সত্ত্বেও মিস হুয়াং জোর করে নিজের ডেস্ক খোঁজার দিকে মন দিলো। এখানের ডেস্কগুলো সব দরজার দিকে মুখ করে রাখা। দেওয়ালের গায়ের ডেস্ক অন্যদের থেকে এক ব্যাপারে একটু স্বতন্ত্র — এটার ওপর রাখা ছিল মাত্র তিনটি জিনিস — এক শিশি কালি, একটি কলম ও এক টুকরো আনকোরা নতুন ব্লটিং পেপার। মিস হুয়াং বুঝলো এটাই তার ডেস্ক।

"আমি ডানদিকে, তোমার থেকে দু'সারি আগে আছি।" মিস চ্যাং কথাটা বলার সময় দিকটা নির্দেশ করলো, তারপর চকিতে একবার জানালার ধারের দলটার দিকে তাকিয়ে একটা কৃত্রিম হাসি হাসলো।

মিস হুয়াং তার বন্ধুর দৃষ্টি অনুসরণ করার ইচ্ছা সংবরণ করতে পারলো না। দেখলো দুটি লোক বেশ খোলাখুলিই মিস চ্যাং-এর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ওদিকে দুটি মেয়ে আর একটি লোকের সঙ্গে ফিস ফিস করে কত কথা বলে চলেছে। ইউরোপীয় কায়দায় কলারের উপর লোকটির তৈল মসৃণ আঁচড়ানো মাথার সঙ্গে, মেয়ে দুটির কৃত্রিম উপায়ে কুঞ্চিত কেশ বিন্যস্ত মাথাগুলি মিশে বেশ একটা অন্তরঙ্গ ত্রিভুজের সৃষ্টি করেছে।

"ও", মিস হুয়াং উদাসভাবে উত্তর দিয়ে, তার নিজের ডেস্কে বসে পড়লো, নিজেকে তার খুবই একা মনে হচ্ছিল। না, শুধুমাত্র নিজেকে একা মনে হলেও অতটা ক্ষতি হতো না। সব থেকে বিশ্রী ব্যাপার হলো তার কেমন গা গোলাতে লাগলো — কাঁচা মাছের এক ঝলক গন্ধ যেন তার নাকে এসে লেগেছে। অবসন্নভাবে সে তার ডেস্কের উপরের নতুন ব্লটিং পেপারের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে মনে সে ভাবছিল এটাতো শাংহাইয়ের নামকরা কোম্পানিগুলোর একটা। এখানে ঐ কেরানির দল একপাল নিকৃষ্টমানের অভিনেতা-অভিনেত্রীর মতো ব্যবহার করছে কেন?

"না, মোটেই না, মোটেই নয়।" জানালার ধারের হট্টগোল ছাপিয়ে পরিষ্কার পুরুষ কণ্ঠর স্বরে তার চিন্তার স্রোতে বিরতি পড়লো। মিস হুয়াং চোখ তুলে দেখে মিস

চ্যাং স্মিত মুখে দল ছেড়ে সুমোহন ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে ডেস্কের সারিগুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে।

"হুয়াং এখানের সকলের সঙ্গে আমি তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই", সৌজন্য দেখিয়ে মিস চ্যাং বললো। একদিকে মাথা হেলিয়ে, কোমর বেঁকিয়ে, জানালার ধারের দলটির দিকে তাকিয়ে আঙুল দিয়ে তাদের দিকে দেখালো।

উঠে দাঁড়াবার জন্য মিস হুয়াং-এর নিজেকে প্রায় জোর করে ঠেলে তুলতে হলো। মনে হচ্ছিল নিজের শরীরের ভার যেন তার এক টন, বিশেষ করে ভারী লাগছিল নিজের পাগুলো। জানালার কাছ থেকে তার ডেস্কের দূরত্ব মাত্র বিশ ফিট মতো হবে, কিন্তু মিস হুয়াং-এর মনে হচ্ছিল যেন তাকে বহু মাইল পথ অতিক্রম করে যেতে হচ্ছে। অফিসময় চতুর্দিকে ডেস্ক ছড়ানো, আরেকটু হলেই সে কার সুন্দর একটা ছাতায় হোঁচট লেগে পড়ে যাচ্ছিল।

"এই হচ্ছে মিস লি ·····। মিস চৌ ·····। মিঃ চাও ····। মিঃ ওয়াঙ — "মিস চ্যাং সশব্দে হেসে উঠলো। প্রত্যেকটি নাম বলার সাথে সাথে মিস হুয়াং অস্ফুট স্বরে বলছিল "আহ", আর বেশ নিচু হয়ে অভিবাদন করছিল, তার উত্তরে অন্যরা শরীর প্রায় নব্বই ডিগ্রি বেঁকিয়ে খুব ঘটা করে প্রত্যাভিবাদন করছিল।

"আর আমার নাম হচ্ছে শাও", বছর তিরিশের একজন নিজের পরিচয় দিলে। চীন দেশীয় রেশমের গাউন পরে বেশ কায়দাদুরস্ত ভাবে সাজ করেছিল সে।

"আহ, আহ।" এইসব জীবদের বলার মতো প্রথাগত বাঁধা গৎ মিস হুয়াং-এর মনে এলো না। ওদের যেন অন্য কোন এক জগতের জীব বলে মনে হচ্ছিল তার। "আহ, আহ" বলা আর নিচু হয়ে অভিবাদন জানানোই যেন যথেষ্ট বলে মনে হলো তার।

মিঃ ৎসাও বলে ওদের সর্বশেষ লোকটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর মিস হুয়াং যখন "আহ, আহ", বলে ঝুঁকে নব্বুই ডিগ্রি বেঁকে অভিবাদন করছে তখন ঐ দলের মধ্যে থেকে কে একজন মৃদুস্বরে বলে উঠলো — "আহ, আহ।"

তিন চার সেকেন্ডের জন্য ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর সকলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। নিজেকে বেশ শক্ত হাতে সামলে রাখলেও মিস হুয়াং-এর মুখ লাল হয়ে গেল, তারপরই আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল — রাগের চোটে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আদবকায়দা-দুরস্ত মিঃ শাও ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি অন্য কথায় চলে গেল।

"এখন আবহাওয়াটা বেশ ভালোই পাচ্ছি, আমরা" সে বলে চললো। "আপনারও কি তাই মনে হচ্ছে না, মিস হুয়া ?"

তিক্ত হাসি হেসে সে ঘাড় নাড়লো তারপর তার নিজের ডেস্কে পালিয়ে গেল। ডেস্কের সামনে প্রথম যখন বসে তখন ডেস্কটা তার ভালো লাগেনি, কিন্তু এখন ওটাই যেন তার একমাত্র আশ্রয় স্থল বলে মনে হচ্ছিল। নিজের অজ্ঞাতসারে, কলমটা তুলে নিয়ে নিজের আঙুলের ওপর কলমের নিবটা পরীক্ষা করলো সে। এখনি যদি কাজ করার সময় হতো। কিন্তু তখনও প্রায় কুড়ি মিনিট বাকি।

সৌভাগ্যক্রমে, সেই দীর্ঘ কুড়ি মিনিটের মধ্যে ক্রমাগত লোক আসতে লাগলো, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই পুরুষ। মিস হুয়াং মাথা হেঁট করে তার ওই ঘরের কোণার পরম নিরাপদ আশ্রয়স্থল আঁকড়ে রইলো। পরবর্তী আগন্তুকরা অন্য ধরনের লোক। ঘন ঘন গলা খাঁকারি দিয়ে তারা অফিসের ছোকরাটাকে ডেকে চড়া গলায় নানা অবান্তর প্রশ্ন করতে লাগলো। নিজেদের মধ্যে তারা "শ্যাম্পেন স্টেক" ঘোড় দৌড়ের সাম্প্রতিক ফলাফল নিয়ে আলোচনায় মেতে গেল। এরা হলো অফিসের উচ্চপদাধিকারীর দল। কোণার নগণ্য নতুন কেরানিকে তারা লক্ষ্য করেছে বলে মনে হলো না।

মিস হুয়াং শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে চোখ তুলে তাকালো। জানালার ধারগুলো সব ইতিমধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই যার যার জাযগায় ঠিকমতো ভাবে বসেছে। আদবকায়দাদুরস্ত মিঃ শাও শ্রদ্ধাবনত ভাবে "শ্যাম্পেন স্টেক" সম্বন্ধে, ইউরোপীয় পোশাকধারী, মধ্য বযসী এক স্থূলকায় ভদ্রলোকের মতামত শুনছিল। ডেস্কের উপর পা দু'খানি তুলে দিয়ে, হাতে একটা চুরুট ধরে, মোটকু থুথুর বৃষ্টি ছড়িয়ে বকে চলেছিল। হঠাৎ তার খাটো মোটা ঘাড় সোজা করে, মাথা হেলিযে চিৎকার করে হেসে উঠলো। মিঃ শাও তাড়াতাড়ি তার আনন্দোচ্ছ্বাসে যোগ দিল। তারপর ডেস্কের উপর থেকে চামড়ার জুতোওয়ালা পা দু'খানা ঘষটে নেমে পড়লো, আর ঘোরানো চেয়ার মসৃণভাবে ডানদিকে আধপাক ঘুরে থেমে গেল। সেখানে মিঃ চাও আর মিঃ ৎসাও-এর ডেস্ক দুটো মুখোমুখি করে বসানো। দুই ভদ্রলোকই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে লেজার রাখার একটা তাকের মধ্যে দিয়ে নিচু গলায় কথাবার্তা বলছিল। স্থূলকায় মুখখানার এমন অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে চমকে উঠতেই তাদের মাথা দুটো দূরে সরে গেল। হাসিব শব্দ তাদের কানে গিয়েছিল তাই সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝে ফেললো এবার ওই ঐক্যতানে যোগ দেবার সময় এসেছে। ফলে মিঃ চাও ও মিঃ ৎসাও গলা দিয়ে হাঁসের ডাকের মতো প্যাঁকপ্যাঁক আওয়াজ বার করতে লাগলো।

কিন্তু তাদের হাসিতে চেষ্টা করে একটু স্বাভাবিক সুর আনতে না আনতে হাসি থামিয়ে ফেলতে হলো। সাদা উর্দিপরা এক বেয়ারা অফিসের মধ্যে ছুটে এসে একটা চামড়ার পেট মোটা পোর্টফোলিও বিরাট একটা ডেস্কের উপর সশব্দে নামিযে রাখলো। ও হলো "স্টিম রোলার", প্রতিদিনই সে অফিসের ম্যানেজারের আসার পথ প্রস্তুত করে যায়। সারা ঘর স্তব্ধ হয়ে গেল, সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল শুধু মোটকুর ঘোরানো চেয়ারের মৃদু কিঁচ কিঁচ শব্দ। বাইরের অফিস থেকে ম্যানেজারের কর্কশ ভাঙা গলায় বেয়ারাকে ডাকার শব্দ শোনা গেল, আর অন্য অনেকেই চিৎকার করে উঠলো "উনি এসে গেছেন"। অনেকগুলো পায়ের শব্দের মধ্যে দিয়ে চামড়ার জুতো ভারি পায়ে এগিয়ে এলো, তারপর অফিসের ঘষা কাঁচের দরজা সম্পূর্ণভাবে খুলে গেল। দরজার ঠিক উলটো দিকে বসেছিল বলে মিস হুয়াং বেশ ভালো ভাবেই সব দেখতে পাচ্ছিল। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সাদা উর্দিপরা আর একজন বেয়ারা এক হাত

দিয়ে দরজাটা খুললো, আর অপর হাতে ধরা ছিল নেপোলিয়নের টুপির কায়দায় ধারগুলো ওলটানো বেশ চওড়া একটা টুপি। একটুক্ষণ বাদে লম্বা, লালমুখো একটি লোক, বুকটান করে ভুঁড়ি উঁচিয়ে সবেগে ঘরে এসে ঢুকলো। তার পিছু পিছু লেজুড়ের মতো বেয়ারাটা ঢুকে এসে, খুবই ভক্তিভরে বিরাট ডেস্কের বাঁদিকের কোণায় নেপোলিয়নের টুপির কায়দায় বানানো টুপিটা নামিয়ে রাখলো।

এই তাহলে ম্যানেজার, মিস হুয়াং মনে মনে ভাবছিল। সে ভাবছিল ম্যানেজার কখন তাকে ডেকে কাজ দেয় তার জন্য অপেক্ষা করবে, না কি এখনই এগিয়ে গিয়ে কিছু কাজ চেয়ে নেবে। এখন ম্যানেজারের আসার পর তার সহকর্মীদের কোনরকম আবার অনুষ্ঠান পালন করতে হচ্ছে কিনা সেটা সে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। কোনো কিছু চোখে পড়লো না তার। অফিসের উঁচু পদাধিকারীর দল কান দিয়ে ম্যানেজারের প্রতিটি গতিবিধি অনুসবণ করছিল। নিচের স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে অনেকে আগের থেকেই ব্যস্তভাবে লিখছিল কিংবা কানে কলম গুঁজে বিরাট বিরাট লেজারের পাতা উল্টাচ্ছিল।

ম্যানেজার বসে পড়লো। এক হাত তার পেটমোটা চামড়ার পোর্টফোলিওর ওপর, অন্যটা দিয়ে সে একটা নস্যির কৌটো টেনে বার করলো।

মাঝবয়সী মোটকু বসেছিল ম্যানেজারের সামনের ডেস্কে, কিন্তু মনে হচ্ছিল তার মাথার পিছনের দিকেও যেন দুটো চোখ রয়েছে। ম্যানেজার দ্বিতীয় টিপ নস্যি নিয়ে সামনেব দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই মোটকু অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে উঠে পড়লো। একরাশ কাগজপত্র নিয়ে, পা টিপে টিপে সে ম্যানেজারের ডেস্কের দিকে এগিয়ে চললো। কানে কানে কয়েকটা কথা বলার সময় কাঁধ দুটো তার আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের মতো নুয়ে পড়লো। তারপর কাগজপত্রগুলো সে ম্যানেজারেব সামনে নামিয়ে রাখলো।

'আহ —' ম্যানেজার কর্কশ গলায় বলে উঠলো। মিস হুয়াং-এর মনে হলো ম্যানেজার যেন তারই দিকে তাকিয়ে আছে। একটু থতমত খেয়ে, মিস হুয়াং মাথা নিচু করলো। শুধু কলম, কালির শিশি আর ব্লটিং ছাড়া তার ফাঁকা ডেস্কের চেহারা দেখে তার নিজেরই অপ্রস্তুত লাগছিল। তার হাত দুটো নিয়ে সে যে কি করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না!

মধ্যবর্তী সময়টুকু হয়তো খুব বেশি দীর্ঘ ছিল না, কিন্তু মিস হুয়াং-এর মনে হচ্ছিল তার যেন অন্ত নেই! হঠাৎ একটা হাত এসে তার কাঁধের ওপর পড়লো, সচকিত হয়ে সে উপর দিকে তাকালো। মোটকু তার পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। মিস হুয়াং-এর কাজ এসে গেছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সে। যে দলিলটা তাকে দিচ্ছিল তার মধ্যের বিভিন্ন ব্যাপারগুলো বিশেষ করে দেখিয়ে দেবার সময়, মোটকুর কুৎকুতে কালো চোখ দুটো মিস হুয়াং-এর সারা শরীর বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল। কেরানিগিরিতে তার দক্ষতা যাচাই করছিল নিশ্চয়।

'সব বুঝতে পেরেছেন তো?' ভদ্রতা করে মোটকু শেষকালে জিজ্ঞাসা করলো।

তারপর তেমনি মৃদু হাসি হাসতে হাসতে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো, 'আচ্ছা মিস হুয়াং, এখন বলুন তো, আপনি একা থাকেন, না আপনার পরিবারের সঙ্গে থাকেন?'

অতর্কিত প্রশ্নে অবাক হয়ে কি বলবে তা ভেবেই পেল না। মোটকু হেসে উঠলো তারপর আবার তার আমলাসুলভ চড়া গলায় ফিরে গেল। 'দয়া করে আজ সকালের মধ্যেই ওটা শেষ করে ফেলবেন।'

অবশেষে মোটকু চলে গেল। কিন্তু মিস লির ডেস্কের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটু থেমে মিস লি যে দলিলটা নকল করছিল সেটা তুলে নিল। তুলে নিয়ে নাকের এত কাছে ধরলো যে বোঝাই গেল না যে সেটা সে পড়ছে না শুঁকছে।

ভয়ে ভয়ে মিস হুয়াং তার কাজে মন দিলো, এমন কি চোখ তুলতেই তার সাহস হচ্ছিল না। ঘন্টা দেড়েক লেখার পর তার হাত একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। কলমটা নামিয়ে রেখে সে রুমাল দিয়ে কপাল মুছলো। ডানদিক থেকে একটা নারী কণ্ঠস্বর তার কানে এসে পৌঁছালো, 'কি যে সব বলেন আপনি!' ওখানে মিস লির ডেস্কের একধারে তার বিশাল পাছা বিছিয়ে মোটকু ফিসফিস করে কথা বলে চলেছে।

রাঙ্গামুখো ম্যানেজার অফিসের মাঝখানে বসানো তার বিরাট ডেস্ক ছেড়ে উঠে গেছে, নেপোলিয়নের টুপির কায়দায় বানানো তার টুপিটা কিন্তু তখনও ডেস্কের বাঁ-কোণায় বসানো রয়েছে। বৈদ্যুতিক ঘড়ির কাঁটা দুটো তখন এগারোটা বেজে দশ মিনিট দেখাচ্ছে।

এগারোটা বেজে দশ। মিস হুয়াং-এর বুকটা ধক্ করে উঠলো। চারপাশে তাকাবার আর সময় নেই। মাথা হেঁট করে সে কাজ করে চললো। কিন্তু সে যত বেশি বিচলিত হতে লাগলো তার হাতও ততো বেশি করেই তার সঙ্গে অসহযোগিতা করতে লাগলো আর তার শ্রবণ শক্তিও ঠিক ততটাই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগলো। সমস্ত অফিস জুড়ে যেন অনুচ্চ কণ্ঠস্বর আর মৃদু সম্মোহনী হাসির গুঞ্জন উঠছে। সে দেখলো তিন সারি আগে একটি মেয়ে অলসভাবে আড়ামোড়া ভেঙে, বঙ্কিম ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো, তারপর তার সামনের সারিতে বসা লোকটির দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, "এই হিসাবটা আমাকে একেবারে মেরে ফেলেছে। অনুগ্রহ করে আমাকে একটু সাহায্য করুন না, মিঃ চেন — করবেন তো?"

মিঃ চেন-এর একগাল হাসিই হলো তার একমাত্র উত্তর। ঠোঁট ফুলিয়ে মেয়েটি তার অসমাপ্ত হিসাব মিঃ চেনের ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখলো, আর পুরুষটিও এই সুযোগে রঙ্গভরে মেয়েটির হাতে একটা চিমটি কাটলো। "উঃ!" অত্যধিক যত্নের সঙ্গে আহত জায়গাটির উপর তার সূক্ষ্ম রুমালখানি চেপে ধরে, মেয়েটি অতিরঞ্জিত যাতনায় চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে কোমর বাঁকিয়ে আড়চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পুরুষটির দিকে তাকালো।

মিস হুয়াং সবই দেখতে পেলো আর দেখে তার গা গুলিয়ে উঠলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে কাজ আরম্ভ করতে যাচ্ছিল এমন সময় তার চোখ পড়লো মিস চ্যাং-এর উপর। তার স্কুলের পুরনো বন্ধু হাসি চাপবার জন্য মুখের উপর একটা রুমাল চেপে

ধরেছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে অফিসের একজন উঁচু পদাধিকারী।

একটা অফিসে কি করে এমন হতে পারে? মিস হুয়াং নিজেকে প্রশ্ন করলো। দাঁতে দাঁত চেপে সঙ্কল্প করলো কিছুই শুনবে না। কিছুই দেখবে না সে — শুধু হাতের কাজ করে যাবে।

সে সময়ে সেই বোধহয় একমাত্র লোক যার মনে হচ্ছিল ঘড়িটা খুব দ্রুততালে চলেছে। তার কাজ — সকালে যে কাজ তাকে শেষ করতে বলা হয়েছিল — সে কাজ অর্ধ সমাপ্ত হয়েছে মাত্র — এমন সময় চেয়ার সরানো শুরু হলো। তাড়াতাড়িতে মিস হুয়াং কাগজের উপর খানিকটা কালি ছিটিয়ে ফেললো। ক্ষিপ্রভাবে ব্লটার লাগালো সে, ভয় হচ্ছিল মোট্‌ক না এসে পড়ে তার কাজ পরীক্ষা করতে। কিন্তু মনে হলো সকালে তাকে কি বলেছিল মোটকু সে কথা একেবারে ভুলেই গেছে। টুপি হাতে, কাঁধে জ্যাকেট ঝুলিয়ে সে মিস লি-র ডেস্কের পাশে অধৈর্যভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিস লি ছোট একটা আয়না ধরে সন্তর্পনে মুখে মেক আপ (make up)' লাগাচ্ছে।

"মোটকু আর মিস লি আজও আবার দুজনে একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করতে যাচ্ছে", প্রস্থানোদ্যত জুটির দিকে তাকিয়ে কেরানিদের মধ্যে একজন অপব জনকে টিটকারী দিয়ে বললো।

তারপর মধ্যাহ্নের ঘন্টা পড়লো। মিস হুয়াং হতাশভাবে তার কলম নামিয়ে রেখে দুটো হাতের মধ্যে মাথা রাখলো, কেমন যেন আচ্ছন্ন ভাব।

"হুয়াং, চলো খাওয়া যাক!" মিস চ্যাং তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ডাক দিল।

মিস হুয়াং আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে, মিস চ্যাং-এর দিকে তাকিয়ে তিক্ত হাসি হাসলো, তারপর তার সঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লো। রেস্টুরেন্টে পৌঁছবার আগে মৃদু গলায় তাকে প্রশ্ন না করে পারলো না :

"ওরা অমন ধারা করে কি করে? আমার পক্ষে মেনে নেওয়া একটু কঠিন হয়ে পড়ে!"

"ওঃ, কিছুদিন পরে এসব তোমার গা সহা হয়ে যাবে," মিস চ্যাং লঘুভাবে বললো।

মিস হুয়াং ভালো করে তার বন্ধুর আপাদমস্তক একবার দেখে নিল। তার মনে হলো ঐসব ঝলমলে রঙগুলো খুব একটা মিশ খাচ্ছে না। লক্ষ্য করলো মিস চ্যাং গালে রুজ লাগিয়েছে।

"যস্মিন দেশে যদাচারঃ!" একটু যেন দুঃখ করেই মিস চ্যাং হঠাৎ বলে উঠলো। "সব সময়ে স্রোতের বিরুদ্ধে গেলে তুমি তো চলতেই পারবে না!"

নিজের সাদাসিধা পোশাকের দিকে তাকিয়ে মিস হুয়াং অফিসের অন্যান্য মেয়েদের জমকালো চটকদার সাজ-পোশাকের কথা ভাবছিল। কি করে পারে ওরা সেইটাই তার মাথায় আসছিল না — ওদের মধ্যে সব থেকে বেশি মাইনে যে পায়

তার আয় মাসে যাট থেকে সত্তর ডলার, অনেকে আবার তিরিশ ডলারেরও বেশি পায় না। তার যৎসামান্য মাইনের পুরোটাও যদি তার জামাকাপড়ের জন্য খরচ করে তবু সে ওদের সঙ্গে তাল দিতে পারবে না। তাছাড়া তার নিজের পরিবারের জন্য পুরো মাইনেটাই তার প্রয়োজন। মিস হুয়াং-এর কান্না পেলো।

আমি জানতাম এ ধরনের কাজে আমি কখনও সুখী হবো না — কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি আমার এত খারাপ লাগবে। মিস হুয়াং-এর চোখে জল এসে গেল।

[মাও টুন ওবফে শেন ইয়েন-পিং, চীনেব বিপ্লবী ও বাস্তববাদী লেখকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের "First morning at the office"-এর ছায়াবলম্বনে।]

বুনো বোরোনিয়া ফুল
(এন' গুলা)

ক্যাথারিন সুসানা প্রিকার্ড

হোঁচট খেতে খেতে, টলতে টলতে বুড়ো লোকটি বালির রাস্তায় বেয়ে উঠছিল। সরু সরু আগাছা আর ঝোপে ঢাকা নিচু একটা টিলার গা বেয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে রাস্তাটা।

কাছে পিঠের শহরতলি থেকে কাজের শেষে ফেরার মুখে মেরি তাকে পার হয়ে এলো। পিছন থেকে বুড়ো লোকটির ডাকে মেরি থমকে দাঁড়াতে, সে কোন রকমে টলতে টলতে মেরির দিকে এগিয়ে এলো। ছেঁড়া জুতোর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকা, রাঙাধুলোর পুরু প্রলেপ মাখা ফাটা ফাটা আঙুলগুলো মেরিকে বলে দিলো লোকটি আসছে বহু দূর থেকে।

"এন' গুলা!" লোকটি চেঁচিয়ে উঠলো। "হ্যাঁ গো মা, 'নেটিভ ক্যাম্পে' (আদিবাসী শিবির) এন' গুলা বলে কোনো মেয়ে আছে কিনা জানো?"

"কস্মিন কালে তার নাম শুনিনি," বলে মেরি এগিয়ে চললো। শনিবারের সন্ধ্যা, তার এখন বাড়ি ফেরার ভীষণ তাড়া। জুতো জোড়া হাতে ধরে, খালি পায়ে রাস্তা বেয়ে উঠছিল, সপ্তাহ শেষের জন্য কেনা মাংস ও সবজি ভরা থলের ভারে, নমনীয় কর্মপটু শরীর তার একদিকে নুয়ে পড়ছিল। বছর চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হবে তার। পরনে ফুল ছাপা সুতির তৈরি ছিমছাম পোশাক, বুড়ো লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিল তার আদিবাসী সুলভ সুন্দর বাদামী রঙের চোখদুটি মেলে. তার চুলের রঙ কিন্তু বাদামী, জায়গায় জায়গায় পাক ধরেছে, গায়ের রঙে হলুদের আভাষ।

বুড়ো লোকটিকে নবাগত বলে মনে হলো তার। সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর অবশিষ্ট যৎসামান্য অংশের থেকে পরিত্যক্ত এক মানুষ, ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের এক প্রান্তে আদিবাসীদের কুঁড়েগুলো নিয়ে গড়া এই পল্লীতে এসে পড়েছে। এটা হচ্ছে নিজ নিজ উপজাতীয় গোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত, এখনও যাদের আদিবাসী মনে করা হয়, মিশ্রিত রক্তের এমন সব মেয়ে পুরুষদের আশ্রয়স্থল — এদের মধ্যে রয়েছে বুড়োর গোষ্ঠীর লোক, রয়েছে মেরিও।

ঐখানে জড়ো হওয়া জঙলি, যাযাবর ধরনের লোকগুলোর সঙ্গে মেরি কোনো সংস্রবই রাখে না। ওদের মধ্যে বয়স্ক বয়স্কাদের সঙ্গে অবশ্য ওর সৌহার্দই আছে।

মেরি থাকে এই পল্লীরই এক প্রান্তে। ওর স্বামী, মেরির মতই গায়ের রঙ তার, মাঝে মাঝে ওকে ব্যঙ্গ করতো, সাদা চামড়াদের মেয়েদের মত করে ওর থাকার এই প্রচেষ্টার মিশন স্কুলে শেখা পদ্ধতিতে বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আর নিজেকে ভদ্র, সভ্য করে তোলা।

এখান থেকে ওর বাড়ি বেশি দূরে নয়, টুকরো টুকরো কাঠ মরচে পড়া কেরোসিনের টিন দিয়ে বানানো ঢিবি গোছের ঘর একটা, বেঢপ আকারের, ঘুপচি, এমনই তার ছাত যে শীতকালে তার মধ্যে দিয়ে ঘরে বৃষ্টিব জল পড়ে। কিন্তু যে জমিব ওপর ঘরটা বানানো — সেটা মেরির নিজের। তাই নিয়ে তার খুবই গর্ব। শহরতলিতে, বাড়ি বাড়ি ঘর মুছে আব কাপড় কেচে অর্জিত যে টাকা বছবের পর বছর তারই থেকে বাঁচানো, লুকিয়ে রাখা টাকা দিয়ে কেনা এ জমি। মেরির ছেলে-মেয়েরা সব এখন বড় হয়ে গেছে -- আস্তে আস্তে যে যার মত মেরির কাছে থেকে দূরে সরে গেছে। এখন সে বেঁচে আছে, প্রাণপাত করে খেটে মরছে শুধু তার এ জমির ওপর একটি বাড়ি তুলবে বলে : কবোগেটেড টিনের ছাদ দেওয়া কাঠের তৈরি ছোট্ট একখানি বাড়ি।

মেরি যেটাকে তার বাগান বলে, তারই শুকনো বালির ওপর ক'টা টোমাটোর চারা নেতিয়ে পড়ে আছে। দরজা খুলে ঘরে ঢোকবার আগে স্নেহাতুর দৃষ্টিতে মেরি অনেকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

টেবিলের ওপর তার স্বামীর ছড়িয়ে রেখে যাওয়া উচ্ছিষ্টের টুকরো আর আ-ধোওয়া থালা বাসন দেখে বিরক্ত হলো সে. বাজারের থলে নামিযে রেখে মেরি সে সব পরিষ্কার করলো। ঘরের মেঝের উন্মুক্ত চুল্লীতে আগুন জ্বালালো, ঘর ঝাঁট দিলো, থালা বাসন মাজলো, স্টু বানাবে বলে বাজার থেকে আনা মাংস আর সবজি কেটে একটা পাত্রে রাখলো। তারপর পাত্রটা চাপালো আগুনের ওপর। টেড হয়তো তাড়াতাড়িই খেতে ফিরবে, অবশ্য বেশিরভাগ শনিবারের রাতগুলোয় সে এত মাতাল হয়ে ফেরে যে বিছানায় এলিয়ে পড়ে সকাল পর্যন্ত ঘুমোনো ছাড়া আর কিছু করার মত অবস্থা তার আর তখন থাকে না।

ঘরকন্যার কাজ শেষ করে মেরি দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো, যে বুড়ো লোকটিকে সে রাস্তায় পার হয়ে এসেছিল, সে ততক্ষণে আদিবাসী পল্লীতে চলে গেলো কিনা, তাই ভাবছিল সে। ভাবছিল লোকটির সঙ্গে অমন রূঢ়ভাবে কথা না বললেই পারতো। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখে টিলার একপ্রান্তে বুড়ো লোকটি কাঠকুটো কিছু জড়ো করে একটুখানি আগুন জ্বালিয়েছে। শুনলো, লোকটি আপনমনে, ক্লান্ত একঘেঁয়ে সুরে গান করে চলেছে।

'নেটিভ' (আদিবাসী) নাম ধরে ডেকে কেনই বা সে একটা মেয়ের খোঁজ করলো ? ও নামে কেউ তো তাকে চিনবে না। তাদের কখনও কোনো 'নেটিভ' নাম ছিল কিনা সে কথা আদিবাসী পল্লীর বেশিরভাগ মেয়েরই মনে নেই। সব এখন জীন আর জেনি, কিটি আর ডালসিব দল।

"এন' শুলা!" নামটার মধ্যে আবছাভাবে পরিচিত কি একটি জিনিস যেন মেরিকে বিচলিত করলো। নামটা আগে যেন শুনেছে বলে মনে হচ্ছিলো তার কিন্তু কবে এবং কোথায় তা আর তার মনে আসছিল না।

অস্তগামী সূর্যের আলো আকাশটাকে যেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছিলো। সারাদিনের কাজের পর ক্লান্ত হয়ে মেরি দরজার কাছে একটা বাক্সের ওপর বসে পড়লো।

তার মনে পড়ছিলো এমনি আরও অনেক সন্ধ্যার কথা। এমনিভাবে বসে বসে সে সূর্যাস্ত দেখেছে, টিলার মাথায় ভাঙাচোরা বাড়িতে সারা জেলার থেকে জড়ো করা আবর্জনা পোড়ানোর উৎকট গন্ধে আকাশ-বাতাস পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকা সত্ত্বেও, এই শান্ত পরিবেশে সে শান্তি পেয়েছে।

আর ঐ জন্যই তো, তিক্তভাবে মেরি চিন্তা করছিল, পাহাড়গুলোর এপাশের কত শত শত মাইলের মধ্যে ঊষর এই প্রান্তর টুকুতেই আদিবাসী লোকদের একত্রে জড়ো হতে একত্রে বাস করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এখানে খাটো খাটো পাহাড়ে ঘেরা নিচু একটা জায়গা -- শীতকালে পরিণত হয় একটা জলায় আর গ্রীষ্মকালে হয়ে যায় শুষ্ক, কঠিন ; এই পাহাড়গুলোর গায়ে গায়ে গোটা বিশেক পরিবার মেরির ঝুপড়ির মতই ঝুপড়ি বানিয়েছে। বেশিরভাগই মরচে পড়া টিন আর ছালা দিয়ে বানানো কোনো রকমে মাথা গোঁজবার আস্তানা মাত্র। দেখলে মনে হয় মাটির ওপর যেন বিশ্রী কতকগুলো ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে।

মেরি দেখতে পাচ্ছিল তারই কতকগুলো থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁওয়া উঠছে, আশে-পাশে বাচ্ছারা ছুটোছুটি করে খেলা করছে ; ছোট্ট শিশুরা একেবারে উলঙ্গ, একটু বড়দের পরনে রঙিন কানি। একটা ঝোপের ধারে মাটিতে থেবড়ে বসে তাস খেলছে জনা ছয়েক মেয়ে-ছেলে। চেটালো একটা জায়গায় চলেছে জুয়া খেলা, মেয়ে-পুরুষ উন্মত্তের মত ঠেলাঠেলি করছে, দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার আগে যাতে করে তাদের শেষ বাজিটা তারা ধরতে পারে।

"এন' শুলা! এন' শুলা!"

কথাগুলো মেরির মাথার মধ্যে যেন মাছির মত ভনভন করছিল। ঘুরে ফিরে বারবার বিরক্তিকরভাবে যেন মেরিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছিল, তার মনের মধ্যে অস্বস্তিকর একটা অনুভূতির সৃষ্টি করছিল, তালগোল পাকানো কতকগুলো স্মৃতি জাগিয়ে তুলছিল। নিজেই বা সে কে ? কোথা থেকেই বা এসেছে ? এ সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই — একবার হাসপাতালে যখন সে আদিবাসী রোগীদের দেখতে যায় তখন তাদের মধ্যে থেকে এক বুড়ি তাকে যে কথাগুলো বলেছিল যদি না তার মধ্যে সভ্যতা কিছু থেকে থাকে। মেরি যখন তার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো বুড়ির মৃত্যু তখন আসন্ন, ভুল বকছিল সে।

"তুই তো হচ্ছিস পোর্ট হেডল্যান্ড অঞ্চলের মেয়ে," চিৎকার করে উঠেছিল বুড়ি। "বুলিয়ারি (উপজাতীয় এক গোষ্ঠী) — আমিও তাই।"

"তুমি জানলে কি করে ?" মেরি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

বুড়ি তখন বিড়বিড় করে পিঁপড়ে আর মেরির কপালের দাগ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলেছিল। পরে আদিবাসী পল্লীতে ফিরে গিয়ে মেরি উৎফুল্লভাবে বলেছিল — সে এসেছে পোর্ট হেডল্যান্ড থেকে — বুলিয়ারি উপজাতীয় গোষ্ঠীর মেয়ে সে। কিন্তু একথা সে কখনও কাউকে বা সাদা চামড়ার কোনো লোককে বলেনি, সে যে কোনো একটা জায়গা থেকে এসেছে, কোনো একটা উপজাতীয় গোষ্ঠী থেকে এসেছে এটা ভাবতে তার একটি গোপন উল্লাস হোত।

পাহাড়গুলোর সীমারেখার ওধারে। গুহার গায়ে ছবি আঁকার জন্য ব্যবহৃত গিরিমাটির মত ম্যাটম্যাটে লাল রঙ জ্বলতে জ্বলতে যেন নিভে আসছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হলো, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঝুপড়ীগুলোয় বাতি ঝিক্‌মিক্ করতে লাগলো।

'এন'গুলা ! এন'গুলা !"

মেরি চমকে উঠলো, বুড়ো লোকটি দক্ষিণের আঞ্চলিক ভাষায় গান গাইছে। অন্ধ নেলির কাছ থেকে এ ভাষার অনেক কথা সে শিখেছে : তার কথা শুনে শুনে, তার গাওয়া গান শুনে শুনে আর পশুপাখী যারা নাকি এক সময় নিয়ুঙ্গার (কৃষ্ণকায় জাতি) ছিল, তাদের সম্বন্ধে গল্প শুনে শুনে।

"ছোট্ট মাণিক, ছোট্ট মাণিক
আমার হারানো মাণিক গো
স্বপ্নের খুকু মাণিক আমার
কোথায় তুমি কোথায় গো ?
বহুদিন ধরে গোয়েলনিট হায়
  বহুপথ ঘুরে মরছে
নাম ধরে তোমার ডাক দিয়ে দিয়ে
  কত খোঁজ তোমার করছে।
হাড়ে হাড়ে তার ঘুণ ধরে গেছে
  দৃষ্টি হয়েছে ক্ষীণ
যাত্রা তার শেষ হয়ে এলো হায়
ঘনিয়ে এসেছে দিন !"

এইভাবে গান চললো, অদ্ভুত সে এক গুঞ্জন আর বিলাপ, এক নাগাড়ে ঘুরে, বারবার। নিবিষ্ট মনে মেরি শুনতে লাগলো বুড়োর সেই গুঞ্জন। চাপা সুর থেকে হঠাৎ সে এমন এক তীক্ষ্ণ আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলো "এন'গুলা ! এন'গুলা !" যে মেরি একেবারে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

দ্রুত পায়ে মেরি এগিয়ে গেল আগুনের ধারে বুড়ো লোকটির কাছে। ও গিয়ে দাঁড়াতে বুড়ো তার ক্লান্ত, বিহ্বল চোখ দুটো তুলে মেরির দিকে তাকালো।

"ও কে, তোমার ঐ এন'গুলা ?" মেরি প্রশ্ন করলো।

"আমার মেয়ে !"

বুড়ো ওর দিকে তাকিয়ে রইলো, গান গাওয়ার বেদনার ভারে মুখ তার ভারাক্রান্ত।

"তুই?"

"আমি মেরি। আমার স্বামীর সঙ্গে থাকি ঐখানে।"

"ওঙ্গি (আদিবাসী) মেয়ে?"

"ইয়েলার-বিডি (দো-আঁশলা)।"

মেরির গলার স্বরের শুষ্কতা বুড়োর কানে বাজলো।

"এন'গুলাও ইয়েলার-বিডি," বিড়বিড় করে সে বললো।

"তার কথা আমায় বলো।" মেরি বুড়োর সামনে মাটিতে বসে পড়লো মুখোমুখি হয়ে। "আমি বুলিয়ারি উপজাতীর লোক।"

বুড়ো ঘাড় নাড়লো, উপজাতীয় রীতিনীতির প্রতি মেরির শ্রদ্ধার পরিচয়ে, রোদে জলে ক্লিষ্ট কপালের ওপরের গভীর রেখাগুলো যেন তার শিথিল হলো, এটা যেন তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করলো।

কিন্তু অপরিচ্ছন্ন এই বুড়ো লোকটির সঙ্গে মেরি কোনো রকমের যোগসূত্র স্থাপন করতে চায় না, তার মনোভাবের আকস্মিক একটি পরিবর্তন অনুভব করে মেরি নিজেকে সেই কথাই বলছিল। আদিবাসীদের রীতিনীতি, ভাবধারণায় ফিরে যাবার পক্ষে অনেক বেশি দিন সে সাদা চামড়ার লোকেদের সঙ্গে কাটিয়েছে। সে যে কোনো এক উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোক এ কথাটাই বা সে বুড়োকে বলতে গেলো কেন? পাছে তারা নিষিদ্ধ সম্পর্কের পর্যায়ে পড়ে যায় সেই জন্যে কি? বুড়ো লোকটি যাতে সহজ হতে পারে সেই জন্য কি? না, এটা তার একটা ভাবাবেগ যেটা সে রুখতে পারলো না? হতাশা ও দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত সরল কালো মুখটার দিকে তাকিয়ে মেরির মনে সহানুভূতির সঙ্গে স্বতপ্রবৃত্ত একটা সম্ভ্রমের ভাব এসে মিশলো।

বুড়োর দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলতে, মেরি দেখলো তার চোখের মধ্যে আগুনের আলোর আভাস। তারা খাড়া ঝাঁকড়া পাঁকা চুলগুলোর নিচে, কপালের ওপরে আগুনের আভা যেন লাল একটা পটি পরিয়ে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছিল। তার পরনের শার্ট শতচ্ছিন্ন হতে পারে, তার রঙজ্বলা পাৎলুনে জায়গায় জায়গায় কালো হাঙ্গরের দাঁত দিয়ে সেলাই তাপ্পি চোখে পড়তে পারে; কিন্তু মেরি এটা বুঝতে পেরেছিল, যে উপজাতীয় গোষ্ঠী থেকে সে আসছে সেখানে সে একজন গণ্যমান্য লোক।

"এন গুলা আমার মেয়ে — আমার মেয়ে নয়ও বটে", বুড়ো লোকটি বললো। "আমি হচ্ছি ওয়াবেরী উপজাতীর লোক — যাদের প্রতীক হচ্ছে ওয়েচ ব্রম্মা (এমুপাখী)। আমার বাপ জেঠা আমার নাম রেখেছিল গোয়েলনিট। সাদা চামড়ার লোকেরা আমাকে ডাকে জো মোজেস বলে। সাদা চামড়ার লোকেদের সঙ্গে এক লড়াইয়ের পরে ওরা আমাকে সমুদ্রের এক খাঁড়ির মধ্যের নল খাগড়ার ঝোপে

কুড়িয়ে পায়। আমার জাতের বহুলোক মারা পড়েছিল সেই লড়াইয়ে। আমার জাতের লোকদের বুজেরা (উপজাতীয় অঞ্চল) হচ্ছে সুদূর দক্ষিণের কালাগান নদীর ধারে।"

গোয়েলনিট সাদা চামড়ার লোকেদের ভাষা এমনভাবে বলতে পারে যাতে করে মনে হয় সে এ ছাড়া অন্য আর কোনো ভাষা জানে না, সেটা মেরি বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছিল ; কিন্তু তবুও মাঝে-মাঝেই সে তার নিজের আঞ্চলিক ভাষায় কিংবা বিভিন্ন উপজাতীর লোকেরা আদিবাসী পল্লীতে যেমন গোঁজামিল দিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে কথা বলে, সেইরকম ভাষায় কথা বলছিল।

শেষ পর্যন্ত এই গল্পটা সে মেরিকে বলেছিল — যদিও মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে অতীতের নানা কথায় চলে যাচ্ছিল।

দক্ষিণের সেই অঞ্চলের সাদা চামড়ার লোকেদের অগ্রগামী একটা দলের একজনের স্ত্রী সেই কালো আদিবাসী শিশুটিকে, তার জাতের মুষ্টিমেয় জাতিদের মধ্যে সে ছিল একজন, তার নিজের ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে লালনপালন করে বড় করে তোলে। ছেলে দুটি বড় হয়ে ওঠে, একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়তে শেখে, স্টকম্যান, গোরু ভেড়া, শুকর ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী হতে শেখে। তরুণ জ্যাক উইস্টারটন যখন পোর্ট হেডল্যান্ড ছাড়িয়ে উত্তরের দিকে আরও জমি দখলের জন্য যায় তখন গোয়েলনিট তার সঙ্গে গিয়েছিল। উজীরালের গবাদিপশু কেন্দ্রের প্রধান স্টকম্যান হয় সে, ওখানেরই এক উপজাতীয় মেয়েকে বল্লম যুদ্ধে জিতে সঙ্গিনী হিসাবে লাভ করে "নেটিভ ক্যাম্পে" তারই সঙ্গে বসবাস করতে থাকে।

উপজাতীয় বৃদ্ধেরা সাদা চামড়ার লোকেদের খুব বিদ্বেষের চোখে দেখতো। বিগত পূর্বপুরুষদের জীবনী শক্তি দিয়ে গর্ভধারণ করা মার কাছে একটি শিশুর আত্মা আসে কোনো পাহাড়, ডোবা কিংবা জন্তু-জানোয়ারের মধ্য দিয়ে — প্রচলিত এই বিশ্বাস আঁকড়ে থাকলেও বৃদ্ধেরা এটা স্থির করেছিলো যে সাদা চামড়ার পুরুষদের সঙ্গে তাদের জাতের মেয়েদের সহবাসের ফলে জাত দুর্বল হয়ে পড়বে। এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে এর ফলে অন্যান্য উপজাতিগুলোর মত তাদের জাতও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যদি না তারা তাদের মেয়েদের এর হাত থেকে রক্ষা করে। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তারা দেখেছিল যে সাদা চামড়ার পুরুষদের সঙ্গে আদিবাসী মেয়েদের সহবাসের ফলে যে শিশুদের জন্ম হয় তাদের গায়ের রঙ হয় ফ্যাকাশে, শিশুর ফ্যাকাশে রঙ দুর্বলতার লক্ষণ বলে মনে করা হতো। এই কারণেই উপজাতীয় মেয়েদের নিষেধ করা হয়েছিল তারা যেন সাদা চামড়ার পুরুষদের দেহদান না করে।

প্রচণ্ড গর্বের সঙ্গে মেয়েরা নিজেদের শিশু সন্তান সকলকে দেখতো, তাদের গায়ের কালো রঙে পরম আনন্দলাভ করতো।

এ ব্যাপারে গোয়েলনিটের সঙ্গিনী মিটুনের গর্বের প্রচণ্ডতা ছিল সব থেকে বেশি — একের পর এক সে ছেলে প্রসব করেছে, তাদের গায়ের রঙ গোয়েলনিট আর মিটুনের গায়ের রঙের মতই গাঢ় তামাটে।

এবার সে এক মেয়ে প্রসব করলো। যে সব বৃদ্ধরা তাকে দেখাশোনা করেছিল'

বাচ্চা দেখে তাদের বেশ সন্দেহ হোল, আর মিটুন তো লজ্জায়, রাগে একবারে অভিভূত হয়ে গেলো। গোয়েলনিট নিজে যখন বাচ্চাকে দেখলো সেও বুঝলো মিটুন নিষিদ্ধ কাজই করে বসেছে। তার রাগ চড়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গিনী কিনা আজ তার এই অপমানের কারণ হলো। এখানের এই উপজাতীয় গোষ্ঠীতে সে একজন ভিন্ন গোষ্ঠীর আগন্তুক বটে কিন্তু তার শরীরে রয়েছে আদিবাসীর খাঁটি রক্ত ; এমন একজন লোক সে যাকে মিটুনের আত্মীয় পরিজন বিশ্বাস করতে শিখেছে, তাকে তারা সব রকমের অধিকার দিয়েছে। কিন্তু তার রাগের থেকে মিটুনের রাগ ছিল তীব্রতর।

"এ আমাদের মুনিবের কীর্তি" — মিটুন বলেছিল। কথাগুলো মনে করার বেদনায় বুড়োর গলা কেঁপে গেলো। "তুই যখন বলদ তাড়িয়ে জড়ো করতে গিয়েছিলি, তখন আমি গিয়েছিলাম বড় বাড়িতে রসদ আনতে। মুনিব 'আমাকে' ভাঁড়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। বললো কিছু হবে না। কেউ জানতে পারবে না। এখন এই মেয়ের জন্য আমার মুখে চুনকালি পড়বে। হায়রে পোড়াকপাল আমার!"

মিটুনের সঙ্গে গোয়েলনিটের বছরগুলো সুখেই কেটেছে। অন্য এক উপজাতির লোকের বাগদত্তা মিটুনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে নেবার জন্য গোয়েলনিট যখন বল্লম ছোঁড়া অভ্যাস করতো তখন মিটুন ছিল ছিপ ছিপে বালিকাসুলভ। তারপর ক্রমে সে হয়ে উঠলো পুরন্ত বক্ষ সুদর্শনা তরুণী। গোয়েলনিটের প্রতি এবং তার নিজের গোষ্ঠীর প্রতি মিটুনের আনুগত্য সম্বন্ধে গোয়েলনিটের মনে কখনও এতটুকু সন্দেহের অবকাশ ঘটেনি। যেটা তাকে সব থেকে বেশি বিচলিত করেছিল সেটা হলো এই যে, এত বছর ধরে বিশ্বস্তভাবে যে লোকের কাজ সে করে এলো, সেই কিনা তাদের এই দুর্বিপাকে ফেললো।

"এ মেয়েকে বেঁচে থাকতে দেওয়া হবে না," মিটুন রাগেব মাথায় বলেছিল — বুড়ো দুঃখ করলো। "আমাদের লোকেদের জানা দরকার যে সাদা চামড়ার লোকটা আমার ওপর বল প্রয়োগ করেছে। ক'দিন বাদেই ওরা এ ঘটনার কথা ভুলে যাবে।"

গোয়েলনিট কুলোমনের (শিশুর খাদ্য রাখবার কাঠের পাত্র) মধ্যে শোয়ানো বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার হলদেটে বাদামী রঙের ছোট্ট দেহটি, ঘুমন্ত বোঁজা চোখদুটির নিচে বড় বড় কালো কোঁকড়ানো আঁখিপক্ষগুলি, ছোট্ট ছোট্ট হাত দু'খানি। সে নিজেও তো একদিন এমনি অসহায় ছিল। তার রাগ পড়ে গেলো।

'ও আমার মেয়ে,' বৃদ্ধাদের ডেকে সে বললো। 'দেখো ওকে যেন ঠিকমতভাবে দেখাশোনা করা হয়।'

বৃদ্ধার দল বুঝলো এ কথার অর্থ কি। একজন পুরুষ মানুষের অধিকার আছে তার সঙ্গিনীর গর্ভজাত যে কোনো শিশুকে নিজের সন্তান বলে দাবি করবার। তারা আর গোয়েলনিটের কথা অমান্য করার সাহস পেলো না।

চাপা রাগে থমথমে মুখ করে মিটুন তার এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে চিন্তা করতে

বসলো। বাচ্চার জন্য সে কিছুই করতে চাইতো না। বুক দুধে ভরে থাকলেও বাচ্চাকে খাওয়াতে চাইতো না।

সন্ধ্যা বেলায় চারণভূমি কিংবা পশুশালা থেকে ফিরে গোয়েলনিট দেখতো উরলির (ঝোপঝাড় আর ছালা দিয়ে বানানো ঝুপড়ি) সামনে মাটিতে থেবড়ে বসে আছে মিটুন। আর ভেতরে বাচ্চা কাতর স্বরে কাঁদছে। গোয়েলনিট বাচ্চাকে কোলে তুলে নিতো, তাকে সাফ-সুতরো করতো তারপর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতো মিটুন ঠিকমত বাচ্ছাকে দুধ দিচ্ছে কিনা। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় গোয়েলনিটের ছিল এই কাজ ; আর প্রতিদিন সকালে আর রাত্রি বেলায় দু'জনে বাচ্চাকে নিয়ে ঝগড়া করতো।

গোয়েলনিট তার নাম দিয়েছিল এন'গুলা, সে ছিল তাদের বুজেরার (উপজাতীয় অঞ্চল) জলাভূমি আর সমুদ্রের খাঁড়িগুলোর ধারে ধারে ফোটা বাদামী আর হলুদ রঙের ফুলের মত।

মিটুনকে গোয়েলনিট শাসিয়েছিল যদি এন'গুলাকে সে দেখাশোনা না করে, তাকে দুধ না দেয় তাহলে বাচ্চাকে সে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। মিটুনের মনের মধ্যে রাগ আর হিংসা ছাই চাপা আগুনের মত গুমরে উঠতো — বাচ্চার দিকে তাকালে গোয়েলনিটের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আর তার জীবনসঙ্গিনী, মিটুন, তার দিকে তাকালে সেই চোখে নেমে আসে অন্ধকার।

একদিন সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে গোয়েলনিট উরলির মধ্যে থেকে কোনো কান্নাকাটির আওয়াজ শুনতে পেলো না। সামনে বরাবরের মতো মুখখানা কালো করে মিটুন বসে বসে কি ভাবছে।

গোয়েলনিট গিয়ে উরলির মধ্যে ঢুকলো। কুলোমন খালি পড়ে রয়েছে।

"এন'গুলা কই ?" যে আতঙ্ক তখন তাকে অস্থির করে তুলেছিল এখনও তা বুড়োর কণ্ঠে প্রতিফলিত হল।

"পিঁপড়েদের লোকেরা তাকে নিয়ে গেছে" — মিটুন বলেছিল।" "ঐ হলদে বিচ্ছুটা আর আমার মুখে চুন কালি দেবে না।"

গোয়েলনিট রাগে উন্মত্ত হয়ে ওকে চেপে ধরলো।

"কোথায় রেখে এসেছিস তাকে, বল ?" সে দাবি করলো।

মিটুন কিছুতেই বলবে না। শেষকালে গোয়েলনিটের প্রহারে শঙ্কিত, রক্তাপ্লুত হয়ে চিৎকার করে বললো :

"পিঁপড়েদের বাসায় • • • • বড় পাথরের কাছে।"

গোয়েলনিট ধেয়ে চললো ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে। অন্ধকার হয়ে গেছে, মুলগা আর কাঁটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে মাইল দশেক দূরে বড় পাথরের কাছে যাবার পথ খুঁজে নিতে হচ্ছিল তাকে। ছুটে চললো সে তার এমু ভাইয়েদের গতিতে। তার মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ছিল ; বড় পাথরের প্রান্তরে যখন সে পৌঁছালো তখন দম তার প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, বড় পাথরের চারপাশে ইতঃস্তত ছড়ানো পিঁপড়েদের বাসাভর্তি ঢিবিগুলো।

তার মধ্যে যখন সে খোঁজা শুরু করলো তখন চাঁদ উঠে গেছে, খুঁজতে খুঁজতে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছিল সে। যদি কোনো শব্দ কানে আসে ; কিন্তু তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কান্নার ক্ষীণতম আওয়াজও তার কানে এলো না। অবশেষে বাচ্চাটাকে সে খুঁজে পেলো, চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল সে ; ছোট্ট একটা হলুদ রঙের দেহ আঁকড়ে ধরে রয়েছে রাশি রাশি কালো পিঁপড়ে ; তার চোখে মুখে, তার শরীরের প্রত্যেকটি খাঁজে খাঁজে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে — সর্বত্র পিঁপড়ের দল কামড়ে ধরে একেবারে শুষে খাচ্ছে তাকে।

গোয়েলনিট তাকে কোলে তুলে নিলো। তখনও দেহে তার প্রাণ রয়েছে, তখনও তার নিঃশ্বাস পড়ছে — কিন্তু এত ক্ষীণভাবে যে গোয়েলনিটের বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে পিঁপড়েদের লোকেরা তখনও তার প্রাণটুকু নিয়ে যায়নি। সে তার গা থেকে পিঁপড়ে ঝেড়ে ফেলতে লাগলো, তার চোখ মুখ থেকে তাদের টেনে টেনে বার করতে লাগলো, তার কপালের এক জায়গায় ছাল ছিঁড়ে গর্ত করে তার মধ্যে ঢুকে বসেছিল পিঁপড়ের দল — সেখান থেকে তাদের টেনে বার করতে লাগলো। বাচ্চার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে তাকে একটু সুস্থ করে তোলার জন্য নিজের থুতু ছাড়া আর কিছু তার মিললো না। নিজের থুতু নিয়েই সে বাচ্চার মুখে দিলো।

দ্রুত পায়ে, সন্তর্পণে তাকে নিয়ে শুঁড়ি পথ দিয়ে সে ফিরে চললো। থেকে থেকেই দাঁড়িয়ে পড়ে বাচ্চার মুখে মুখ লাগিয়ে দেখছিল তার নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে কিনা।

বাচ্চা কোলে নিয়ে ফিরে এসে মিটুনের সঙ্গে যখন তার দেখা হলো তখন সে বললো :

"যদি এন'গুলা না বাঁচে — তাহলে মিটুনও বাঁচবে না।"

মিটুন বাচ্চাকে কোলে নিলো। বাচ্চা তখন এত দুর্বল যে বুকের দুধ টেনে খাবার ক্ষমতা তার আর ছিল না। মিটুন তার বুক টিপে ফোঁটা ফোঁটা করে দুধ এন'গুলার মুখের মধ্যে ফেলতে লাগলো। তার মরদের এ পাগলামি মিটুনের বোধগম্য হচ্ছিল না। ছোট্ট বাচ্চাটার প্রতি তার এ স্নেহ, তার এ মমতা গোয়েলনিটের নিজেরই কেমন অদ্ভুত লাগছিল। বাচ্চাটার মধ্যে কি কোনো যাদু আছে যা গোয়েলনিটের অস্থি মজ্জাকে গলিয়ে দিয়েছে? ওর মধ্যে বিরাজমান বিগত পূর্ব-পুরুষদের আত্মা কি গোয়েলনিটের মন কেড়ে নিয়েছে?

মিঠুন যাতে বাচ্চার প্রয়োজনীয় সবকিছু করে তার ওপর দৃষ্টি রাখলো গোয়েলনিট। অবশ্য দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন যে নেই এ কথাটা কিছুদিন বাদেই বুঝতে পারলো সে, কারণ মিঠুনের ভয় ছিল এন'গুলা যদি না বাঁচে তাহলে গোয়েলনিট তাকে মেরেই ফেলবে।

পিঁপড়ের লোকেরা বাচ্চাটাকে খেয়ে তার হাড়মাস আলাদা করলো না ; সারাদিন রোদে পড়ে থেকেই বাচ্চাটা শুকিয়ে মরলো না — ব্যাপার দেখে বৃদ্ধার দল একেবারে হতবাক, তার এন'গুলা বেশ শক্ত, গোয়েলনিট মনে মনে বিজয়োল্লাস

অনুভব করছিল : তার এন'গুলার বাঁচবার ইচ্ছা আছে। আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠতে লাগলো সে — তাকে দেখে মহা আনন্দ পেত গোয়েলনিট। বালিকা বয়সে এন'গুলা হয়ে উঠল একটা পাখির মত প্রাণময়, সুন্দর। তার জন্য গোয়েলনিট গর্ব অনুভব করতো : গর্ব অনুভব করত যখন সে তাকে ডাকতো "মুমেই" (বাবা) বলে।

মেরির গায়ে যেন শিহরণ জাগলো, সব ইন্দ্রিয়গুলো যেন তার তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠলো, বুড়োর মুখে সে বর্ণনা শুনতে লাগলো কেমন করে এন'গুলা "ক্যাম্পে" অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করতো, তাদের মধ্যে কেউ যদি কখনও তাকে "হলদী'র বলে ডেকেছে অমনি কেমন করে সে চিৎকার করে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে তাদের বিপর্যস্ত করে দিতো, শেষ পর্যন্ত তাদের মায়েরা এসে ওর হাত থেকে তাদের রক্ষা করতো।

কোযানডং (অস্ট্রেলিয়ায় হয়, এক রকমের বাদাম) পুড়িয়ে এন'গুলা তার কালো ছাই চর্বির সঙ্গে মিশিযে সর্বাঙ্গে মাখতো। কিন্তু তাতেও তার কোনো ফল হতো না। বরঞ্চ তাদেব মত হবার জন্য তার এ চেষ্টা দেখে বাচ্চারা হাসাহাসি করতো, তাকে আরও ক্ষেপাতো।

মেরি যেন সব দেখতে পাচ্ছিল, ছোট্ট একটা মেয়ে, সর্বাঙ্গে তার তেলতেলা কালো রঙ মাখা। আর উলঙ্গ কৃষ্ণকায় শিশুর দল তাকে ঘিরে নৃত্য করছে, উপহাস কবে আরও ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে ; তারপর গাছগুলোর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে লম্বা চওড়া একজন লোক, তাদের দিকে তাকিয়ে রাগতভাবে চীৎকার করে কি সব বলতে বলতে বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে তুলে নিচ্ছে, তার গা থেকে কালো রঙ ধুইয়ে দিচ্ছে। কি যেন বলেছিল সে তাকে? গায়ের রঙে কিছু আসে যায় না। সে যেন হেসে উড়িয়ে দেয় আর উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোক, একজন যোগ্য লোক হবার উপযুক্ত সাহস যেন সে মনে রাখে। তাহলে সকলেই ভুলে যাবে যে এক দুষ্টু অপদেবতা এসে তার মাকে ভয় দেখিয়েছিল আর তার জন্মের আগে এসে তার গায়ের রঙ খানিকটা চুরি করে নিয়ে গেছে।

বাচ্চাটাকে ভোলাবার জন্যে লোকটি একটা গান গেয়েছিল ; গানটা ছিল বাদামী আর হলদে রঙের একটা ফুল সম্বন্ধে, সেই ফুল ফুটতো অনেক অনেক দূরের এক দেশে। অন্ধ নেলিও ঐ গানটা গাইতো। গানটা ছিল দুটি বাচ্চা ছেলে-মেয়ের সম্বন্ধে — বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুটি একদিন বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলে চলে গিয়ে হারিয়ে যায় -- তাদের সঙ্গে ছিল এক গোছা এন'গুলা ফুল, পথে যেতে তারা সেগুলো তুলেছিল, সেই ফুলের গন্ধ শুঁকে শুঁকে গিয়ে তাদের মা শেষ পর্যন্ত তাদের খুঁজে পেয়েছিল।

"এন'গুলার যখন বছর ছ'য়েক বয়স তখন একদিন ঘোড়ায় চড়া এক পুলিস তাদের 'ক্যাম্পে' এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল" বুড়োর গলার স্বরে মেরির মনযোগ আবার গল্পের দিকে আকৃষ্ট হলো।

এই ঘটনা যখন ঘটলো গোয়েলনিট তখন কালো কালো পাহাড়গুলোর মাথায় গবাদি পশু জড়ো করতে গিয়েছিল। ততদিন ওদের উপজাতীয় গোষ্ঠী এন'গুলাকে

ওদের একজন বলে গ্রহণ করেছে। উপজাতীয় গোষ্ঠীর সংগঠনে ওকে একটা স্থান দিয়েছিল ওরা। গোয়েলনিট ফিরে এলে মিটুন চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিলো, তার ভয় বাচ্চাটাকে পুলিসে ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে গোয়েলনিট হয়তো তাকেই দুষবে : কিন্তু পুলিস যেভাবে এন'গুলাকে ধরেছিল, যেভাবে তার হাত দুটো একসঙ্গে করে বেঁধেছিল, আর যেভাবে তাকে নিয়ে ঘোড়ায় করে চলে গিয়েছিল — তা দেখে "ক্যাম্পের" প্রত্যেকটি মেয়ে পুরুষ খুবই খুব্ধ হয়েছিল।

মনিবের আস্তাবলের প্রাঙ্গণে, একটা ঘোড়ার পিঠে জিন লাগিয়ে তার ওপরে চড়ে গোয়েলনিট পোর্টের থানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো।

পুলিস তো তার কথা শুনে হেসেই আকুল। সে যখন তাদের বলল—তার মেয়েকে কেন তারা ধরে এনেছে সে কথাটা জানবার জন্যই সে তাদের কাছে এসেছে।

"ও তোর মেয়ে হতে যাবে কেন?" লম্বাটে ধরনের পুলিসটা ওকে বললো, "তুই তো ইস্কাবনের টেক্কার মত কালো, আর মেয়েটাতো দো-আঁশলা। আমাদের ওপর হুকুম আছে দো-আঁশলা বাচ্চাদের "নেটিভদের ক্যাম্প" (আদিবাসী শিবির) থেকে সরিয়ে দক্ষিণে পাঠিয়ে দেবার, সেখানে তারা সরকারী প্রতিষ্ঠান আর মিশন স্কুলগুলোয সাদা চামড়ার লোকেদের ধরনধারণ, আচার ব্যবহার শিখবে।

রাগে দুঃখে গোয়েলনিট সাদা চামড়ার লোকেদের অভিসম্পাত করতে লাগল।

"তাকে তোমরা কোথায় পাঠিয়েছো?" সে আবার প্রশ্ন করলো। পুলিস সে কথা তাকে কিছুতেই বললো না।

"উদ্দেশ্যটা হচ্ছে," পুলিসটা তাকে বললো, "বাচ্চাটাকে 'নেটিভ ক্যাম্প' থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, কোনও দিন যে তাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল, এই কথাটা যাতে সে ভুলে যায়।"

তার নিজের আর এন'গুলার এই বিপর্যয়ে পাগলের মত হয়ে গোয়েলনিট থানা ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

শহরের অন্যান্য আদিবাসীদের কাছে থেকে গোয়েলনিট জানতে পারলো, এন'গুলাকে ধরে আনার পর দিনই তার মত আরও ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে তাকে দক্ষিণ অভিমুখী এক স্টীমারে তুলে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ অভিমুখী, ঠিক পরের এক স্টীমারে গোয়েলনিট উঠে পড়লো।

স্টীমারে এক মাল্লার সঙ্গে তার কথা হলো। লোকটি তাকে বললো, বাচ্চাটাকে যে কোথায় পাঠানো হয়েছে তা বার করা খুবই কঠিন। পার্থ (perth) এর চার পাশের শহরতলি গুলোয় নানা 'হোম' (অনাথ আশ্রম) আছে, রোমান ক্যাথলিক, স্যালভেশন আর্মি, মেথডিস্ট আরও কত কি সব প্রতিষ্ঠান, দো-আঁশলা ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা করার জন্য এরা সরকারী সাহায্য পায়।

এন'গুলার খোঁজে গোয়েলনিট সব জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলো। কিন্তু কেউ তাকে এন'গুলার সম্বন্ধে কিছু বলতে পারলো না। কোথাও তার দেখা মিললো না।

মেরির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব জেগেছে তাই নিয়ে মনের মধ্যে যেন তার ঝড় বইছিলো। বুড়ো কি তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে মেরিকে যা দেখাতে চাইছে, যা অনুভব করাতে চাইছে, মেরি কি তাই দেখছে, তাই অনুভব করছে? না কি এটাই সত্য যেমেরি নিজেই হচ্ছে 'নেটিভ ক্যাম্পের' অন্যান্য বাচ্চাদের উপহাস করে ডাকা সেই 'ছোট হলদী'? সেটা যদি সত্যও হয়, মেরি নিজে কখনোই সে কথা স্বীকার করবে না, নিজেকে বললো সে। বুড়ো লোকটির জন্য সে দুঃখিত ; কিন্তু যতই হোক মেরি তো আধা-সাদা। ও লোকটিতো ওর বাপ নয় ; ওর বাপ তো সাদা চামড়ার লোক।

মেরির সম্বন্ধে ওদের পল্লীর লোকেরা বলে ও নাকি 'সাদা চামড়াদের পা চাটা'। কিন্তু সে কারো পা চাটে না, মেরি ক্ষুব্ধভাবে নিজেকে বলছিল ; ওদেরও না, সাদা চামড়াদেরও না।

ওর সহানুভূতি তো কালো লোকদের প্রতি। স্কুলে সে তো কত কবিতা, কত স্তোত্র শিখেছে, কিন্তু তার কোনটাই তাকে তেমন করে বিচলিত করে না যেমন করে অন্ধ নেলির মুখে শোনা গানগুলো, কিংবা তাদের পল্লীর আদিবাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে শোনা কোরোবোরীর (উপজাতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান) গান আর গল্পের টুকরোগুলো।

অথচ এতদিন ধরে সে সংগ্রাম করে এসেছে সাদা চামড়াদের মেয়েদের মত সত্যিকারের একটা বাড়িতে থাকবার অধিকার অর্জনের জন্য, একজন ভদ্র, সভ্য মানুষ হিসাবে পরিচিত হবার অধিকার অর্জনের জন্য, এখন সেই সংগ্রাম ছেড়ে দিয়ে সে চলে যেতে পারে না। এ সংগ্রাম তাকে স্বাধীন হতে শিখিয়েছে, অনমনীয় হতে শিখিয়েছে। এর ফল অবশ্য, এ পর্যন্ত কিছুই মেলেনি। এমন কি তার নিজের ক্ষুদ্র ভূমির ওপর নতুন একটা বাড়ি বানাবার অনুমতি টুকুও মেলেনি। বুড়ো লোকটিকে সে যদি তাকে মেয়ে বলে ডাকতে দেয়, বুড়ো লোকটিকে সে যদি তার নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় তার সঙ্গে বাস করার জন্য, তাহলে সে অনুমতি যে তার আর কখনোই মিলবে না সে সম্বন্ধে মেরি একেবারে নিশ্চিত।

গোয়েলনিটের গলার স্বর আবার তার মনযোগ আকৃষ্ট করলো, একাগ্র মনে সে শুনতে লাগলো।

এন'গুলার খোঁজে বুড়ো লোকটি গেলো উত্তরে, গেলো পূর্বে ; গেলো চার পাশের সাদা চামড়ার লোকেদের গড়া শহর আর শহরতলিগুলোয়।

সোনা সন্ধানীদের শিবিরে শিবিরে, প্রান্তে জন বিরল জায়গায় জায়গায়, আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত অঞ্চলে অঞ্চলে, উপকূলের ধারের বন্দরে বন্দরে সে এন'গুলার খবরের জন্য ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। অনেক অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও কেউ তাকে কোনো খবর দিতে পারেনি।

পঁচিশ বছর ধরে সে ঘুরে বেড়িয়েছে এখানে সেখানে, সারা দেশময়, এন'গুলার সন্ধানে, তার নাম ধরে ডেকে ডেকে। এখন সে বুড়ো হয়ে গেছে ; এর থেকে দূরে আর সে যেতে পারবেনা। আদিবাসীদের এই পল্লী — যেখানে এক সময় দক্ষিণ পশ্চিমের উপজাতীয় গোষ্ঠীদের কোরোবোরীর স্থান ছিল, তার আশঙ্কা এখানেই হয়তো তার যাত্রা শেষ হবে।

"এখানে যদি কেউ এন'গুলাকে না দেখে থাকে বা তার কথা না শুনে থাকে," সে বললো ক্লান্তি ও হতাশার অতল তল থেকে, "তাহলে আমি আমার গোষ্ঠীর বুজেরায় ফিরে যাবো, আমার পূর্ব পুরুষদের আত্মা কখন আমায় নিয়ে যেতে আসে তারই অপেক্ষায় বসে থাকবো।"

বলার কথা সব ফুরিয়ে গেলে বুড়ো লোকটি আগুনের ধার থেকে সরে বসলো। জ্বলন্ত অঙ্গারের আভা গিয়ে পড়লো তার রেখাপড়া তামাটে মুখের ওপর।

মেরির দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলাতে অনিচ্ছুক চোখদুটো তার মেরিকে এড়িয়ে দূরে নিবদ্ধ হলো। সে যে মেরির কি করলো — তার মনের ওপর থেকে একটা আবরণ সরিযে নিযে তার মনে সাদা চামড়ার মেয়েদের মত করে থাকবার ইচ্ছা আর কালো-মানুষদের ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিলো — সেটা সে উপলব্ধি করেছে কিনা তার হাবভাব দেখে তা বোঝা গেলো না।

তবে মেরি এটা বুঝতে পারছিল, তার সঙ্গে বুড়োর, এবং বুড়োর অভীষ্টের মিলন ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় কথাটা অনুক্ত রেখেই মেরির চলে যাবার ইচ্ছা সম্বন্ধে বুড়ো সচেতন।

তাদের দু'জনের মধ্যে নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো : সে নীরবতা দুর্বহ, দুর্বিষহ।

মেরিই সে নীরবতা ভাঙলো।

"তোমার আর দূরে যাবার দরকার হবে না 'মুমেই (বাবা)' সে বললো। 'আমিই এন'গুলা।'

Katharine Susannah Prichard এর 'N'gola' গল্পের ছায়াবলম্বনে।

রোডেসিয়া থেকে ট্রেন

নাডাইন গর্ডিমার

[সামাজিক বৈষম্য, বিশেষ করে বর্ণবৈষম্যের ওপর লিখিত তাঁব গল্পগুলির জন্য সুবিদিত লেখিকা নাডাইন গর্ডিমারের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকাব এক শ্বেতাঙ্গ পবিবাবে। পঞ্চাশ দশকে যখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে তাঁর জোরালো গল্পগুলি লিখতে আরম্ভ করেন তখন ওটা ঠিক ফ্যাশানও ছিল না বা শ্বেতাঙ্গ শাসনের অবিচাবগুলোর কথা প্রকট কবা যুক্তিযুক্তও ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যন্ত সাহসেব এবং আত্মবিশ্বাসেব সঙ্গে তিনি তা ব্যক্ত কবে গেছেন। অগণিত ছোটগল্প ছাডা বেশ কযেকটি উপন্যাসও তিনি লিখেছেন। ১৯৯১ সালে সাহিত্যেব জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওযা হয।]

রক্তিম দিগন্তেব মধ্যে থেকে ট্রেনটা বেরিযে এসে একক সিধা রেল লাইন ধবে সবেগে তাদেব দিকে নেমে এলো। স্টেশন মাস্টার তাব ছুঁচোলো শালে (chalet) ছাতওয়ালা ইঁটেব তৈরি ছোট্ট স্টেশন থেকে বেবিযে এলো, তার সার্জেব তৈবি ইউনিফর্মের পায়ের ভাঁজগুলো মসৃণ কবতে করতে। ধুলোব উপর উবু হযে বসা অপেক্ষমান নেটিভ ফিরিওয়ালাদেব মধ্যে দিযে প্রস্তুতির একটা শিহরণ বযে গেলো, একটা থলির ভেতর থেকে সদা বিস্মিত একটা কাঠের জন্তুব মুখ বেরিয়েছিল। স্টেশন মাস্টারের নগ্নপদ ছেলেমেযেরা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরতে ঘুবতে এসে হাজির হলো। কারুকার্য করা মাটির একটা দেওয়ালের মধ্যেকার অবিন্যস্ত মাথাওযালা ধূসর রঙের মাটির কুঁড়েঘরগুলো থেকে মুরগির পাল আর তাদের হাড়ের ওপর চামড়া ভুর্জপত্রের মতো টান করে টানা কুকুরগুলো বেরিয়ে এসে বেল লাইন ধবে পিকানিনদের (Piccanins — আফ্রিকান শিশুবা) পিছু পিছু চললো। বক্তিমাভ ঘর্মাক্ত পশ্চিম ক্ষীণ, নিরুত্তাপ একটা ছাযা ফেললো স্টেশনের 'মালপত্র' লেখা টিনেব চালার ওপর, দেওয়াল ঘেরা ক্রালের (Kraal — বেড়া ঘেরা দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রাম) ওপর, স্টেশন মাস্টারের ধূসর রঙের টিনের বাড়ির ওপর আর বালির ওপর — যে বালি চারিদিক পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে, আকাশ থেকে আকাশ পর্যন্ত, ছোট ছোট সব ছায়ার ছন্দভরা পাত্র গড়লো, যাতে করে বালি হয়ে গেলো সমুদ্র, আব বাচ্চাদের কালো কালো পাগুলো আলতোভাবে ঢেকে দিলো কোনো চিহ্ন ছাড়াই।

স্টেশন মাস্টারের স্ত্রী বসেছিল তার বারান্দার জালের আড়ালে। তার মাথার ওপর

ভেড়ার মাংসের একটা চাঁই বাতাসের একটা প্রবাহে দুলতে দুলতে একটু খানি নড়লো। তারা প্রতীক্ষা করছিল।

ট্রেনটা ডাক দিলো, আকাশ জুড়ে ; কিন্তু কোনো সাড়া মিললো না ; ডাকটা শূন্যে ভেসে রইল : আমি আসছি ··· আমি আসছি।

ইঞ্জিনটা এখন বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়লো, বেগে আসছিল পিছনে একটা ক্রমহ্রাসমান দেহ নিয়ে ; ইঞ্জিনটাকে ঢুকতে দেবার জন্য রেল লাইনটা ছড়িয়ে গেলো।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে, ঝাঁকি দিতে দিতে, ধাক্কা মারতে মারতে হাঁফাতে হাঁফাতে ট্রেনটা স্টেশন ভরতি করে দিলো।

এই যে শোনো একবার, ওটা একটু আমায় দেখাও তো — যুবতীটি তার দেহটাকে বাঁকিয়ে করিডোরের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে আরও খানিকটা বার করে দিলো। মিসাস (Missus)? তার হাতে ধরা জন্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে বুড়ো লোকটি হাসলো। তার ধুসর রঙের আঙুলে আটকানো এক টুকরো সুতো থেকে একটা টুকরি ঝুলছিল' প্রশ্ন কবে সে ওটা টেনে তুললো। না, না যুবতীটি জোর দিয়ে বললো, তার দিকে ঝুঁকে পড়ে, ট্রেনের উচ্চতার ওপর থেকে কম্বলের টুকরো পরা লোকটির দিকে ; ঐ যে, ঐটা, ঐটা, যুবতীর হাতটা দাবি করলো। ওটা ছিল একটা সিংহ, স্পঞ্জ কেকের মতো দেখতে নরম শুকনো কাঠে খোদাই করে বানানো, হেরালডিক (heraldic — কুলচিহ্নসূচক), সাদা আর কালো, ইমপ্রেসানিস্টিক পদ্ধতিতে (Impressionistic), ছোটোখাটো অলঙ্কারগুলো, গরম লোহার ছেঁকা দিয়ে দাগানো। তখনও মন থেকে নয় খদ্দেরের জন্য কাষ্ঠহাসি হেসে বুড়ো লোকটি সিংহটা যুবতীটির দিকে তুলে ধরলো। শ্রবণের অতীত এক অতি ভয়ঙ্কর অন্তহীন গর্জনে খোলা মুখের ভেতর ভানডাইক (Vandyke) দাঁতগুলোব মাঝখানে ছিল কালো একটা জিভ। শোনো, অল্পবয়সী স্বামীটি বলেছিল কিছু যদি মনে না করো। সিংহটার ঘাড়ে জড়ানো একটুকরো লোমওয়ালা চামড়া (ইঁদুরের, খড়গোশের, মীরক্যাটের ?) ; একটা সত্যিকারের কেশর, মহিমাময়, একভাবে জানান দিচ্ছিল সিংহের মধ্যে শিল্পী পরম আনন্দ পেয়েছে।

ট্রেনের সারাটা দৈর্ঘ্য জুড়ে এখানে ওখানে ধুলোর মধ্যে শিল্পীরা সব লাফাচ্ছিল, খেলা দেখানো জন্তুদের মতো নিচু হয়ে হাঁটছিল, ট্রেনের ওপরের মুখগুলোর দিকে ধরা অপরূপ সৃষ্টিগুলো ভালো করে দেখবার জন্য। সচকিত আর আড়ষ্ট হরিণ গোলগোল সাদা আর কালো চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরও সিংহ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, জড়াজড়ি করে লড়ছে, অদ্ভুত শীর্ণ, লম্বাটে যোদ্ধাদের সঙ্গে যারা বল্লম ধরে আছে আর তাদের চেরা চোখগুলো ভয়হীন। ট্রেন থেকে ওরা জিজ্ঞাসা করছিল ? দাম কত ? কত দাম ?

আমাকে একটা পেনি দাও—বলছিল ক্ষুদেরা, তাদের বেচবার কিছু ছিল না। কুকুরগুলো গিয়ে অনড় হয়ে বসেছিল ডাইনিংকারের নিচেয়, ট্রেন যেখানে পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধা মাংসের গন্ধমাখা নিশ্বাস ছড়াচ্ছিল।

পলকহীন কাঠের চোখগুলো, শূন্যে তোলা,কাঠের শক্ত শক্ত পাগুলোর বাবদে পয়সা বিনিময় করার জন্য প্রসারিত ধূসর কালো আর সাদা হাতগুলোর তোরণের তলা দিয়ে একটি লোক চলে গেলো, কলরোল আর দর কষাকষির নিচে দিয়ে এগিয়ে চললো চাকাগুলোকে প্রশ্ন করতে করতে। কুকুরদের পার হয়ে, ডাইনিংকারের দিকে এক ঝলক দৃষ্টিপাত করে, সেখানে সে তাকিয়ে থাকতে পারবে কাঁচের ও পাশের মুখগুলোর দিকে, বিবর্ণ মরা ফুল দেওয়া রেলের একই রকমের ফুলদানির দুধারে জোড়ায় জোড়ায় বসে বীয়ার পানে রত। একেবারে সেই শেষ পর্যন্ত, গার্ডের গাড়ি পর্যন্ত যেখানে স্টেশন মাস্টারের ছেলে-মেয়েরা তাদের মাযের জন্য সদ্য দুখানা পাঁউরুটি যোগাড় করেছে ; খোদ ইঞ্জিন পর্যন্ত, যেখানে স্টেশন মাস্টার আর ড্রাইভার বিশ্রামরত জন্তুর ধুমায়িত অভিযোগের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

লোকটি তাদের ডেকে কি বললো, একটা কিছু অমার্জিত আর কৌতুকবহ। ধোঁওযার একটা আবর্তের মধ্যে তারা ঘুরে দাঁড়ালো হাসবার জন্য। দুটি শিশু রুটি আঁকড়ে ধরে বালির ওপর দিয়ে দৌড়ে গেলো, লোহার গেটের মধ্যে দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে — বাগানে — যেখানে কোনো কিছু জন্মায় না, তারই মাঝখানের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো।

যাত্রীরা করিডোরের জানলা থেকে সরে এসে কামরায় ঢুকলো, পয়সা আনতে, অন্য কাউকে ডাকতে এসে দেখবার জন্য। ভেতরে যারা বসেছিল তারা চোখ তুলে তাকালো ; হঠাৎ ভিন্নরূপ, পিঞ্জরাবদ্ধ মুখগুলো, বাক্সবন্ধ বাইরেব সঙ্গে যোগাযোগের পর বিচ্ছিন্ন। কমলা একটা রয়েছে একজন পিকানিন পেলে খুশি হবে .... সেই চকোলেটের কি হবে ? খুব ভালো ছিল না ওগুলো .....।

বাচ্চা একটা মেয়ে চকোলেটের বাক্স থেকে একমুঠো শক্ত ধরনের, যা কারও ভালো লাগেনি, তুলে নিলো তারপর ডাইনিংকারের কাছের কুকুরগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিতে লাগলো। কিন্তু আশ্চর্যরকম ক্ষিপ্র আর অব্যর্থভাবে এমন কি সেগুলো ধুলোর ওপর পড়ার আগেই, মুরগীগুলো ছুটে এসে চকোলেটগুলো গিলে খেয়ে ফেললো, আর কুকুরগুলো হতভম্ব হয়ে, কিছুর প্রত্যাশা না করেই বাদামী বাদামী চোখ তুলে তাকালো।

না, থাকগে, যুবতীটি বললো, ওটা নিতে হবে না ....। বড্ড বেশি দাম বড্ড বেশি, সে মাথা নেড়ে গলা চড়িয়ে বুড়ো লোকটিকে বললো সিংহটা তাকে ফিরিয়ে দিতে বুড়ো ওটা উঁচু করে ধরে রইলো যুবতীটি যেখানে তার হাতে দিয়েছিল সেখানেই। না, মাথা নেড়ে যুবতীটি বললো। তিন শিলিং ছ' পেনি ? যুবতীটির স্বামী উঁচুগলায় জোর দিয়ে বললো। হ্যাঁ বাস ! বুড়ো সশব্দে হেসে উঠলো। তিন শিলিং ছ'পেনি ? — যুবকটির বিশ্বাস হচ্ছিল না।

যাকগে, ছেড়ে দাও।

— যুবতীটি বলেছিল। যুবকটি থেমে গেলো। তুমি ওটা চাওনা ? যুবকটি বললো বুড়োর কাছে তার মুখের ভাব গোপন করে। না, যেতে দাও — যুবতীটি বললো,

থাকগে। সিংহটা হাতে ধরে বুড়ো নেটিভটি একদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে, আড়চোখে তাদের দিকে তাকিয়েছিল। তিন শিলিং ছ' পেনি, সে বিড়বিড় করে বলছিল বুড়ো মানুষরা যেমন করে থাকে নিজের মনেই এক কথার পুনরাবৃত্তি করে।

যুবতীটি মাথা ভিতরে ঢুকিয়ে নিলো। কুপের (Coupe) মধ্যে গিয়ে বসে পড়লো। অপরদিকে, জানলার বাইরে কিছুই ছিল না, বালি আর ঝোপঝাড়, একটা কাঁটা গাছ। খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে তার স্বামীকে পেরিয়ে, ঐখানে হলো স্টেশন, কলরোল, কাঠের জন্তুগুলোর সঞ্চলন, ধাবমান পা গুলো। তার চোখ দুটো অনুসরণ করছিল স্টেশনের শালে (chalet) ছাতের ধাবিতে লাগানো কুণ্ডলী পাকানো কাঠের হাস্যকর ঝালর, সিংহটার কথা মনে করে তার হাসি পেলো। ঘাড়ের লাগানো লোমশ চামড়ার ঐ টুকরোটা। কিন্তু কাঠের হরিণ, জল-হস্তীগুলো হাতীগুলো আর ঝুড়িগুলো ইতিমধ্যেই তাদের ব্রাউন কাগজের মোড়ক থেকে টেনে বার করে এনে রাখা হয়েছে সীটের নিচেয় নয়তো লাগেজ রাখার তাকের ওপর। বাড়িতে তাদের কেমন দেখাবে? ওদের তুমি রাখবে কোথায়? যে জায়গাগুলোয় ওদের তুমি খুঁজে পেলে সেগুলোর থেকে দূরে ওদের তাৎপর্য কি হবে? গত কয়েকটা সপ্তাহেব অবাস্তবতার থেকে দূরে? বাইরের ঐ যুবকটি। কিন্তু ও তো অবাস্তবতার অংশ নয়, ও তো এখন চিরতরের। অদ্ভুত .... কোথায় যেন একটা ধারণা জন্মেছিল — যে ও ওর সঙ্গে থাকাটা ছুটিরই একটা অংশ, অজানা জায়গাগুলোরই একটা অংশ।

বাইরে একটা ঘণ্টা বেজে উঠলো। স্টেশন মাস্টার ট্রেনের শেষ প্রান্তে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সবুজ ফ্লাগ পাকিয়ে প্রস্তুত হয়ে। কয়েকজন লোক, পা ছড়াতে যারা নেমেছিল, লাফিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েছিল, অবজারভেশন (Observation) প্ল্যাটফর্মগুলো আঁকড়ে ধরে, নয়তো শুধুই রেলিং ধরে লোহার পাদানিতে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ট্রেনেরই ওপর — একটা ধুলোভর্তি স্টেশন, একটা টিনের বাড়ি, ধূ ধূ বালি থেকে নিরাপদে।

ঘ্যাচাং করে একটা শব্দ হলো। ট্রেন হ্যাঁচকা একটা টান মারলো, একটা ঝাঁকি দিলো। কাঁচের মধ্যে দিয়ে বীয়ারপায়ীরা বাইরের দিকে তাকালো, যেন তারা বাইরে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিল স্টেশন মাস্টারেব স্ত্রী মাছি আটকাবার জালের পিছনে, কালো হয়ে আসা মাংসের তলায়।

একটা চিৎকার উঠলো। ফ্ল্যাগ ঝুঁকে পড়লো। জোর গুলোর এখনও সমন্বয় ঘটেনি, ট্রেনের ভাগ ভাগ করা দেহটা টান দিলো আর নিজেরই দেহের সঙ্গে ধাক্কা খেলো। ট্রেনটা চলতে শুরু করলো, ধীরে ধীরে কুণ্ডলী পাকানো শালে (Chalet) ওকে পার হয়ে গেলো, পাশে পাশে ধাবমান নেটিভদের চিৎকার বাতাসে উৎসারিত হলো, বিভিন্ন স্তরে তারা পিছনে পড়ে গেলো। তাকিয়ে থাকা কাঠের মুখগুলো ঐখানে মাতালের মতো টলতে লাগলো, তারপর জানলাগুলোতে শেষবারের মতো প্রশ্ন করে চলে গেলো। এই যে এক শিলিং ছ'পেনি, বাস (Bass)! ছুঁড়ে দেওয়া একটা বল ধরার জন্য লোকে যেমন যন্ত্রবৎ হাতের মুঠো খোলে, একটি লোক

তেমনি পাগলের মতো তার পকেট হাতড়ে এক শিলিং আর ছ'পেনি বার করে ছুঁড়ে দিলো, বুড়ো নেটিভ, তার পায়ের শীর্ণ আঙুলগুলো দিয়ে বালি ছিটিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে সিংহটা ছুঁড়ে দিলো।

পিকানিনরা হাত নাড়ছিল কুকুরগুলো দাঁড়িয়েছিল, তাদের লেজগুলো অনিশ্চিত ট্রেনের যাত্রা লক্ষ্য করছিল : মাটির কুঁড়েঘরগুলো পেরিয়ে, সেখানে চুল্লীর ধোঁওয়ার ওপর থেকে চোখ তুলে দেখবার জন্য এক মহিলা, হাতটা তার কোমরের ওপর রেখে ঘুরে দাঁড়ালো।

স্টেশনমাস্টার ধীবে ধীরে তার শালের (chalet) মধ্যে চলে গেলো।

বুড়ো নেটিভ দাঁড়িয়ে রইলো শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে তার পাঁজরাগুলোর মাঝখানের চামড়া সব ফুলে উঠছিল, পাগুলো টানটান করে বালির ওপর নিজের ভারসাম্য বজায় রেখে, হাসিমুখে মাথা নাড়তে নাড়তে গ্রহণ করার ভঙ্গিতে তাব খোলা হাতের তেলোয়, ছিল পুনরুদ্ধার করা এক শিলিং আর ছ'পেনি।

ট্রেনের দৃষ্টিহীন শেষ প্রান্তটাকে অসহায়ের মতো টেনে বার করে নিয়ে যাওযা হলো।

যুবকটি করিডোর থেকে সবেগে ঘুরে ভেতরে এলো, রুদ্ধশ্বাস হয়ে। অট্টহাসি আর বিজয় গৌরবে সে মাথা নাড়ছিল। এই নাও। সে বলছিল। আর যুবতীটির সামনে সিংহটাকে নেড়েছিল। এক শিলিং ছ'পেনি!!

কিং বললে? যুবতীটি বলেছিল।

যুবকটি সশব্দে হেসে উঠেছিল। ওর সঙ্গে আমি রগড় করার জন্য তর্ক করছিলাম, দর কষছিলাম — ট্রেন তখন চলতে শুরু করে দিযেছে। পিছন পিছন ও ছুটে আসছিল ····· এক শিলিং ছ'পেনি বাস (Bass)! অতএব ঐ নাও তোমার সিংহ।

যুবতীটি ওটাকে একটু তফাতে ধরেছিল, হাঁ করা মুখটা, ছুঁচোলো দাঁতগুলো, কালো জিব, যুবতীটির সামনে লোমশ চামড়ার চমৎকার গলাবন্ধ। ওটার দিকে সে এমনভাবে তাকিয়েছিল, যেন ওটা সে দেখতেই পাচ্ছে না, সম্পূর্ণ আলাদা একটা কিছু দেখছে। বিরাগে মুখটা তার সঙ্কুচিত হযে গিযেছিল, অপ্রসন্ন একটা শিশুর মুখের মতো। উত্তেজনায় তার ঠোঁটের কোণটা উঠে গিয়েছিল। খুব ধীর ধীরে সন্তর্পণে সে তার আঙুল তুলে কেশরটা স্পর্শ করলো, কাঠের সঙ্গে সেটা যেখানে জোড়া দেওয়া হয়েছে।

কি করে পারলে তুমি, সে বলেছিল। যুবকটি তার মুখে স্তম্ভিত বিস্ময়ের ভাব দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

আরে, আরে—সে বলেছিল, হলো কি?

জিনিসটা যদি তুমি নিতেই চেয়েছিলে, যুবতীটি বললো, রাগের নিষ্ফলতায় তার কণ্ঠস্বর চড়ে যাচ্ছিল, ভেঙে যাচ্ছিল—গোড়াতেই কেন তুমি ওটা কিনলে না? আর যদি তুমি ওটা চেয়েইছিলে তবে তার জন্য দামটা দাওনি কেন? যখন সে দিতে

চেয়েছিল তখন ভালোভাবে কেন নিলে না ওটা? ওটা নিয়ে ট্রেনের পিছন পিছন ওর ছুটে আসা পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করে রইলে আর ওকে এক শিলিং ছ'পেনি মাত্র দিলে? এক শিলিং ছ পেনি!

ওটা সে যুবকটির দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল, যাতে করে যুবকটি সিংহটা নিতে বাধ্য হয তার চেষ্টা করছিল। যুবকটি অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হাতদুটো দু'পাশে ঝুলিয়ে।

—কিন্তু, তুমি তো ওটা চেয়েছিলে। ওটা তোমার অত ভালো লেগেছিল?

— সুন্দর হাতের কাজ, যুবতীটি প্রচণ্ডভাবে বলেছিল, ওটাকে যেন সে রক্ষা কবতে চায় যুবকটির কাছ থেকে।

—তোমার অত ভালো লেগেছিল! তুমি নিজেই তো বললে বড্ড বেশি দাম—

তুমি সত্যি —যুবতীটি বলেছিল হতাশভাবে ক্রুদ্ধ হযে। তুমি .... সে সিংহটাকে সীটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। যুবকটি তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুবতীটি আবার কোণায বসে পড়লো, হাতের ওপব মুখ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার মনেব মধ্যে সবকিছু ঘুরপাক খাচ্ছিল। এক শিলিং ছ'পেনি। এক শিলিং ছ'পেনি। এক শিলিং ছ'পেনি কাঠের জন্য, খোদাইয়ের জন্য আর পায়ের পেশিগুলোর জন্য আর লেজের ডগাটার জন্য। মুখটা অমনভাবে খোলা আর দাঁতগুলো। কালো জিবটা দুলছে, ঢেউয়ের মতো। ঘাড়টা ঘিরে কেশর। তার জন্য মাত্র এক শিলিং ছ'পেনি দেওয়া হলো। লজ্জায় তার পা থেকে আরম্ভ করে সর্বাঙ্গ তেতে উঠলো, মনে হলো তার কানের মধ্যে সে যেন বালি ঢালার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ঢালতে তো ঢালছেই। ওখানেই বসে রইলো, সে তার গা গোলাচ্ছিল। একটা ক্লান্তি, একটা বিষাদের ভাব, একটা অতৃপ্তিবোধ উপলব্ধি করে তাব হাতের মুঠি আলগা করে দিলো, শূন্যভাবে আড়ষ্ট হযে গেলো যেন সময়টা আঁকড়ে ধরে রাখার যোগ্য নয। আবার তার এই অনুভূতি হচ্ছিল। সে ভেবেছিল এটা তার একাকীত্বেব সঙ্গে জড়িত একটা কিছু, একা থাকাব আর নিজেই নিজের কাছে বাঁধা পড়ার মতো।

সে ওখানেই বসে রইলো, নড়াচড়া করতে, কিংবা কথা বলতে কিংবা কোনো কিছুব দিকে তাকাতে পর্যন্ত চাইছিল না। সাময়িক এই মনেব অবস্থা যেন কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িত না হয়ে যায়, পুনরুদয় ঘটতে পারে আব এই অনুভূতিকে আবার ডেকে আনতে পারে এমন কোনো বস্তু নয়, কোনো কথা বা দৃশ্য নয় ...। ধুলোভবা কালি ঝুল উড়ে এসে তার হাত দুটোর ওপর পড়লো। ওর পিঠটা রইলো সেই একই ভঙ্গিতে — ছড়ানো পা দু'খানার মাঝখানে হাত দু'খানা ঝুলিযে বসে থাকা যুবকটির দিকে পিছন ফিরে, আর সিংহটা পড়ে রইলো এক কোণায কাত হয়ে।

ট্রেনটা একটা খোলশের মতো স্টেশনটাকে ছেড়ে চলে গেছে। আকাশে ডাক দিয়েছে, আমি আসছি, আমি—আবারও কোনো সাড়া মেলেনি।

(Nadine Gordimer লিখিত A Train from Rhodesia গল্পের ছায়াবলম্বনে।)

হায়রে কপাল

নাডাইন গর্ডিমার

সারার পা দুখানা অচল হয়ে পড়ার আগে সে আমাদের কাছেই কাজ করতো। খুবই মোটা ছিল সে আর তাব গায়ের রঙ ছিল হালকা হলদেটে-বাদামী, যেন একটা বেলুনের মতো, বেলুন ফোলালে যেমন রঙটা তার হালকা হয়ে যায়, পিগমেন্টের (প্রাণী ও উদ্ভিদের তন্তুরঞ্জক পদার্থ বিশেষ) পাতলা স্তরের নিচের মেদ বৃদ্ধি হলে সেটা টানটান হয়ে আরও বেশি পাতলাভাবে ছড়িয়ে যায়। গিল্টি করা ছোট্ট সরু ফ্রেমের চশমা পরতো সে আর ভালো রাঁধুনী ছিল, মাখনের ব্যাপারে শুধু যা তার হাতটা ছিল দরাজ।

তার সম্বন্ধে এই সব জিনিসগুলোই আমরা লক্ষ্য করেছিলাম।

কিন্তু এর ওপর তার ছিল একটি মাত্র স্বামী, আইনসম্মতভাবে তাব সঙ্গে গীর্জায বিবাহিত, আর ছিল তিনটি ছেলে-মেয়ে, রবার্ট জ্যানেট আর ফেলিসিয়া, যাদের শিক্ষিত করে তোলাই ছিল তার সর্বক্ষণের চিন্তা। হেঁট হয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করার সময় সে প্রায়ই লম্বা নিঃশ্বাস ফেলতো, ভারী মানুষ যেমন করে থাকে, তখন কিন্তু সে তার ছেলেমেয়েদের কথাই চিন্তা করতো। যখন মাংসওয়ালা মাংসের সঙ্গে মেটে পাঠাতো না কিংবা সাপ্তাহিক কাচাকাচির মাঝখানে বৃষ্টি শুরু হয়ে যেত তখন সে বলতো হায়রে কপাল, যেন তার নিজের জীবনের ঝঞ্ঝাটগুলো দিয়ে বিচার করলে, সে আশাই করতে পারে না যে তাব দৈনন্দিন কাজগুলো এব থেকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। প্রথম প্রথম এই খেদোক্তির বাইবেল সুলভ ভনিতায় আমরা হাসাহাসি কবতাম, আপাতদৃষ্টিতে ওটা এত মাত্রাতিরিক্ত মনে হতো, কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। হায়রে কপাল — বলতো সে ; আর সেটা ছিল জীবন সম্বন্ধে তার মন্তব্য।

তার তিন ছেলে-মেয়ের জন্য সে চিন্তা করতো, সে চাইতো তারা যেন তাদের যথাযথ স্থান চিনে নিতে পারে ; তাদের সে শিক্ষিত করে তুলতে চাইতো, সে চাইতো ছেলের যেন উপযুক্ত একটা চাকরি হয়, সে চাইতো মেয়েরা যেন নিষ্কলুষভাবে বড় হয়ে উঠে গির্জায় গিয়ে বিয়ে করে। এই ছিল সব। সবস্থানই যে তার ছেলেমেয়েদের যথাযথ স্থান এই কথাটি চিন্তা করার পক্ষে, ইহলোকের থেকে পরলোকের ওপর চতুর ঝোঁক দেওয়া তার মিশন স্কুলের শিক্ষা, তাকে যথেষ্ট বিপদজ্জনক,বা যথেষ্ট সাহসী বা

যথেষ্টমুক্ত বা নিদেন পক্ষে এমনকি যথেষ্ট শিক্ষিত পর্যন্ত করেনি, কিন্তু সে শিক্ষা অন্তত তাকে এতটা টেনে তুলেছিল, যাতে করে তার মনে এটুকু বিশ্বাস জাগাতে পেরেছিল যে তাদের যথাযথ স্থান আছে, সাদা চামড়াদের স্থানের একটা অংশ নয় কিন্তু তাই বলে কোনোস্থানই নেই, তাও না ; তাদের নিজস্ব একটা স্থান। সে চাইতো সেটা যেন তারা পায় আর সে চাইতো তারা যেন সেই স্থানেই থাকে। এটা যে সহজ নয় সেটা বোঝার মতো নির্বিবাদী বাস্তববাদী ছিল না। কেন যে ওটা অত কঠিন সেটা প্রশ্ন করার পক্ষে সে আবার ছিল যথেষ্ট প্রাচীনপন্থী। সে বলতো এই জগত যেমন তোমাকে তেমনভাবেই এখানে বাস করতে হবে।

তার ছেলে-মেয়েদের জন্য যে সব জিনিস সে চাইতো সেগুলো শুনতে খুবই সাধারণ লাগতো ; সেগুলো কিন্তু সাধারণ ছিল না অন্তত সেগুলো যেখানে সন্ধান করতে হতো সেখানে ছিল না।

প্রথমে লোকেশানে (Location) তার এক আত্মীয়ের বাড়ি সে তার ছেলে-মেয়েদের জন্য একটা ঘর ভাড়া করেছিল। সে তাদের খাবার দিতো আর প্রতি রবিবার তাদের দেখতে যেতো, তারা যেন নিয়মিত স্কুলে যায় আর অন্ধকার হবার পর সারাটা সপ্তাহ যেন লোকেশানের মধ্যে ঘুরে না বেড়ায় এটার ওপর আত্মীয়টির নজর রাখার কথা ছিল ; সারা যেমন প্রচণ্ডভাবে শিক্ষায় বিশ্বাস-করতো তেমনি প্রচণ্ডভাবে ভয় করতো অন্ধকারের আবিলতাকে। কিন্তু অচিরেই দেখা গেলো রবার্ট তার স্কুলের দিনগুলোর বেশির ভাগই গলফের মাঠে ক্যাডির (গলফের বল-বাহক) কাজে কাটাচ্ছে (কেন, কেন, কেন! এর লজ্জায় সারা আর্তনাদ করে উঠেছিল — আর রবার্ট তার হাতের মুঠি খুলেছিল ভেতরটা একটা বিজ্ঞ বাঁদরের অপ্রাশিত ছোট্ট হাতের মতোই গোলাপী, আর সেখানে তার তেলোর উষ্ণতার ঘর্মাক্ত ছ'পেনি আর ট্রিকি * দেখা গিয়েছিল) আর ফেলিসিয়া রাত্রে অন্ধকার ধোঁয়াচ্ছন্ন রাস্তাগুলো দিয়ে চিৎকার করে অন্য ছেলে-মেয়েদের মতো ঘুরে বেড়াতো। অন্যদের পক্ষে এটা ঠিকই ছিল, তারা তো খিদমদগার আর বাচ্চাদের আয়াগিরি করবে, কিন্তু সারার বাচ্চাদের পক্ষে নয়।

তাদের সে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়েছিল।

সে সব জিনিস তাদের প্রয়োজন তার দীর্ঘ একটা তালিকা এসে গিয়েছিল, আর চলেছিল পিছনের ফটকের ওপর দিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে অন্তহীন জরুরী আলোচনা আর মন্থরগতিতে হস্তান্তরিত হচ্ছিল ভাঁজ করা গোলাপী নোট আর তামাক রাখার সুতার থলে থেকে হাফ ক্রাউন বার করে চলছিল গোনাগাথা। তাদের ওপর শুধুমাত্র ঐশ্বর্য যে ব্যয় করেনি — ঐশ্বর্য তো অর্জন করা যায় আবার হারানোও যায় — সে দিয়েছিল তার যথাসর্বস্ব, পোস্ট অফিসে রাখা তার ন'পাউন্ড, তার প্রতিমাসের মাইনে। তা সত্ত্বেও সেটা যথেষ্ট হয়নি, কারণ স্কুলটা ছিল নেটাল এ, আর বছরে সে

* দক্ষিণ আফ্রিকায় চলতি ভাষায় তিন পেনি মুদ্রাকে ট্রিকি (Trikey) বলা হোত। অধুনা এই মুদ্রাটি অপ্রচলিত।

একবার করে ট্রেনভাড়া দিতে পারতো, সেইজন্য ক্রিশমাস ছাড়া সব কিছুই তাদের কাটাতে হতো— স্কুলে বাড়ি থেকে তিনশো মাইল দূরে। কিন্তু তারা শিক্ষা তো পাচ্ছিল। আমাকে তাদেব চিঠি সে দেখাতো, সব বাচ্চাদেব চিঠির মতোই আলগোছ, আবেগহীন, সাধারণ কিছু না কিছুব চাহিদা করে লেখা। কখনও কখনও আমি লজেন্স ইত্যাদি দিতাম ওদের পাঠানোর জন্য, উত্তরে আমি মেয়েদের মধ্যে ছোট, জ্যানেটের কাছ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখা একটা চিঠি পেয়েছিলাম, ভদ্র, কিন্তু উপহাব পেয়ে খুশি হওয়ার সামান্যতম ইঙ্গিতও তার মধ্যে ছিল না। সারা সব সময় চিঠিটা পড়তে চাইতো, বুঝতাম সে দেখতে চাইছে চিঠিটা যথেষ্ট সম্মান দেখানো হয়েছে কিনা সেটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আবার যখন সে চিঠিটা ভাঁজ করতো, তখন সে তার মুখে একটা পরম স্বস্তিরভাব দেখা যেতো। হ্যাঁ, সে বলতো, এবার আমি জানি ওখানে ওদেব দেখাশোনা ঠিকমতো হচ্ছে।

ক্রিসমাসের সময় এলে তাকে বাচ্চাদের বাৎসারিক ছুটি কাটানোর জন্য লোকেশানে একটা ঘর ভাড়া করতে দিতে আমার লজ্জা হলো, আমি তাকে বললাম, সে যদি চায় তবে তাদের সে তার নিজের সঙ্গে বাগানে এনে রাখতে পাবে। তার কালো পোশাক আর ঝালর দেওয়া শাল গায়ে দিলো সে — পুরোনো ভিক্টোরিয়ার যুগের কতকগুলো চালচলন সে আঁকড়ে থাকতো — তারপর স্টেশনে চলে গেলো তাদের আনতে ; অনেক সকালেই সে যাত্রা করেছিল, তার পা আবার তাকে ভোগাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছিল না। সারাটাদিন সে বাড়ি ছিল না ; আমার একটু রাগই হয়েছিল, কিন্তু যখন দেখলাম তার তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে সে বাড়ি ফিরছে তখন তারমধ্যে একটা উৎসবের মেজাজ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমি আর কিছু বললাম না।

কিন্তু আশ্চর্যরকমের ভালো ছেলেমেয়ে ছিল ওরা। এমন ভালো ছেলেমেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি, এত চুপচাপ, তাদের চলাফেরায় এত বিনীত, খেলাধূলোয় এত সংযত। অত্যন্ত বেশি রকমের ভালো, মেয়েরা সারার ঘরের দেওয়ালের ধারে রৌদ্রে এসে বসতো, নিঃশব্দে, ছেলেটা বসতো বেড়ার গা-ঘেঁসে আগাছার মধ্যে তার কাঠিকুটো আর নুড়িপাথর নিয়ে। মেয়েরা তাদের জামাকাপড় কাচতো আর ক্রুশে করে লাল উলের টুপি বুনতো : তাদের হাসি ছিল গোপন, "বাইরে কখনও প্রকাশ পেতো না, ঝোপ-জঙ্গলের গহণে কোথায় লুকোনো এক ছোট্ট নদীর কুলকুল ধ্বনি কানে আসার মতো। তাদের স্মিত হাসি ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ আর সুন্দর কিন্তু আনুষ্ঠানিক, আনন্দের নয়। ছেলেটা একেবারেই হাসতো না। বাড়িতে আগন্তুক এক শিশুর ভুলক্রমে ফেলে যাওয়া একটা ওয়াটার পিস্তল আমি ওকে দিয়েছিলাম, পিস্তলটা ও নিয়েছিল যেন একটা প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে। ওর বাক্সে ওটা ও তুলে রেখেছে মা ঠাকুরণ, সারা গর্বিতভাবে হেসেছিল। হ্যাঁ গো, ঐ পিস্তলটা পাওয়া ওর কাছে একটা মস্তবড় জিনিস, মা ঠাকুরুণ। ও এখন ভাবছে যে ও বড় হয়ে গিয়েছে।

বাগানের বাইরে ওদের যেতে দেওয়া হতো না, ওদের মা ওদের সঙ্গে থাকতো কিংবা তার নিজের কাজে সে ওদের পাঠাতো। বাইরের দিকে তাকিয়ে ওরা ফটকের

কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো। রবার্ট একবার সারাটা সকাল উধাও হয়ে গিয়েছিল, দুপুরে খাবার সময় ফিরে এসেছিল পা ভর্তি ধুলো আর জামা-কাপড়ে ঘাসের কুচি নিয়ে। সমস্ত সকাল সারা অনুযোগ করেছিল, সে কোথায় গিয়েছে আমি জানি। আমি জানি গলফের মাঠে, আমি জানি। গলফের মাঠে গিয়েছে। সারার পা আবার তাকে ভোগাচ্ছিল, তা না হলে তাকে খুঁজতে সে সেখানেই চলে যেতো। ক্লান্ত আত্ম নিপীড়নের সঙ্গে সে ছেলেকে অনেকক্ষণ ধরে বেশ মোক্ষম ভাবেই পিটিয়েছিল, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায়। ছেলেটা কেঁদেই চলেছিল যেন মার খেয়ে নয় হতাশায়।

দিনের পর দিন সারা বাচ্চাটার পালিয়ে যাওয়ার কথা বলতো ; ঐ পালিয়ে যাওয়াটা থাকতো রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বাগানে নেমে আসবার সময় সারার ওপর ন্যস্ত ঊর্ধ্বে তোলা সাদা সাদা তিন জোড়া চোখের মধ্যে ; খেলায় রত ছোট ছেলেটার নতমস্তকে পড়া রৌদ্রের সাথে সাথে ওটা থিতু হয়ে বসতো তার ঘাড়ে।

ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে সারা বেদনাদায়কভাবে কঠোব ছিল, সারাক্ষণ তাদের উপদেশ দিত ভর্ৎসনা করতো। সামান্যতম পদস্খলনে শুরু হয়ে যেতো তার দুঃখ আর অসন্তোষের অবিরাম মর্মভেদী ছোটখাটো একটা বর্ষণ, বাচ্চাটার উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গের চারপাশ দিয়ে চুঁইয়ে পড়তো। অবিচলতা, আর যুক্তির অবিশ্রান্ত সিঞ্চনকারী অটলতার চাপে স্ফূলিঙ্গ নিভে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম আমার মনে হয় সে বোধহয় ছেলেমেয়েদের ওপর বেশি কড়া — সেটা সত্য সত্যই ঠিক তা নয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমি নিজেও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারিনি তাদের মধ্যে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে আমার ধারণাটা কি — সে এক মুহূর্ত চিন্তা কবেছিল তারপর সরল তথ্য দিয়ে সে আর্জি করেছিল, কখনও না কখনও ওদের তো এর মুখোমুখি হতে হবে, মা ঠাকুরুণ। এখন থেকে যদি শেখে তবে ওদের মন যা চাইবে তাই করতে পারবে না, পরে এই নিয়ে ওদের রাগ হবে না। ওদের শিখতেই হবে, সে বলেছিল -- এবার কঠিন হয়ে — ওদের শিখতেই হবে।

আমার ধারণা ওদের কাছে সারা অত্যন্ত বিরক্তিজনক ছিল।

ট্রেনে করে ওরা আবার এক বছরের জন্য স্কুলে ফিরে গিয়েছিল। কে জানে তাদের মনে কি হচ্ছিল। সেটা বলা অসম্ভব। শুধু মেজো জ্যানেট একটু কান্নাকাটি করেছিল। ঐ ছিল ওদের মধ্যে বুদ্ধিমান, সারা হাসিমুখে বলেছিল, ও একজন শিক্ষিকা হবে ; এখনই ও স্ট্যান্ডার্ড ফাইভে পড়ছে। যদিও দু বছরের বড়ো আর দৈহিক দিক থেকেও বেশ পরিণত এক যুবতী, ফেলিসিয়াও সেই একই ক্লাসে ছিল। তার সম্বন্ধে পরিকল্পনাগুলো ছিল আবছা, কিন্তু জ্যানেট সম্বন্ধে নিশ্চয়তার ভরসায় সাবা কখনই না হেসে থাকতে পারতো না— জ্যানেটের একটা স্থান আছে।

আমাদের বাগানে তারা ফিরে আসেনি। বছরের মধ্যেই সারার পায়ের অবস্থান ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকলো, তাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হলো। সে গিয়ে লোকেশানে থাকতে লাগলো, আর কোনো রকমে কিছু কিছু কাপড় চোপড় বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাচবার কাজ যোগাড় করেছিল। তবে, বোর্ডিং স্কুলের অবশ্যই

সমাপ্তি ঘটেছিল, শুধুমাত্র তাব স্বামীর রোজগারে লোকেশানে খাওয়ার খরচ আর ভাড়া, তা করা সম্ভব নয়। তাই ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরে এসেছিল, তাদের মায়ের সঙ্গেই থাকছিল, তার লোকেশানের স্কুলে যাচ্ছিল। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সে ব্যাকুল হয়ে, প্রচণ্ড আবেগ দেখে বুঝতে পারলাম তারা পা রাখার একটা জায়গা হারিয়েছে, কিন্তু তাদের পিছলানো পায়ের একটা প্রতিবন্ধক খুঁজছে আর তাদের শিক্ষা যদিও অত উৎকৃষ্ট ধরনের হবে না, তবু সে যে নিজে তাদের শেখাতে পারবে কোন পথে তাদের যাওয়া উচিত, এই সান্ত্বনা থেকে আরাম খুঁজছে।

আমাকে এই সব কথা বলতে বলতে সে রান্নাঘরের চেয়ারে বসেছিল ক্রেপব্যান্ডেজ জড়ানো তার থামের মতো পা দুখানা সন্তর্পণে নামিয়ে রেখে।

সে নিজে আর আসেনি। তার পায়ের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সে ছেলেমেয়েদের — প্রায়ই একলা জ্যানেটকে আমার সঙ্গে দেখা করতে পাঠাতো। তারা কখনও কিছু চাইতো না, তারা আসতো আর পিছনের বাগানে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার চোখ পড়তো তাদের ওপর, তারপর আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতো খুব মৃদুকণ্ঠে, তাদের বড়বড় চোখের দৃষ্টি আমার মুখের ওপর ন্যস্ত না করে অন্য যে কোনো জিনিসের উপর ন্যস্ত করে। হ্যাঁ, তাদের মায়ের পায়ের অবস্থা ভালো নয়। না, ঠিক আগের মতোই আছে। না, সে কাচবার জন্য কাপড় বাড়িতে আর নিয়ে যেতে পারে না। হ্যাঁ, তারা এখনও স্কুলে যাচ্ছে। আমার সর্বদাই মনে হতো তারা যেন অপ্রস্তুত বোধ করছে — আমি যে তাদের অপ্রস্তুত করছি তা নয়, তারা যেন আমার জন্য অপ্রস্তুত বোধ কবছে, তাদের মুখগুলো যেন জানে যে এইসব একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই কারণ, তাদের জীবনের প্রকৃত অবস্থা আমার অজানা, আমার কল্পনার অতীত আর সেই জন্যই আমার প্রশ্নের অতীত! সাধারণত তাদের প্রত্যেকের জন্য একটা করে কমলা থাকতো, আর থাকতো পুরানো কোনো জামা বা পুলোভার যা বাড়ির অনির্ণীত কিন্তু স্বেচ্ছাচারী মানের থেকে অজান্তে পিছলে নিচেয় পড়ে গেছে। প্রত্যেকবার যখন তারা আসতা তখন তারা — যে একটু করে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তা নয়, তবে একটু করে শিথিলতর হয়ে যাচ্ছিল, ফেলিসিয়ার জার্সিতে একটা বড় সেফটিপিন আঁটা, রবার্টের প্যান্ট রিফু না করা ছেঁড়া একটা ফুটো দিয়ে সুতো বেরিয়ে রয়েছে। এমন কি জ্যানেটও পর্যন্ত পরে আসতো ছেঁড়া খোঁড়া খাটো একটা স্কার্ট যেটা ছিল সত্যই একটা ছেঁড়াখোঁড়া খাটো স্কার্ট — ইস্ত্রি আর রিফু করা অনমনীয়ভাবে ভদ্রোচিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ন্যাকড়া আগে সে যা পরতো তা নয়। অবশ্য খাবার-দাবার, জামা-কাপড় আরও দুর্মূল্য হয়ে গিয়েছিল, তাদের অবস্থা হয়তো আরও পড়ে গিয়েছিল।

বহুদিন আর তারা আসেনি। আমি অন্যান্য নেটিভ মেয়েদের প্রশ্ন করলাম : সারা কেমন আছে? তোমাদের সঙ্গে কি সারার দেখা হয়েছে? ওরা তাকে বিশেষ পছন্দ করতো না। তারা সংক্ষেপে বলতো, জানি না। শুনেছি সে অসুস্থ, ওর পায়ের অবস্থা খারাপ।

সারার স্বামীর কাজ নেই, আমার পরিচারিকা একদিন মন্তব্য করেছিল রান্নাঘরের টেবিলটা ঘসেমেজে পরিষ্কার করতে করতে। কাজ নেই, সে কথা কি কথা? আমি বলেছিলাম — তাহলে ওদের চলছে কি করে? সারার পায়ের অবস্থা খারাপ, সে কাজ করতে পারছে না, ক্যারো লাইন বলেছিল ঔদাসীন্য দেখিয়ে। আমি জানি, আমি বলেছিলাম, কিন্তু ওদের পেট তো চালাতে হবে। বাচ্চা ছেলেটা কাজ করছে, ক্যারোলাইন মন্তব্য করেছিল। পিছনের ঐ ডেয়ারীতে ও কাজ করছে। তার কথার মর্ম হলো ছেলেটা হ্যাডলির রুম পরিষ্কার করে, ঘর ধোয়।

আমি তাকে বলেছিলাম এবার যখন সে লোকেশানে যাবে তখন যেন সারার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে, তাকে আমি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি কি না — সেটা যেন জেনে আসে। সে ফিরে এসে বলেছিল সারার স্বামী আর একটা কাজ পেয়েছে: আগের কাজটার পক্ষে তার বয়সটা অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল। এখন সে একটা ছোটখাটো কাজ পেয়েছে। সারাকে সাহায্য করার জন্য আমি কি কিছু করতে পারি? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম — তুমি কি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে? ক্যারোলাইন আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ছিল। ওর স্বামী আর একটা কাজ পেয়েছে, সে ধৈর্য সহকারে বললো, যেন কোনো কথা একবার বললে সেটা বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই।

এক মঙ্গলবার সকালে ক্যারোলাইন পিছনের বারান্দায় তার ইস্ত্রি করার কাজ ছেড়ে এসে আমায় বলেছিল — সারার মেয়ে এসেছে বাগানে — সঙ্গে সঙ্গে সে আবার তার ইস্ত্রি করার কাজে ফিরে গিয়েছিল।

একটা মরিচগাছের নিচেয় জ্যানেট দাঁড়িয়েছিল, আস্তে আস্তে তার নগ্ন পাটা পাথরের উপর দোমড়াচ্ছিল, তার দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল সে নিশ্চয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। যে পর্যন্ত না ক্যারোলাইন তাকে দেখতে পেয়েছে। এবার সে বললো, সুপ্রভাত, মা ঠাকুরুণ, তারপর পাযের দিকে তাকাতে তাকাতে অনিচ্ছার সঙ্গে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এলো। এখন আর সে বাচ্চা একটা মেয়ে নয়! ছেলেবেলাকার সুগোল পেট এখন কটির বক্ররেখার সমান হয়ে গিয়েছিল, আর একটা খুবই খাটো, আঁটসাঁট জার্সি তার কম্পমান নবোদ্গত বুক দুটো উপর দিকে তুলে ধরেছিল। জার্সিটা ময়লা, কনুইয়ের কাছে ছেঁড়া। তার ছোট্ট কান দুটিতে একটা করে চকচকে গোলাপী কাঁচের টুকরো দেওয়া পিতলের দুল। ঘাড় কাত করে সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। জ্যানেট, আমি শুনলাম তোমাদের অনেক ঝামেলা গেছে, এখন আমাকে একজন শিশুর সঙ্গে কথা বলতে হবে না এই কথা মনে করে আমি বলেছিলাম।

হ্যাঁ, মা ঠাকুরুণ, সে বলেছিল, খুবই মৃদুকণ্ঠে, কণ্ঠস্বর এখনও এক শিশুরই ছিল।

তোমার বাবার চাকরি গেছে? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

হ্যাঁ, মা ঠাকুরুণ, সে বলেছিল, সারার মতো ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে। বেশ

ঝামেলা হয়েছিল। আর রবার্ট কাজ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ডেয়ারীতে, সে বলেছিল। আব নিজের পায়ের দিকে তাকিয়েছিল। ফেলিসিয়া কি কোথাও একটা কাজ করতে পারে না। তার মেয়ের বাচ্চার কাজ করার ব্যাপারে সারার ভীতির কথা মনে পড়ায় আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম।

সে তো চলে গেছে মা ঠাকুরুণ, মেয়েটি ক্ষীণস্বরে বলেছিল।

সে কি করেছে? ভালো করে শোনার জন্য আমি ভ্রূকুঞ্চিত করলাম। সে তো বেলায়েসফনটেন-এ চলে গেছে মা ঠাকুরুণ। সে এত ক্ষীণস্বরে বললো, যে আমি কথাটা প্রায় ধরতেই পারলাম না। তাব তো বিয়ে হয়ে গেছে, মা ঠাকরুণ।

বটে, তাহলে ভালোই হয়েছে। তাহলে তো খুবই ভালো হয়েছে, তাই না। আমি হাসলাম। তোমার মা নিশ্চয়ই খুবই খুশি হয়েছেন?

সে নীরব হয়ে রইলো।

তাহলে জ্যানেট, তুমি একাই এখন বাড়িতে আছো? এখনও স্কুলে যাচ্ছো তো? এখনও কি শিক্ষিকা হতে চাও এ্যাঁ? আমি নিশ্চিত ছিলাম এবার সে হাসবে চড়াবে তার গলার স্বর — যেটা মনে হচ্ছিল মিলিয়ে যাচ্ছে — তাকে মুছে ফেলতে, আমার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

আমি বাড়িতে থাকি, মা ঠাকুরুণ, সে লজ্জিতভাবে বলেছিল। বাড়িতে?

হ্যাঁ, বাড়িতে মার কাছে থাকি। কণ্ঠস্বর পালিযে যাচ্ছে, নীরবতার মধ্যে পালিয়ে যাবার জন্য ছটফট করছে।

তার মানে তুমি বলছো যে তুমি সব সময় বাড়িতে থাকো জ্যানেট? আমি চড়া গলায় বললাম।

আমি আমাব মার কাছে থাকি। মার পাযের অবস্থা খুবই খারাপ। মা আর হাঁটাচলা করতে পারে না।

তার মানে তুমি বলছো যে তুমি আর মোটেই স্কুলে যাও না? তুমি শুধু তোমার মাকে দেখাশোনা করো?

হ্যাঁ, মা ঠাকুরুণ, সে বলেছিল, বড় বড় চোখে তার পায়ের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তারপর সে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, নিস্পৃহভাবে অকপটে, যেন সূর্যের দিকে তাকিয়েছিল চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

আমি বললাম, তখনও সেই চড়াগলায়; এক মিনিট দাঁড়াও, জ্যানেট। তোমার জন্য একটা জিনিস আছে। মনে হচ্ছে আমার কাছেই আছে — আমি বাড়ির মধ্যে পালিয়ে গেলাম। আলমারির কাছে ধেয়ে গিয়ে, একটা পোশাক আর একটা কর্ডুবয় স্কার্ট টেনে বার করলাম। তারপর সেগুলো গোল করে একটা বান্ডিল পাকালাম। হলের মাঝামাঝি এসে শোবার ঘরে ফিরে গেলাম আর আমার মানিব্যাগ থেকে পাঁচ শিলিং বার করলাম।

সে তখনও বাগানে সেই একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল। মনে হচ্ছিল সে যেন জানেই না সে কোথায় রয়েছে। তাকে আমি বান্ডিলটা দিলাম এই বলে। এই যে, মনে হয়

এগুলো তোমার ঠিক হবে, জ্যানেট -- তারপর পয়সাটা সে একটুকরো কাপড়ে বেঁধে নিলো আর জামাগুলো আবার ভাঁজ করলো।

ঠিক কি যে করবো ভেবে না পেয়ে আমি খানিকক্ষণ বাগানেই রয়ে গেলাম। বারান্দার জানালা দিয়ে ক্যারোলাইন আমার দিকে তাকিয়েছিল। ক্যারোলাইন, আমি হঠাৎ ডাক দিলাম, ক্যারোলাইন, জ্যানেটকে একটু চা দেবে কী?

ক্যারোলাইন এগারোটার আগে কখনো প্রাতরাশ করে না, সময় হয়ে গিয়েছিল। কয়েক মিনিট বাদে যখন রান্না ঘরে গেলাম, দেখলাম, জ্যানেট টেবিলের পাশে বসে বড় একটা চায়ের মগে মুখ দিয়েছে, তার সামনে রয়েছে তিন টুকরো রুটি আর জ্যাম. আমি বললাম, ঠিক আছে তো জ্যানেট?

সে মগের থেকে মুখ সরিয়ে হাসলো, খুবই ক্ষীণভাবে, খুব লজ্জিতভাবে তার চোখ দিয়ে।

আমি শুনতে পাচ্ছিলাম ক্যারোলাইন তার সঙ্গে কথা বলছে, শেষকালে ক্যারোলাইন আমার কাছে এসে বললো : ও এখন যাচ্ছে।

আবার সে বাগানে দাঁড়িয়েছিল, তার বান্ডিলটা হাতে করে। আমি হাসিমুখে বেরিয়ে এলাম। তার জন্য অনেক ভালো বোধ করছিলাম। বিদায়, জ্যানেট, আমি বললাম। আর তোমার মাকে বোলো আমি আশা করছি সে ভালো হয়ে যাবে। আর তুমি আবার আসবে আর এসে বলবে সে কেমন থাকে, ঠিক তো?

কোনো উত্তর মিললো না। হঠাৎ দেখলাম সে নিজেকে সংযত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে, দেখলাম দারুণভাবে সে কাঁদতে চাইছে। চোখের জলে তার সমস্ত শরীর মনে হচ্ছিল যেন ফুলে উঠেছে -- চোখের সেই জল এসে ঠেলা মারছে তার চোখ দুটোয়। তার চোখগুলো বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে গেলো। আরও নিষ্প্রভ হয়ে গেলো, আর তারপর শুরু হলো তার কান্না, আর নাক চোখ দিয়ে ধারা বইতে লাগলো, সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে হেঁচকী তুলে প্রচণ্ডভাবে কাঁদতে লাগলো।

কি হলো, জ্যানেট? আমি বলেছিলাম কি হলো?

কিন্তু সে শুধু কেঁদেই চললো, তার অশ্রুসিক্ত বাহু সে তার চোখের জল ঠেকাবার চেষ্টা করছিল, লজ্জার তাড়নায় সে চতুর্দিকে তাকাচ্ছিল কোথাও গিয়ে চোখের জল মুছবে বলে। বেশ জোরে নাক টানলো সে, ঢোক গিললো কিন্তু কোনো কিছুই খুঁজে পেলো না। বান্ডিলটা ছিল। কিন্তু সেটা সে কি করে ব্যবহার করতে পারে? ওর মধ্যে কি করে চোখের জল ফেলতে পারে? আমার সামনে।

কিন্তু হয়েছে কি বাছা, আমি বললাম। খারাপ কিছু ঘটেছে কি? কেঁদোনা তুমি। খারাপ কিছু ঘটেছে কি? আমাকে বলো?

সে কথা বলার চেষ্টা করলো কিন্তু দীর্ঘ একটা অশ্রুমায়া কম্পিতশ্বাসে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেলো। আমার মা..... খুবই অসুস্থ ..... অবশেষে সে বললো।

আবার সে কাঁদতে আরম্ভ করলো কান্নার দমকে আর ফোঁপানিতে তার মুখটা

বিকৃত হয়ে গেলো। প্রচণ্ডভাবে তার সিক্ত বাহু দিয়ে সে তার নাক ঘষতে লাগলো।

তার জন্য আমি কি করতে পারি? কি কবতে পারি আমি?

এই নাও .... আমি বললাম। এই যে .... এটা নাও, তাকে আমার রুমালটা দিলাম।

নাডাইন গর্ডিমাব (Nadine Gordimer) এব (Ah, Woe is me) আহ্! ও ইজ মি গল্পটির ছায়াবলম্বনে।

শেষ সাফারি

নাডাইন গর্ডিমার

সে দিন রাত্রে মা আমাদের দোকানে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। কখনো না। কি হয়েছিল? জানি না। আমার বাবাও একদিন চলে গিয়েছিল, কখনো আর ফিরে আসেনি ; কিন্তু বাবা তো গিয়েছিল যুদ্ধে, লড়াই করতে। আমরাও তো যুদ্ধের মধ্যেই ছিলাম, কিন্তু আমরা তো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, আমরা ছিলাম আমাদের দিদিমা আর দাদুর মতোই, আমাদের বন্দুক পিস্তল ছিল না। আমাদের বাবা যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, আমাদের সরকার তাদের বলতো — ডাকাত — তারা চারিদিক দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল আর আমরা কুকুর খেদানো মুরগির মতো তাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। কোথায় যে পালাবো তা জানতাম না। আমাদের মা দোকানে গিয়েছিল, কে যেন তাকে বলেছিল রান্নার তেল পাওয়া যাবে। আমরাও খুশি হয়েছিলাম অনেকদিন তেলের স্বাদ পাইনি ; মা হয় তো তেল পেয়েছিল, কেউ হয় তো অন্ধকারে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে তার কাছ থেকে তেল নিয়ে গিয়েছে। হয় তো বা সে ডাকাতের হাতে পড়েছে। তাদের হাতে যদি পড়ো, তাহলে তারা তোমাকে মেরেই ফেলবে। দু'বার তারা আমাদের গ্রামে এসেছিল আর আমরা পালিয়ে গিয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়েছিলাম, তারা চলে গেলে ফিরে এসে দেখলাম তারা সবকিছু নিয়ে গেছে ; কিন্তু তৃতীয়বার যখন তারা ফিরে এলো তখন আর নেবার কিছু ছিল না, না তেল, না খাবারদাবার, তাই তারা ঘরের চালে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল আর আমাদের ঘরগুলোর ছাদ ভেঙে পড়েছিল। আমাদের মা কয়েক টুকরো টিন খুঁজে এনেছিল আর আমরা সেগুলো আমাদের ঘরগুলোর একটা অংশের ওপর লাগিয়েছিলাম। যে রাত্রে সে আর ফিরে আসেনি তার জন্য আমরা সেখানেই অপেক্ষা করেছিলাম।

বাইরে যেতে আমাদের ভয় করছিল এমন কি ছোট বড় কাজ করবার জন্যও, কারণ ডাকাতরাও এসেছিল। আমাদের বাড়িতে আসেনি — ছাদ নেই দেখে নিশ্চয়ই মনে করেছিল ওটাতে কেউ নেই, সব কিছুই উধাও হয়ে গেছে — কিন্তু গ্রামের মধ্যে এসেছিল। আমরা শুনতে পেয়েছিলাম লোকজন ছোটাছুটি করছে আর চেঁচাচ্ছে। মা ছিল না যে বলবে কোথায় যাবো তাই আমাদের পালাতেও ভয় করছিল। আমি হচ্ছি

মেজো মেয়ে আর আমার ছোট্ট ভাইটি. একটা বাঁদর বাচ্চা যেমন তার মাকে করে তেমনি করে দু'হাত দিয়ে আমার গলা আর দু'পা দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে আমার পেটের কাছে সেঁটে ছিল। সারারাত আমার বড় ভাই আমাদের বাড়ির পোড়া খুঁটিগুলোর একটা ভাঙা টুকরো হাতে রেখে দিয়েছিল। ডাকাতরা যদি তাকে খুঁজে পায় তাহলে সেইটা দিয়ে নিজেকে বাঁচাবে।

সারাটা দিন আমরা ওখানেই ছিলাম। মার জন্য অপেক্ষা করে। সেটা যে কোনদিন তা জানতাম না ; আমাদের গ্রামে আর কোনো স্কুল ছিল না আর কোনো গীর্জাও ছিল না, তাই সে দিনটা রবিবার কি সোমবার তা জানাই যেতো না।

সূর্য যখন ডুবুডুবু, আমাদের দিদিমা আর দাদু এসে হাজির হলো। আমাদের গ্রামের থেকে কে যেন ওদের বলেছিল আমরা ছেলেমেয়েরা সব একা আছি, আমাদের মা ফেরেনি। আমি দাদুর নাম করার আগে 'দিদিমার' নাম করছি এই কারণে যে ব্যাপারটা ঠিক তেমনই ; আমাদের দিদিমা হলো দশাসই আর শক্তসামর্থ্য, এখনও বুড়ো হয়ে যায়নি আর আমাদের দাদু হলো ছোটখাটো, তার ঢিলঢিলে পাৎলুনের মধ্যে তাকে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না, সে হাসে বটে কিন্তু তুমি কি বলছো তা শুনতেই পায় না, আর তার চুলগুলো দেখে মনে হয় সাবানের ফেনা দিয়ে যেন মাথাটা ভরিয়ে রেখেছে' আমাদের দিদিমা আমাদের — আমাকে, বাচ্চাটাকে. আমার বড় ভাইকে আর আমাদের দাদুকে নিয়ে গিয়েছিল তার বাড়িতে, আমাদের সকলের ভয় হচ্ছিল (আমার দিদিমার পিঠে ঘুমন্ত বাচ্চাটা ছাড়া) পাছে পথে ডাকাতদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায়। অনেক অনেকদিন ধরে আমাদের দিদিমার বাড়িতে আমরা অপেক্ষা করেছিলাম। বোধহয় একমাস হবে। আমরা খিদেয় কাবু হয়ে থাকতাম। আমাদের মা আর ফিরে আসেনি। সে এসে আমাদের নিয়ে যাবে এই অপেক্ষায় যখন ছিলাম তখন আমাদের দিদিমার কাছে আমাদের জন্য বা আমাদের দাদুর জন্য কিংবা তার নিজের জন্য কোনো খাবারদাবার ছিল না।এক মহিলার বুকে দুধ ছিল, সে আমার ছোট্ট ভাইটির জন্য কিছুটা দুধ আমাদের দিয়েছিল, যদিও আমাদের নিজেদের বাড়িতে আমার ছোট্ট ভাইটিও আমাদের মতো পরিজ (জল দিয়ে সিদ্ধ করা জই) খেতো। আমাদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের দিদিমা গিয়েছিল বুনো পালঙের খোঁজে কিন্তু গ্রামের সকলেই তাই করেছিল বলে কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না।

আমাদের দাদু, জনাকয়েক অল্প বয়সী লোকের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিল আমাদের মায়ের খোঁজে কিন্তু মাকে খুঁজে পায়নি। আমাদের দিদিমা অন্যসব মহিলাদের সঙ্গে কান্নাকাটি করেছিল আর তাদের সঙ্গে আমি উপাসনার গান গেয়েছিলাম। সামান্য কিছু খাবার তারা এনেছিল — খানিকটা বীন — কিন্তু দিন দুই পরে আবার সেই এক অবস্থা — কেনো খাবার ছিল না। আমাদের দাদুর তিনটে ভেড়া, একটা গরু আর সবজীর একটা বাগান ছিল কিন্তু ডাকাতরা অনেকদিন আগেই ভেড়াগুলো আর গরুটা নিয়ে গিয়েছিল, কেননা তারা নিজেরাও খেতে

পাচ্ছিল না ; বীজ বোনার সময় যখন এলো তখন আমাদের দাদুর কাছে বোনার জন্য কোনো বীজই ছিল না।

তাই তারা — আমাদের দিদিমা ঠিক করলো ; আমাদের দাদু মৃদু আওয়াজ করেছিল আর বসে বসে এপাশ থেকে ওপাশ দুলতে লেগেছিল, কিন্তু আমাদের দিদিমা কোনো পাত্তাই দেয়নি — আমরা এখান থেকে চলে যাবো। আমরা ছেলেমেয়েরা খুশি হয়েছিলাম। আমাদের মা যেখানে নেই, যেখানে আমরা খেতে পাচ্ছি না সেখান থেকে আমরা চলে যেতে চাইছিলাম। আমরা এমন জায়গায় যেতে চাইছিলাম যেখানে কোনো ডাকাত নেই আর যেখানে খেতে পাবো। দূরে কোথাও যে এমন জায়গা আছে একথা ভাবতেও ভালো লাগছিল।

আমাদের দিদিমা তার গীর্জায় যাবার পোশাকগুলো কাকে জানি দিয়ে তার বদলে কতগুলো শুকনো ভুট্টা এনে সেগুলো সিদ্ধ করে একটা ন্যাকড়ায় বেঁধে নিলো। যাত্রা করার সময় সেগুলো আমরা সঙ্গে নিলাম, আমাদের দিদিমা ভেবেছিল কোনো না কোনো নদী থেকে আমরা জল পাবো। কিন্তু কোনো নদীর দেখা না মেলায় আমাদের এমন জল পিপাসা পেলো যে আমাদের ফিরতে হলো। আমাদের দিদিমা আর দাদুর বাড়ি পর্যন্ত অতটা দূর নয়, কাছাকাছি একটা গ্রামে যেখানে একটা পাম্প ছিল, সেই পর্যন্ত। যে ঝুড়িতে করে আমাদের দিদিমা কতকগুলো কাপড়চোপড় আর ভুট্টাগুলো নিয়ে যাচ্ছিল সেটা খুলে নিজের জুতো জোড়াটা বিক্রি করে জল নেওয়ার জন্য প্লাসটিকের একটা পাত্র কিনলো। আমি বললাম, গোগো, তোমার জুতো ছাড়া তুমি এখন গীর্জায় যাবে কি করে। কিন্তু সে বললো, আমাদের অনেক দূর যেতে হবে আর জিনিস অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে। ঐ গ্রামে আমাদের আরো অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হলো তারাও চলে যাচ্ছিল। আমরা তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম — কেন না সেই জায়গাটা যে কোথায় মনে হলো তারা সেটা অনেক ভালো করে জানে।

সেখানে যেতে গেলে আমাদের ক্রুগার পার্কের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ক্রুগার পার্কের কথা আমরা জানতাম। হাতি, সিংহ, শেয়াল, হায়না, হিপো, কুমির — সব রকমের জানোয়ারদের গোটা একটা রাজ্যের মতো। যুদ্ধের আগে তাদের মধ্যেকার কিছু কিছু জানোয়ার আমাদের দেশেও ছিল (আমাদের দাদুর মনে আছে, আমরা ছেলেমেয়েরা তখন জন্মাইনি) কিন্তু ডাকাতরা হাতিদের মেরে তাদের দাঁতগুলো বিক্রি করে দিয়েছে, ডাকাত আর আমাদের সৈন্যরা মিলে হরিণগুলোকে খেয়ে ফেলেছে। আমাদের গ্রামে একজন লোক ছিল যার দুটো পা ছিল না — আমাদের নদীতে কুমিরে সেগুলো নিয়ে গিয়েছিল ; তাহলেও আমাদের দেশটা তো মানুষের দেশ জন্তু-জানোয়ারদের নয়। ক্রুগার পার্কের কথা আমরা জানতাম এই জন্যে যে আমাদের কিছু লোক বাড়ি ছেড়ে কাজ করতে যেতো সাদা চামড়ার লোকেরা জন্তু-জানোয়ারদের দেখবার জন্য যেখানে এসে থাকতো সেইখানে।

আমরা আবার চলে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। অন্যসব মহিলা আর আমার

মতো আরো ছেলেমেয়েরাও ছিল, মহিলারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে ঐসব ছেলেমেয়েদের তখন পিঠে করে ছোট বাচ্চাদের বইতে হতো। একটি লোক আমাদের পথ দেখিয়ে ক্রুগার পার্কে নিয়ে চললো ; আমরা কি সেখানে পৌঁছে গেছি, আমি বারবার আমাদের দিদিমাকে প্রশ্ন করছিলুম। না, এখনও না, দিদিমা জিজ্ঞাসা করাতে লোকটি বলেছিল। বেড়াটা ঘুরে যেতে আমাদের অনেক সময় লাগবে, সে আমাদের ব্যাখ্যা করে বলেছিল, ওটা ছুঁয়েছো কি সঙ্গে সঙ্গে তোমার গায়ের চামড়া একেবারে ঝলসে যাবে, তুমি মরেই যাবে, আমাদের শহরগুলোয় ইলেকট্রিক আলোর জন্য লম্বা খুঁটিগুলোর ওপরের তারের মতো। চোখ আর চামড়াহীন একটা মাথার ছবি আমি দেখেছিলাম বোমায় উড়ে যাওয়ার আগে আমাদের যে মিশন হাসপাতাল ছিল, সেখানেই একটা লোহার বাক্সের গায়ে।

আবার যখন জিজ্ঞাসা করলাম, তখন বললো ঘণ্টা খানেক হলো ক্রুগার পার্কের মধ্যে দিয়েই আমরা চলেছি ; কিন্তু যেরকম ঝোপগুলোর মধ্যে দিয়ে সারাদিন ধরে চলেছিলাম সেই রকমই দেখতে লাগছিল ওটা, শুধু বাঁদর আর পাখি — যেগুলো আমাদের গ্রামেরও আশেপাশে দেখা যেতো — সেগুলো ছাড়া অন্য কোনো জন্তু-জানোয়ারের দেখা পাইনি — অবশ্য একটা কচ্ছপও ছিল বটে, যেটা আমাদের কাছ থেকে বেশি দূর চলে যেতে পারছিল না। আমার বড় ভাই আর অন্য ছেলেরা ওটাকে ধরে লোকটির কাছে এনেছিল যাতে করে ওটাকে মেরে আমরা রান্না করে খেতে পারি। সে ওটাকে ছেড়ে দিলো কেননা সে বললো, আমরা আগুন জ্বালাতে পারবো না। পার্কের মধ্যে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ কোনো মতেই আমরা আগুন জ্বালাবো না, কেন না তাহলে ধোঁওয়া দেখে বোঝা যাবে আমরা ওখানে আছি। পুলিস, ওয়ার্ডেন সব আসবে আর আমরা যেখান থেকে এসেছি আবার সেইখানেই আমাদের পাঠিয়ে দেবে। জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে, সে বললো, আমরা যেন জন্তু-জায়োনারদের মতো করেই ঘোরাফেরা করি, রাস্তাগুলোর থেকে দূরে থেকে, সাদা চামড়ার লোকদের ক্যাম্পগুলোর তফাতে থেকে। সেই মুহূর্তেই আমি শুনতে পেলাম — আমি ঠিকই জানি যে আমিই প্রথমে শুনতে পেয়েছিলাম — ডালপালা ভাঙার আর ঘাসগুলো ঠেলে কি একটা যেন আসছে তারই আওয়াজ, আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম কেন না আমি ভেবেছিলাম পুলিস, ওয়ার্ডেন — যেসব লোক সম্বন্ধে আমাদের সে সাবধান হতে বলেছিল — তারা হয়তো এরই মধ্যে আমাদের দেখতে পেয়েছে। কিন্তু ওটা ছিল একটা হাতি, তারপর আর একটা হাতি, আরো অনেক হাতি, গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে যে দিকেই তাকাও বড় বড় কালো কালো ফোঁটাগুলো চলে বেড়াচ্ছে। ওদের শুঁড় মোপেন গাছগুলোর লাল লাল পাতা জড়িয়ে ধরছে আর মুখের ভেতর পুরছে। বাচ্চা হাতিগুলো তাদের মায়েদের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রায় প্রাপ্তবয়স্করা, আমার বড় ভাই যেমন তার বন্ধুদের সঙ্গে কোস্তাকুস্তি করে ঠিক তেমনি করছে তবে হাতের বদলে শুঁড় ব্যবহার করছে তারা। এমনই অদ্ভুত লাগলো আমার যে আমি ভয় করতেই ভুলে গেলাম।লোকটি বললো, হাতিগুলো চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা

যেন কেবল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি আর কথা না বলি। হাতিগুলো চলে গেলো খুবই আস্তে আস্তে, তারা আসলে আকারে এত বড় যে কারো কাছ থেকে পালিযে যাওয়ার দরকার হয়না তাদের।

হরিণগুলো আমাদের দেখে পালিয়ে গেলো। এত উঁচু উঁচু লাফ দিচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল যেন উড়ছে। আমাদের সাড়া পেয়ে ওয়ার্টহগরা (আফ্রিকার বুনো শূয়োর) থমকে থেমে পড়লো, তারপর আমাদের গ্রামের একটা ছেলে খনি থেকে আনা বাপের একটা সাইকেলে চড়ে যেমন এঁকে বেঁকে যেতো ঠিক তেমনি করে এঁকে বেঁকে চলে গেলো জন্তুগুলোর পিছু পিছু আমরা গেলাম তাদের জলখাবার জায়গাটায়। তারা চলে গেলে আমরা তাদের জলের গর্তগুলোয় গেলাম। জল খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের জল পিপাসা পেতো না, জন্তুগুলো কিন্তু খেয়েই চলছিল, সব সময়ই খাচ্ছিল। যখনই তাদের দিকে তাকাবে তখনই তারা ঘাস খাচ্ছে, গাছ খাচ্ছে, গাছের শিকড় খাচ্ছে। আর আমাদের জন্য কিছুই নেই। ভুট্টাগুলো ফুরিয়ে গেছে। একমাত্র খাবার যা আমরা খেতে পারি তা হলো বেবুনরা যা খায়, নদীর ধারের গাছগুলোর ডালে ডালে জন্মায় পিঁপড়ে ভর্তি শুকনো শুকনো ডুমুরগুলো। জন্তুদের মতো হওয়া শক্ত।

দিনের বেলায় যখন গরম খুব বাড়তো তখন আমরা দেখতাম সিংহরা সব শুযে আছে। তাদের গায়ের রঙ ঠিক ঘাসের মতো, আমরা তো প্রথমে দেখতেই পাইনি কিন্তু লোকটি পেয়েছিল, সেই আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেলো তারা যেখানে ঘুমোচ্ছিল তার থেকে অনেকটা দূরে। আমিও ঐ সিংহদের মতো শুয়ে পড়তে চাইছিলাম। আমার ছোট্ট ভাইটি রোগা হয়ে গেলেও বেশ ভারী ছিল। তাকে পিঠে চাপাবার জন্য আমাদের দিদিমা যখন আমাকে খুঁজছিল তখন আমি না দেখার চেষ্টা করেছিলাম। আমার বড় ভাই কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল ; আর আমরা যখন বিশ্রাম নিতাম তখন আবার উঠে পড়ার সময় তাকে ঝাঁকুনি দিতে হলো, সে যেন আমাদের দাদুর মতো কানে শুনতে পায় না। আমি দেখলাম আমাদের দিদিমার মুখের ওপর মাছি বসছে অথচ সে তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে না। আমার ভয় হলো। একটা তালপাতা নিয়ে আমি তাদের তাড়িয়ে দিলাম।

আমরা রাত্রে তো বটেই আবার দিনেও হাঁটতাম। আমরা ক্যাম্পগুলোর মধ্যেকার আগুন দেখতে পেতাম যেখানে সাদা চামড়ার লোকেরা রান্না করতো, ধোঁওয়া আর মাংসের গন্ধও পেতাম। যেন তারা লজ্জা পাচ্ছে এমনিভাবে ঢালু করা পিঠ হায়নাদের দেখতাম, গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঝোপের মধ্যে দিয়ে চলেছে। ওদের মধ্যে থেকে একটা যদি মুখ ফেরাতো তো দেখতো আমাদের চোখের মতোই ওরও বড় বড় বাদামী রঙের চোখ, অন্ধকারের মধ্যে আমরা যখন পরস্পরের দিকে তাকাতাম। বাতাসে আমাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলার শব্দ ভেসে আসতো, ক্যাম্পগুলোয় যারা কাজ করতো তাদের বাসাগুলোর লাগোয়া জায়গা থেকে। আমাদের মধ্যে থেকে এক মহিলা রাত্রে ওদের কাছে যেতে চেয়েছিল আমাদের জন্য সাহায্য চাইবার

উদ্দেশ্যে। সে বলেছিল ওরা তো ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া খাবার আমাদের দিতে পারে, আছাড়ি পিছাড়ি করে সে একেবারে মরাকান্না শুরু করে দিয়েছিল, শেষকালে আমাদের দিদিমা গিয়ে তাকে চেপে ধরে তার মুখের ওপর হাত চাপা দেয়। যে লোকটি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে আমাদের বললো ক্রুগার পার্কে আমাদের যে সব লোক কাজ করে তাদের থেকে দূরে থাকতে : তারা যদি আমাদের সাহায্য করে তবে তাদের চাকরি চলে যাবে। যদি তারা আমাদের দেখতেও পেতো তবে এমন ভাব করতো যেন আমরা ওখানে নেই ; তারা শুধু জন্তু-জানোয়ারই দেখতে পেয়েছে।

মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে নেবো বলে রাত্রে আমরা থামতাম। আমরা একত্রে ঘেঁষাঘেঁষি করে শুতাম। কোন রাত্রে জানি না — কেননা আমরা তো কেবলই হাঁটছিলাম আর হাঁটছিলাম—যে কোনো সময়, সব সময় — খুব কাছেই সিংহদের ডাক শুনতে পেলাম। দূর থেকে যেমন শোনায় তেমনি, জোরে নয়। হাঁপাতে হাঁপাতে, দৌড়লে আমরা যেমন করে থাকি তেমনি, কিন্তু ওটা ছিল অন্য রকমের হাঁপানি · তারা যে দৌড়চ্ছেনা সেটা বোঝা যাচ্ছিল, কাছে পিঠে কোথায় অপেক্ষা করছিল। তালগোল পাকিয়ে সবাই মিলে ঘাড়াঘাড়ি করে এক জায়গায় জড়ো হলাম, ধারের দিকে যারা ছিল তারা মাঝখানে আসার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল। আমি এক মহিলার গায়ের সঙ্গে লেপটে ছিলাম, ভয়ে তার গা দিয়ে বিশ্রী গন্ধ বার হচ্ছিল, তাকে শক্ত করে ধরে থাকতে পেরে আমি কিন্তু খুশি হয়েছিলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলাম সিংহগুলো যেন ধার থেকে কাউকে নিয়ে চলে যায়। গাছের ওপর থেকে কোনো সিংহ যদি আমাদের মাঝখানে, আমি যেখানে ছিলাম, সেখানে লাফিয়ে পড়ে, তবে সেটা যাতে দেখতে না হয় তার জন্য আমি চোখ বন্ধ করে রেখেছিলাম। তার বদলে যে লোকটি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে লাফিয়ে উঠে একটা মরা ডাল দিয়ে গাছের গায়ে বাড়ি মারলো। আমাদের সে শিখিয়ে ছিল কোনো মতেই কোনো শব্দ না করতে কিন্তু সে নিজেই চিৎকার করে উঠেছিল। সিংহদের উদ্দেশ্যেই সে চেঁচিয়েছিল, আমাদের গ্রামের এক মাতাল যেমন কাউকে উদ্দেশ্য না করেই চিৎকার করে, তার মতো। সিংহগুলো চলে গেলো। আমরা শুনতে পেলাম তা, গজরাচ্ছে আর ডাকছে অনেক দূর থেকে।

আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, খুবই ক্লান্ত। নদীগুলো পার হবার জায়গাগুলো দেখতে পেলে আমার বড় ভাই আর ঐ লোকটি আমাদের দাদুকে একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের দিদিমা বেশ শক্ত কিন্তু তারও পা দিয়ে রক্ত পড়ছিল। ঝুড়িটা আর আমরা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতে পারছিলাম না, আমার ছোট্ট ভাইটিকে ছাড়া আমরা আর কিছুই বয়ে নিয়ে যেতে পারছিলাম না। আমাদের জিনিষগুলো একটা ঝোপের নিচেয় ফেলে এসেছিলাম। আমাদের দিদিমা বলেছিল আমাদের দেহগুলো যদি সেখানে পৌঁছায় তাহলেই যথেষ্ট। তারপর আমরা কতকগুলো বুনো ফল খেয়েছিলাম, আমাদের গ্রামে সে ফল কখনো

দেখিনি। আমাব পেট ছেড়ে দিয়েছিল। আমরা এক ধরনের ঘাসের মধ্যে এসে পড়েছিলাম, যেগুলোকে বলা হয হাতি ঘাস, তার কারণ সেগুলো প্রায় হাতিব সমান লম্বা, সেদিন আমাদের পেট ব্যথা করছিল, আর আমাদের দাদু তো আব আমার ছোট ভাইটিব মতো লোকের সামনে বসে পড়তে পারে না, তাই সে ঘাসের মধ্যে চলে গিযেছিল একলা হবে বলে। যে লোকটি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে আমাদের বারবার বলছিল ওদের সঙ্গে আমাদের তাল রেখে চলতে হবে, ওদের গিযে ধরতে হবে। কিন্তু আমরা তাকে আমাদের দাদুর জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। তখন মাঝবেলা : পোকাগুলো আমাদেব কানের কাছে গান করছিল — তাই আমরা ঘাসের মধ্যে আমাদের দাদুর নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাইনি। ঘাসগুলো এত লম্বা আব সে এত ছোটখাটো যে আমবা তাকে দেখতেও পাইনি। কিন্তু সে নিশ্চযই ওখানে কোথাও ছিল, তার ঢিলঢিলে পাৎলুন আব ছেঁড়া শার্ট যেটা আমাদের দিদিমা সেলাই করতে পারেনি তার কাছে সুতো ছিল না বলে ; তার মধ্যে। আমরা জানতাম সে কখনোই বেশি দূরে যেতে পারেনি। কারণ তাব গাযে তো শক্তি ছিল না আর চলাফেরাও করতো আস্তে আস্তে। আমরা সবাই তার খোঁজে গিয়েছিলাম ভাগ ভাগ হযে, যাতে করে ঐ ঘাসের মধ্যে পবস্পরের থেকে আড়ালে না পড়ে যাই। ঘাসগুলো আমাদের চোখে মুখে ঢুকে যাচ্ছিল ; আমরা আস্তে আস্তে করে তাকে ডাকছিলাম কিন্তু পোকাদেব আওয়াজে নিশ্চয তাব কানের মধ্যে শোনার জন্য যেটুকু জাযগা ছিল সেটুকুও বন্ধ হযে গিয়েছিল। আমরা খুঁজতেই থাকলাম আর খুঁজতেই থাকলাম' তাকে আর দেখতে পেলাম না। লম্বা লম্বা ঐ ঘাসের মধ্যে আমরা সারারাত কাটালাম। স্বপ্নের মধ্যে দেখলাম হরিণেরা তাদের বাচ্চাদের লুকিয়ে রাখাব জন্য পা দিযে মাড়িযে যেমন একটা জাযগা তৈরি করে ঠিক তেমনিভাবে নিজের জন্য একটা জায়গা তৈবি করে তাব মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুযে আছে সে।

আমার ঘুম ভাঙার পবও তাকে কোথাও পাওযা গেলো না। আমরা তাই আবার খোঁজাখুঁজি করলাম, এতক্ষণে ঘাসের মধ্যে বহুবাব আমাদের যাতায়াতের ফলে অনেকগুলো পথ তৈবি হযে গিয়েছিল। আমরা তাকে খুঁজে না পেলেও তার পক্ষে তো আমাদেব খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ। সারাটা দিন আমরা শুধু বসে রইলাম আর অপেক্ষা করলাম। সূর্য যখন ঠিক তোমার মাথার ওপর, তখন তুমি যদি জন্তু জানোযারদের মতো গাছগুলোর তলায় শুয়েও থাকো, তোমার মাথার ভেতর সবকিছু একেবারে নিঝুম হয়ে যায়। চিৎ হয়ে শুয়ে শুযে আমি দেখছিলাম ঐ বাকানো ঠোঁট আর পালক ছাড়ানো গলাওয়ালা বিশ্রী দেখতে পাখিগুলো আমাদেব ওপর চক্রাকারে ঘুরেই চলেছে। পথে প্রাযই আমরা তাদের পার হযে এসেছি। সেখানে তারা মরা জন্তুদের হাড়গোড় ঠুকরে খাচ্ছিল, আমাদের খাবার জন্য কখনো কিছু রেখে যেতো না। চক্রাকারে কখনো উঁচুতে কখনো আরো নিচুতে তারপরে আবার উঁচুতে। দেখলাম ঘাড় ঘুরিয়ে তারা কখনো এদিকে তাকাচ্ছে, কখনো ওদিকে তাকাচ্ছে। চক্রাকারে ঘুরছে। দেখলাম আমাদের দিদিমা, এক নাগাড়ে আমার ছোট ভাইটিকে যে কোলে নিয়ে বসেছিল, সেও তাদের দেখছে।

বিকেলে, যে লোকটি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমাদের দিদিমার কাছে এসে বললো অন্যদের এবার এগিয়ে যাওয়া উচিত। সে বলল, তাদের ছেলেপুলেরা শীঘ্রিরই যদি খেতে না পায় তবে মরে যাবে।

আমাদের দিদিমা কিছু বললো না।

আমরা যাবার আগে তোমাদের জন্য জল এনে দিয়ে যাব, সে আমাদের দিদিমাকে বলেছিল।

আমাদের দিদিমা আমার দিকে, আমার বড় ভাইয়ের দিকে আর নিজের কোলে শোওয়া আমার ছোট্ট ভাইটির দিকে তাকিয়েছিল। আমরা দেখলাম অন্যেরা চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছে। আমি বিশ্বাসই করিনি যে তারা যেখানে ছিল, আমাদের চারপাশের সেই ঘাসেভরা জায়গাটা খালি হয়ে যাবে। আর এইখানে, এই ক্রুগার পার্কে আমরা একলা পড়ে থাকবো, পুলিস কিম্বা জন্তু জানোয়ারগুলো আমাদের খুঁজে পাবে। আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে আমার হাতের ওপর পড়তে লাগলো কিন্তু আমাদের দিদিমা কোনো নজরই করলো না। সে উঠে দাঁড়ালো, বাড়িতে, আমাদের গ্রামে জ্বালানি কাঠ তোলার সময় যেমন করে পা দুটো করে রাখে তেমনিভাবে ফাঁক করে, আমার ছোট্ট ভাইটিকে ঘুরিয়ে পিঠে তুলে নিয়ে নিজের কাপড়ের মধ্যে বাঁধলো — তার জামার ওপরের দিকটা ছিঁড়ে গিয়েছিল আর তার মধ্যে দিয়ে তার বড় বড় স্তন দুটো দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু সে দুটোতে আমার ছোট্ট ভাইটির জন্য কিছুই ছিল না। আমাদের দিদিমা বললো, এসো।

এমনিভাবে আমরা লম্বা লম্বা ঘাসেভরা জায়গাটা ছেড়ে এসেছিলাম। পেছনে ফেলে এসেছিলাম। যে লোকটি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচিছল, তার সঙ্গে আর অন্যদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। আমরা আবার চলে যাবার যাত্রা শুরু করেছিলাম।

কোনো গীর্জা কিংবা স্কুলের থেকেও বড়, প্রকাণ্ড একটা তাঁবু মাটির ওপর গাড়া। ওখান থেকে চলে এসে আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন ওটা যে কি হতে পারে আমি সেটা বুঝতেই পারিনি। এইরকম একটা তাঁবু আমি দেখেছিলাম সেইবার আমাদের মা যখন আমাদের শহরে নিয়ে যায় তখন, মা শুনেছিল আমাদের সৈন্যরা ওখানেই আছে আব সে তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাইছিল আমাদের বাবা কোথায় সেটা তারা জানে কি না। সেই তাঁবুটার মধ্যে লোকজন প্রার্থনা করছিল, গান গাইছিল। এই তাঁবুটাও সেটার মতো নীল সাদা রঙের — তবে এটা প্রার্থনা আর গান করার জন্য নয়, এখানে আমরা থাকি আমাদের দেশ থেকে আসা আরো অন্য সব লোকদের সঙ্গে। ক্লিনিকের সিস্টার বলে, ছোট্ট বাচ্চাদের বাদ দিয়ে আমরা দু'শোজন আছি, আর আমাদের সঙ্গে নতুন বাচ্চারাও আছে তাদের মধ্যে কয়েকজন জন্মেছে ক্রুগার পার্কের মধ্যে দিয়ে আসার সময়।

এমন কি রোদ যখন বেশ ঝকঝকে তখনও ভেতরটা অন্ধকার, আর সেখানে প্রায় গোটা একটা গ্রামই রয়েছে। বাড়ির বদলে প্রতিটি পরিবারের রয়েছে ছোট একটুখানি করে জায়গা — হাতের কাছে যা পেয়েছে — চট কিংবা বাক্সেব কার্ডবোর্ড দিযে

ঘেরা — অন্য পরিবারদের বোঝাতে যে এ জায়গাটা তোমার — তারা যেন ভেতরে না আসে যদিও কোনো দরজা, জানলা বা ছাদ নেই। এরফলে একমাত্র ছোট বাচ্চা ছাড়া কেউ দাঁড়িয়ে উঠলেই সকলের বাড়ির ভেতরটা দেখতে পেতো। কিছু লোক আবার পাথর গুঁড়ো করে তার থেকে রঙ বানিয়ে চটের ওপর নানা নক্সা এঁকেছে।

অবশ্য সত্যি করে ছাদ একটা আছে, তাঁবুটাই তো ছাদ, দূরে, অনেকটা উঁচুতে। ঠিক একটা আকাশের মতো। ঠিক একটা পাহাড়ের মতো আর তার মধ্যে আমরা আছি, ফুটোফাটার মধ্যে দিয়ে ধুলোর পথগুলো নেমে এসেছে এমনই পুরু হয়ে যে মনে হয় যেন তার ওপরে চড়া যায়। তাঁবুটা মাথার ওপরেব বৃষ্টি ঠেকায় কিন্তু বৃষ্টিব জল গড়িয়ে আসে পাশগুলো দিয়ে, আর আমাদের থাকার জায়গাগুলোর মাঝের বাস্তাগুলো দিয়ে সেই রাস্তাগুলো দিয়ে একবারে একজন করে মানুষ আসাযাওয়া করতে পারে — আমার ছোট্ট ভাইটির মতো বাচ্চারা সেখানে কাদার মধ্যে খেলা করে। ওদের ডিঙিয়ে যেতে হয়। আমার ছোট্ট ভাইটি খেলে না। সোমবার সোমবার যখন ডাক্তার আসে তখন আমাদের দিদিমা তাকে ক্লিনিকে নিয়ে যায়। সিস্টাব বলে তার মাথায় কি যেন হয়েছে, সিস্টার মনে করে দেশে আমরা যথেষ্ট খেতে পাইনি বলে। যুদ্ধের জন্য। আমাদের বাবা ওখানে না থাকার জন্য। আর তার ওপর ক্রুগার পার্কে সে অমন না খেয়ে থাকছে বলে। সে সারাদিন আমাদের দিদিমার কাছে পিঠে শুয়ে থাকতে ভালোবাসে, তার কোলে কিংবা তার গায়ে কোথাও ঠেস দিয়ে। আর আমাদের দিকে সে সমানে তাকিয়েই থাকে। কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায় সে। দেখলেই বোঝা যায় সে জিজ্ঞাসা করতে পারছে না। আমি যদি তাকে কাতুকুতু দিই তাহলে সে হয়তো একটু হাসতে পারে। ওর জন্য পরিজ বানাতে ক্লিনিক আমাদের বিশেষ একরকম পাউডার দেয় আর হয়তো একদিন ও ভালোই হয়ে যাবে।

আমরা যখন এসেছিলাম তখন আমরাও ওরই মতো ছিলাম — আমি আর আমার বড় ভাই। আমার প্রায় মনেই পড়ে না। তাঁবুর কাছে গ্রামে যারা থাকে তারাই আমাদের ক্লিনিকে নিয়ে গিয়েছিল ; ঐখানে তোমায় সই করতে হয় যে তুমি এসেছো — চলে এসেছো, ক্রুগার পার্কের মধ্যে দিয়ে। আমরা ঘাসের ওপর বসেছিলাম আর সব কিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। সুন্দর দেখতে একজন সিস্টার ছিল, চুলগুলো তার সোজা সোজা আব পায়ে সুন্দর উঁচু হিলের জুতো, সেই আমাদের বিশেষ ধরনের পাউডার এনে দিয়েছিল। আমাদের সে বলেছিল, ওটা জলে গুলে ধীরে ধীরে খেতে। আমরা দাঁত দিয়ে প্যাকেটগুলো খুলে চেটেপুটে সবটা খেয়ে ফেলেছিলাম, পাউডারটা আমার মুখের চারপাশে লেগে থাকায়, আমি ঠোঁট আর আঙুল থেকে ওটা চেটে চেটে খেয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে যে সব ছেলেমেয়েরা হেঁটে এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকে বমি করে দিয়েছিল। কিন্তু আমার শুধু মনে হয়েছিল আমার পেটের মধ্যে সব কিছু যেন নড়ে বেড়াচ্ছে, জিনিসটা যেন সাপের মতো নামছে আর ঘুরপাক খাচ্ছে, আর যখন হেঁচকি উঠছিল তখন ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। অন্য একজন সিস্টার আমাদের ডেকে ক্লিনিকের বারান্দায় সার দিয়ে

দাঁড়াতে বলেছিল কিন্তু আমরা পারিনি। আমরা চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিলাম, খাড়াখাড়ি করে ; সিস্টাররা আমাদেব হাত ধরে তুলে হাতের মধ্যে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়েছিল। অন্যসব ছুঁচ দিয়ে আমাদের রক্ত নিয়েছিল ছোট ছোট শিশিতে করে। ওটা নাকি অসুখ যাতে না হয় তার জন্য, আমি কিন্তু কিছু বুঝতেই পারিনি, যতবার আমাব চোখ বুঁজে গেছে ততবার মনে হয়েছে আমি হাঁটছি, ঘাসগুলো সব লম্বা লম্বা, হাতিগুলোও দেখতে পাচ্ছিলাম, আমরা চলে এসেছি সেটা আমি বুঝতেই পাবছিলাম না।

কিন্তু আমাদের দিদিমা খুব শক্ত ছিল, তখনও সে উঠে দাঁড়াতে পারছিল, সে লিখতে জানে আর সে'ই আমাদের হয়ে সই করেছিল। তাঁবুর একটা ধারে এই জায়গাটা আমাদের দিদিমাই আমাদের জন্য যোগাড় করেছে, সব থেকে ভালো একটা জায়গা এটা যদিও বৃষ্টির জল আসে, তবুও দিন ভালো থাকলে আমরা তাঁবুব কানাচটা তুলে দিতে পারি তখন আমাদের গায়ের ওপর রোদ এসে পড়ে, তাঁবুর ভেতরের গন্ধটাও বেরিয়ে যায়। আমাদের দিদিমার জানা একটি মেয়ে মাদুর বানাবার ভালো ঘাস কোথায় পাওয়া যায় তা তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল আর আমাদের দিদিমা আমাদের শোবার জন্য কটা মাদুর বানিয়ে দিয়েছে। ক্লিনিকে, মাসে একবাব করে খাবার নিয়ে ট্রাক আসে। আমাদের দিদিমা তার সই করা কার্ডগুলোর একটা নিযে যায় আর সেটাতে ছাপ দেওয়া হয়ে গেলে আমরা একবস্তা করে ভুট্টার গুঁড়ো পাই। বস্তাটা তাঁবুতে নিয়ে যাবার জন্য ঠেলা আছে ; আমার বড় ভাই আমাদের দিদিমার জন্য এটুকু করে তারপর খালি ঠেলাগুলো ঠেলে ক্লিনিকে ফেরত দেবার সময অন্য ছেলেদের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দেয়। কখনো কখনো তার কপাল ফেরে কোনো লোক হয়তো গ্রামে বীয়ার কিনে তাকে পযসা দেয় ওটা পৌঁছে দেবার জন্য — যদিও সেটা করার নিয়ম নেই, ঠেলাটা সরাসরি সিস্টারদের কাছে পৌঁছে দেবার কথা। যদি আমার কাছে ধরা পড়ে যায় তখন এক বোতল মিষ্টি জল কিনে ও আমাকে তার ভাগ দেয়। প্রতিমাসে আর একদিন করে, গীর্জা থেকে ক্লিনিকের উঠোনে পুরনো জামাকাপড় ডাঁই কবে রেখে যায। আমাদের দিদিমাকে আর একটা কার্ড ছাপ দিইয়ে নিতে হয়, তারপর আমরা কিছু জামাকাপড় বেছে নিতে পারি ঃ আমার দুটো পোশাক আছে, দুটো প্যান্ট আর একটা জার্সি, যাতে করে আমি স্কুলে যেতে পারি।

গ্রামের লোকেরা তাদের স্কুলে আমাদের যোগ দিতে দিয়েছে। তারা আমাদেরই ভাষা বলে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ; আমাদের দিদিমা আমাকে বলেছিল, সেই জন্যই তো ওরা ওদের জমিতে আমাদের থাকতে দেয়। বহুদিন আগে আমাদের বাবাদের সময়, এমন খুনে বেড়া ছিল না, তাদের আর আমাদের মাঝখানে ক্রুগার পার্ক ছিল না, আমাদের নিজেদের রাজার অধীনে একই জাত ছিলাম, আমাদের যে গ্রাম আমরা ছেড়ে এসেছি সেইখান থেকে আরম্ভ করে যেখানে আমরা এসেছি এই জাযগা পর্যন্ত।

এখন যখন এতদিন ধরে আমবা এই তাঁবুতে রয়েছি -- আমার বয়স হচ্ছে

এগারো আর আমার ছোট্ট ভাইটির প্রায় তিন বছর, যদিও সে অত ছোট্ট দেখতে, শুধু যা মাথাটা একটু বড়, ও এখনও ঠিক হয়ে যায়নি — কিছু লোক তাঁবুর চারপাশের ফাঁকা জমিটা খুঁড়ে বীন, ভুট্টা আর বাঁধাকপি রুয়েছে। বুড়ো লোকেরা ডালপালা দিয়ে বেড়া বুনেছে বাগানের চারপাশে লাগাবে বলে। কাজের খোঁজে কাউকে শহরে যেতে দেওয়া হয় না। কিন্তু কিছু কিছু মেয়েরা গ্রামে কাজ পেয়েছে আর সেইজন্য জিনিসপত্র কিনতে পারে। আমাদের দিদিমা বেশ শক্ত সমর্থ বলে, ইঁট আর সিমেন্ট দিয়ে লোকে যেখানে সুন্দর সুন্দর বাড়ি বানাচ্ছে সেখানে কাজ পায় — এই গ্রামের লোকেরা ইঁট আর সিমেন্ট দিয়ে সুন্দর বাড়ি বানায়, আমাদের গ্রামে আমরা যেমন মাটি দিয়ে বানাতাম তেমন নয়। আমাদের দিদিমা এইসব লোকেদের জন্য ইঁট বয়, মাথায় করে ঝুড়ি ভর্তি পাথর নিয়ে আসে। এই করে সে চিনি, চা, দুধ আর সাবান কেনার পয়সা পায়।দোকান থেকে তাকে একটা ক্যালেন্ডার দিয়েছিল সেটা সে আমাদের তাঁবুর কানাচে টাঙিয়ে রেখেছে। আমি স্কুলে বেশ ভালো করি, দোকানের সামনে লোকে যে সব বিজ্ঞাপনের কাগজ ফেলে দেয় সেগুলো সে কুড়িয়ে এনে তাই দিয়ে আমার স্কুলের বইগুলোয় মলাট দেয়। প্রতিদিন বিকেলে, অন্ধকার হবার আগে সে আমাকে আর আমার বড় ভাইকে দিয়ে হোমওয়ার্ক করায় কেন না তাঁবুর মধ্যে আমাদের জায়গাটায় ক্রুগার পার্কের মতো ঘেঁষাঘেঁষি করে শোওয়া ছাড়া আর কিছু করা যায় না। আমাদের দিদিমা গির্জায় যাবার জন্য এখনও পর্যন্ত নিজের জন্য একজোড়া জুতো কিনতে পারেনি। কিন্তু আমার আর আমার বড় ভাইয়ের জন্য স্কুলে পরার কালো জুতো আর সেগুলো পরিষ্কার করার পালিশ কিনে এনেছে। প্রতিদিন সকালে তাঁবুর মধ্যে লোকজন ঘুম থেকে উঠে পড়ে, ছোট বাচ্চারা কান্নাকাটি লাগিয়ে দেয়, বাইরের কলের কাছে লোকে পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করে আর কিছু কিছু ছেলেমেয়ে আগের রাত্রের পরিজ খাওয়া পাত্রগুলোর গায়ে শুকিয়ে থাকা পরিজের ছিঁটেফোটা টেনে টেনে তোলে, আমার বড়ভাই আর আমি আমাদের জুতো সাফ করি। আমাদের দিদিমা মাদুরের ওপর আমাদের পা ছড়িয়ে বসায় আর ঠিকমতো পরিষ্কার করেছি কিনা দেখবার জন্য জুতোগুলো ভালো করে লক্ষ্য করে। তাঁবুর মধ্যে কোন ছেলেমেয়ের স্কুলের জুতো নেই। আমরা তিনজনে যখন জুতোগুলোর দিকে তাকাই তখন মনে হয় যেন আবার সত্যি করেই একটা বাড়িতে আছি। কোনো যুদ্ধ নেই, কোনো চলে যাওয়া নেই।

আমাদের লোকেরা তাঁবুতে রয়েছে তার ছবি তুলতে সাদা চামড়ার কিছু লোক এসেছিল — তারা বলেছিল তারা একটা ফিল্ম তুলছে, আমি যদিও ওটার সম্বন্ধে জানি তবু সেটা যে কি তা আমি কখনো দেখিনি। একজন সাদা চামড়ার মহিলা আমাদের জায়গাটার মধ্যে কোনোরকমে ঠেসেঠুসে ঢুকে এসে আমাদের দিদিমাকে অনেক প্রশ্ন করেছিল, সাদা চামড়ার মহিলাটির ভাষা জানে এমন একজন আমাদের ভাষায় সেগুলো আমাদের বলেছিল, তোমরা কতদিন এইভাবে আছো?

ওকি বলছে এইখানে? আমাদের দিদিমা বলেছিল। এই তাঁবুতে, দু'বছর এক মাস।

ভবিষ্যতের জন্য তুমি কি আশা করো?

কিছুই না। আমি তো এইখানে।

কিন্তু তোমার ছেলেমেয়েদের জন্য?

আমি চাই ওরা শিক্ষা পাক যাতে করে ভালো চাকরি পায় আর পয়সা পায়।

তুমি কি মোজাম্বিকে ফিরে যাবার আশা করো — তোমার নিজের দেশে?

আমি ফিরে যাবো না।

কিন্তু যুদ্ধ যখন থেমে যাবে — তোমাদের তো এখানে থাকতে দেবে না? তুমি ঘরে ফিরে যেতে চাও না?

আমার মনে হয়েছিল আমাদের দিদিমা আর কথা বলতে চায় না। আমার মনে হয়েছিল সে সাদা চামড়ার মহিলাটির কথার উত্তর দেবে না। সাদা চামড়ার মহিলাটি ঘাড় কাত করে আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল।

আমাদের দিদিমা তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলেছিলো — সেখানে কিছু নেই। ঘর নেই।

আমাদের দিদিমা ওকথা বললো কেন? আমি ফিরে যাবো। আমি ক্রুগার পার্কের মধ্যে দিয়ে ফিরে যাবো। 'যুদ্ধের পর, আর কোনো ডাকাত যদি না থাকে, আমাদের মা হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। আর আমরা যখন আমাদেব দাদুকে ফেলে আসি, তখন সে হয়তো শুধু পিছনেই রয়ে গিয়েছিল, কোনো রকমে পথ খুঁজে পেয়েছে, ক্রুগার পার্কের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে, তাহলে সেও তো সেখানে থাকবে। তারা তো বাড়িতেই থাকবে আর আমি তাদের মনে রাখবো।

নাডাইন গর্ডিমার (Nadine Gordimer)-এর (Ultimate Safari) আলটিমেট সাফারী গল্পটির ছায়াবলম্বনে।

মঙ্গলবারের দিবানিদ্রা

গাব্রিয়েল গারসিয়া মারকেজ

কম্পমান বেলে পাথরের সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকে ট্রেনটা বেরিয়ে এসে সুবিন্যস্ত অগণিত কলাবাগানগুলো পেরিয়ে চলতে শুরু করলো, বাতাস হয়ে গেলো সেঁতসেঁতে, সমুদ্রের হাওয়া আর তারা পাচ্ছিল না। কামরার জানলা দিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর ধোঁওয়ার একটা প্রবাহ ভেসে এলো। রেল লাইনের সমান্তরাল একটা সরু রাস্তার ওপর সবুজ সবুজ কলার কাঁদি ভর্তি বলদের সব গাড়ি। রাস্তার ওপাশে অকর্ষিত জমির ওপর ইতঃস্ততভাবে ছাড় দিয়ে দিয়ে তৈরি ইলেকট্রিক পাখা দেওয়া অফিসগুলো, লাল ইঁটের সব ইমারত, ধুলো মাখা তাল গাছ, গোলাপের ঝোপগুলোর মাঝে ছাদের ওপর সাদা রঙের ছোট ছোট টেবিল চেয়ার সাজানো বসতবাড়িগুলো। বেলা তখন এগারোটা, তাপটা তখনও প্রখর হতে শুরু করেনি।

"জানালাটা বন্ধ করো," মহিলাটি বললে। "মাথাটা ঝুল আর কালিতে একেবারে ভর্তি হয়ে যাবে।"

মেয়েটি চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। মরচের জন্য জানলাটা বন্ধ হচ্ছিল না। একটি মাত্র তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তারাই ছিল একমাত্র যাত্রী। জানলার মধ্য দিয়ে ইঞ্জিনের ধোঁয়া ক্রমাগত আসতে থাকায় মেয়েটি তার জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে, তাদের সঙ্গে যে কটি মাত্র জিনিস ছিল : কিছু খাবার ভরা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ আর খবরের কাগজে মোড়া ফুলের একটা তোড়া, সেগুলো নামিয়ে রাখলো। নিজে গিয়ে উলটো দিকের আসনে বসলো তার মার দিকে মুখ করে। তাদের দুজনেরই পরনে অনাড়ম্বর, সস্তা শোকের পোশাক।

মেয়েটির বয়স বারো বছর, এই প্রথমবার সে ট্রেনে চড়লো। মহিলাটির তার মা হওয়ার পক্ষে খুব বেশি বয়স হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল, মহিলাটির চোখে পাতার ওপরের নীল নীল শিরা আর আলখাল্লার মতো করে কাটা পোশাক পরা তার ছোটোখাটো বেঢপ আকৃতির জন্য। আসনের পিঠে তার মেরুদণ্ডটা ভালো করে ঠেকিয়ে, দুহাত দিয়ে তার পেটেন্ট লেদারের ছাল ওঠা হাতব্যাগটা নিজের কোলের ওপর ধরে সে বসেছিল। দারিদ্র্যে অভ্যস্ত এক মানুষের মতোই তার অবিচল ভাব।

বেলা বারোটা নাগাদ তাপ বাড়তে শুরু করলো। জল নেবার উদ্দেশ্যে দশ

মিনিটের জন্য ট্রেনটা থামলো একটা স্টেশনে, সেখানে কোনো শহর ছিল না। বাইরে কলাবাগানগুলোর রহস্যময় নীরবতার মধ্যে, ছায়াগুলোকে পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কামরার মধ্যেকার স্তব্ধ বাতাসে কাঁচা চামড়ার গন্ধ। ট্রেনটা রঙ করা কাঠের বাড়িওয়ালা দুটো ঠিক একই রকমের শহরে থামলো। মহিলাটির মাথা নড়তে লাগলো আর ঘুমে সে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। মেয়েটি তার জুতো খুলে ফেললো। তারপর ফুলের তোড়াটা জলে রাখবে বলে কলঘরে চলে গেলো।

সে যখন আসনে ফিরে এলো তার মা তখন খাবার নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে। মহিলাটি মেয়েটিকে এক টুকরো চীজ, ভুট্টার ছাতু দিয়ে বানানো আধখানা প্যানকেক আর একটা কুকি দিলো আর তার নিজের জন্যও প্লাসটিকের থলে থেকে সমান ভাগ বার করে নিলো। তারা খেতে খেতেই ট্রেনটা খুব মন্থরভাবে একটা লোহার সেতু পার হয়ে আগের শহরগুলোর মতোই আর একটা শহর পেরিয়ে চললো। শুধু এইটুকু মাত্র প্রভেদ যে এ শহরের চকে ছিল মানুষের ভিড়। দারুণ দাবদাহের মধ্যে বাজনাদারদের একটা দল চটুল একটা সুর বাজাচ্ছিল। শহরের অপর প্রান্তে কলাগাছের বাগানগুলো খরায় ফাটল ধরা একটা প্রান্তর পর্যন্ত পৌঁছে থেমে গেছে।

মহিলাটি খাওয়া বন্ধ করলো।

"জুতো পরে নাও," সে বললে।

মেয়েটি বাইরের দিকে তাকালো। জনহীন প্রান্তর ছাড়া কিছু আর দেখতে পেলো না, সেখানে ট্রেনটা আবার গতি বাড়ালো, কিন্তু সে তার কুকির অবশিষ্ট টুকরোটা থলের মধ্যে তুলে রেখে জুতো পরে নিলো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। মহিলাটি তাকে একটি চিরুণী দিলো।

"মাথাটা আঁচড়াও" সে বললে।

ট্রেনের হুইসল বাজতে লাগলো মেয়েটি যখন চুল আঁচড়াচ্ছিল, মহিলাটি মেয়েটির ঘাড়ের ঘাম মুছে আঙুল দিয়ে তার মুখের তেলও পরিষ্কার করে দিলো। মেয়েটি যখন তার চুল আঁচড়ানো শেষ করলো, ট্রেনটা তখন একটা শহরের বাইরের বাড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, আগেকার শহরগুলোর বাড়িঘরের তুলনায় সেগুলো বড় কিন্তু আরো মলিন ও বিষণ্ন দেখতে।

"কিছু করতে চাও তো এখানেই সেরে নাও," মহিলাটি বললো। "পরে তেষ্টায় মরে গেলেও জল কোথাও পাবে না। সব থেকে বড় হলো, কান্নাকাটি করা চলবে না।"

মেয়েটি ঘাড় নাড়লো। এঞ্জিনের হুইসল আর জীর্ণ কামরাগুলোর খটখটানির সঙ্গে সঙ্গে শুকনো জ্বালাধরানো একটা বাতাস ভেসে এলো জানলা দিয়ে। মহিলাটি অবশিষ্ট খাবার সমেত প্লাস্টিকের থলেটা ভাঁজ করে সেটা রাখলো হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে। আগস্ট মাসের সেই উজ্জ্বল মঙ্গলবারে একপলকের জন্য শহরের সম্পূর্ণ ছবিটা জানালার মধ্যে জ্বলজ্বল করে উঠলো। মেয়েটি ফুলগুলো জবজবে ভিজে খবরের কাগজটাতে মুড়ে নিয়ে জানলার থেকে ঈষৎ দূরে সরে গেলো আর তার মার

মুখের দিকে তাকালো। পরিবর্তে সে দেখলো একটা সস্মিত মুখ। হুইসল দিতে দিতে ট্রেনটা গতি মন্থর করলো, এক মুহূর্ত বাদে সেটা থেমে গেলো।

স্টেশনে জনমানব ছিল না। রাস্তার অপর পাশে, বাদামগাছগুলোর ছায়ায় ঢাকা ফুটপাতে, শুধুমাত্র জুয়ার আড্ডা খোলা ছিল। শহর যেন উত্তাপের মধ্যে ভাসছিল। মহিলা আর মেয়েটি ট্রেন থেকে নেমে জনহীন স্টেশনে—যার টালিগুলোর ধার বরাবর ঘাস গজিয়ে উঠে সেগুলো ফাঁক ফাঁক করে দিয়েছিল—সেটা পার হয়ে চলে গেলো রাস্তার ছায়া ঢাকা দিকটায়।

তখন প্রায় দুটো বাজে। সেই সময়, তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে শহর যেন দিবানিদ্রায় মগ্ন। দোকান পাট, শহরের অফিসগুলোর, পাবলিক স্কুল, বেলা এগারোটায় বন্ধ হয়ে যায় আর বিকেল প্রায় চারটের সময়, ট্রেন যখন ফিরে যায়—তার আগে আর খোলে না। শুধুমাত্র স্টেশনের উলটোদিকে তার মদের দোকান আর জুয়ার আড্ডা নিয়ে হোটেল আর চকের একপাশে টেলিগ্রাফ অফিসটা খোলা ছিল। বাড়িগুলো, যার বেশিরভাগই তৈরি কলা কোম্পানির ধাঁচে, সেগুলোর দরজা সব ভিতর থেকে বন্ধ আর খড়খড়ি সব নামানো। তাদের কতকগুলোর ভিতরটা এতই গরম যে তাদের বাসিন্দারা উঠোনে বসে তাদের মধ্যাহ্ন ভোজন সারছিল। অন্যেরা বাদামগাছগুলোর ছায়ায় দেওয়ালের গায়ে চেয়ার হেলিয়ে রাস্তাতেই দিবানিদ্রা দিচ্ছিল।

বাদামগাছগুলোর আশ্রয়দায়ী ছায়ায় ছায়ায়, মহিলাটি আর মেয়েটি শহরের দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত না ঘটিয়েই শহরে প্রবেশ করলো। তারা সোজা চলে গেলো প্যারিস হাউসে (যাজক-পল্লীর বাড়ি)। মহিলাটি তার নখ দিয়ে দরজার লোহার জাফরীতে আঁচড় কাটলো, একটু থেমে আবার আঁচড় কাটলো। ভিতরে একটা ইলেকট্রিক পাখা গুঞ্জন করছিল। তারা পায়ের শব্দ পেলো না। একটা দরজা খোলার মৃদু আওয়াজ প্রায় শোনাই গেলো না আর সঙ্গে সঙ্গে দরজার লোহার জাফরীর ঠিক অপর দিক থেকে একটা সতর্ক কণ্ঠস্বর : "কে ওখানে?" মহিলাটি জাফরীর মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো।

"আমার একজন যাজকের দরকার," মহিলাটি বললে।

"তিনি এখন ঘুমোচ্ছেন।"

"এটা একটা জরুরী ব্যাপার," মহিলাটি জোর দিয়ে বললে।

তার কণ্ঠস্বরে একটা শান্ত, দৃঢ় সংকল্প।

দরাজাটা একটুখানি ফাঁক হলো নিঃশব্দে, আর মোটাসোটা অধিকতর বয়সের এক মহিলার উদয় হলো, গায়ের রঙ তার খুবই ফ্যাকাশে আর চুলের রঙ লোহার মতো। চশমার মোটা কাঁচের মধ্যে দিয়ে তার চোখদুটো খুবই ছোটছোট মনে হচ্ছিল।

"ভিতরে এসো," সে বললে, আর দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিলো।

শুকনো ফুলের গন্ধ ভরপুর একটা ঘরে তারা প্রবেশ করলো। বাড়ির মহিলাটি তাদের একটা কাঠের বেঞ্চের কাছে নিয়ে গিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলো। মেয়েটি বসলো কিন্তু তার মা অন্যমনস্কভাবে দুহাত দিয়ে হাতব্যাগটা আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়েই

রইলো। ইলেকট্রিকের পাখার শব্দের ওপর দিয়ে কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছিল না।

বাড়ির মহিলাটি ঘরের দূরপ্রান্তের দরজায় আবার দেখা দিলো। "উনি তোমাদের তিনটের পরে ঘুরে আসতে বলছেন," খুবই মৃদুস্বরে সে বলেছিল। "মাত্র পাঁচ মিনিট হলো উনি একটু শুয়েছেন।"

"ট্রেনটা ছাড়ে সাড়ে তিনটেয়," মহিলাটি বলেছিল। উত্তর ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত আর আত্মবিশ্বাসে ভরা, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ছিল বেশ স্মিত আর অন্তর্নিহিত নানা ব্যঞ্জনায় পূর্ণ। বাড়ির মহিলাটি এইবার প্রথম একটু হাসলো।

দূরপ্রান্তের দরজা আবার বন্ধ হলো, মহিলাটি তার মেয়ের পাশে বসলো। অপেক্ষা করার খালি ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরটিকে বিভক্তকারী কাঠের রেলিংগুলোর অপরদিকে একটা টেবিল, অয়েল ক্লথে ঢাকা সাধাসিধে একটা টেবিল আর তার ওপর ফুলশুদ্ধ ফুলদানির পাশে একটা মান্ধাতার আমলের টাইপরাইটাব। প্যারিসের (যাজক-পল্লী) কাগজপত্র ছিল তারও ওপাশে। দেখে বোঝা যায় যে অফিসটি দেখাশোনা করে একজন বর্ষিয়সী অবিবাহিতা মহিলা।

দূরপ্রান্তের দরজা খুলে গেলো। এইবার যাজক এসে ঢুকলো, একটা রুমাল দিয়ে তার চশমাটা মুছতে মুছতে। যখন চশমাটা সে চোখে দিলো তখনই স্পষ্ট মনে হলো যে মহিলাটি দরজা খুলে দিয়েছিল তারই সে ভাই।

"তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি আমি?" সে জিজ্ঞাসা করলো।

"কবরখানায় যাবার চাবিগুলো," মহিলাটি বললে।

মেয়েটি বসেছিল ফুলগুলো কোলের ওপর রেখে আর পা দুটো বেঞ্চের নিচে গুটিয়ে। যাজক তার দিকে তাকালো, তারপর মহিলাটির দিকে তাকালো, তারপর তাকালো জানলার জালের মধ্য দিয়ে ঝকঝকে মেঘহীন আকাশের দিকে।

"এই গরমে," সে বললে। "সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতে।"

মহিলাটি নীরবে মাথা নাড়লো। যাজক রেলিঙের অপরদিকে চলে গিয়ে আলমারির থেকে অয়েল ক্লথ মোড়া একটা নোট বই, একটা কাঠের কলমদানি আর একটা দোয়াত বার করে এনে টেবিলে গিয়ে বসলো। তার হাত দুটোয় এত লোম যে তার মাথায় চুলের অভাব খুব বেশি করে পুষিয়ে দিয়েছিল।

"কার কবর তুমি দেখতে যাবে?" সে জিজ্ঞাসা করলে।

"কারলোস সেনটানোর কবর," মহিলাটি বললে।

'কার?"

"কারলোস সেনটানো," মহিলাটি পুনরাবৃত্তি করলে।

যাজক তবুও বুঝতে পারলো না।

"সেই যে সেই চোর, গত সপ্তাহে যাকে মেরে ফেলা হয়েছিল," মহিলাটি সেই একই স্বরে বললে। "আমি তার মা।"

যাজক মহিলাটিকে ভালো করে দেখলো। মহিলাটি তার দিকে শান্ত আত্মসংযমের সঙ্গে তাকালো, ফাদার লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। মাথা নিচু করে সে লিখতে

লাগলো। পাতাটা পূরণ করতে করতে সে মহিলাটিকে বললো তার নিজের পরিচয় দিতে, মহিলাটি বিনা দ্বিধায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সঠিক উত্তর দিয়ে গেলো, যেন সে কোন কিছু থেকে ওগুলো পড়ে যাচ্ছে এমনি ভাবে। ফাদার ঘামতে লাগলো। মেয়েটি বাঁ পায়ের জুতোর বকলশ খুলে জুতো থেকে তার গোড়ালীটা বার করে এনে বেঞ্চের রডের ওপর রাখলো। ডান পাটা নিয়েও তাই করলো সে।

ব্যাপারটার সূচনা হয় গত সপ্তাহের সোমবার, ভোর তিনটার সময় এখান থেকে তিনটা বাড়ির আগে নিঃসঙ্গ এক বিধবা রেবেকা থাকতো নানা টুকিটাকিতে ভরা একটা বাড়িতে, ঝিরঝিরে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে শুনতে পেলো কে যেন বাইরে থেকে সামনের দরজা ভাঙবার চেষ্টা করছে। উঠে পড়লো সে, পুরোনো একটা রিভলবার, কর্ণেল অরেলিয়ানো বুয়েনদিয়ার সময়ের পর আর কেউ যেটা ব্যবহার করেনি, আলমারি ঘেঁটে সেটা সে বার করলো তারপর বাতি না জ্বালিয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলো। দরজার ছিটকানীর কাছের শব্দতে যতনা হোক আটাশ বছরের নিঃসঙ্গতা প্রসূত একটা আতঙ্কের তাড়নায় দিক নির্ণয় করে সে দরাজাটার অবস্থানের জায়গাটা শুধু নয় ছিটকানীর উচ্চতাও ঠিক করে ফেলেছিল। রিভলবারটা দুহাত দিয়ে ধরে সে চোখ বুঁজে ঘোড়া টিপেছিল। তার জীবনে এই প্রথম সে আগ্নেয়াস্ত্র ছোঁড়ে। বিস্ফোরণের ঠিক পরেই সে টিনের ছাতের ওপর বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায়নি। তারপর সে শুনেছিল সিমেন্টের গাড়ি বারান্দায় দুম করে একটা শব্দ আর খুব মৃদু একটা কণ্ঠস্বর, প্রীতিপ্রদ কিন্তু সাঙ্ঘাতিকভাবে শ্রান্ত "ওঃ মাগো।" সকালে বাড়ির সামনে লোকটিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল, তার নাকটা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তার পরনে ছিল রঙিন ডোরাকাটা ফ্লানেলের শার্ট, নিত্য দিনের প্যান্ট, বেল্টের বদলে দড়ি দিয়ে বাঁধা আর নগ্ন পা। শহরে কেউ তাকে চিনতো না।

"তাহলে ওর নাম হলো কারলোস সেনটানো।" ফাদার বিড়বিড় করে বলেছিল তার লেখা শেষ হলে।

"সেনটানো আইয়ালা," মহিলাটি বললে। "ও আমার একমাত্র ছেলে ছিল।"

যাজক আলমারীর কাছে ফিরে এলো। দরজার ভিতর দিকে মরচে ধরা বড় বড় দুটো চাবি ঝুলছিল ; মেয়েটি কল্পনা করছিল, তার মা আর যাজক যেমন তাদের ছোট বেলায় কল্পনা করতো—ওগুলো হলো সেন্ট পিটারের চাবি। যাজক সে দুটো নামিয়ে এনে রেলিঙের ওপরের খোলা নোটবুকটার ওপর রাখলো, মহিলাটির দিকে তাকিয়ে তর্জনী দিয়ে যে পৃষ্ঠায় সে সদ্য লেখা সমাপ্ত করেছে তার একটা জায়গা দেখালো।

"এখানে সই করো।"

মহিলাটি তার নাম লিখলো, হাতব্যাগটা বগলের নিচে চেপে ধরে। মেয়েটি ফুলগুলো তুলে নিয়ে, পা ঘষে ঘষে রেলিঙের কাছে এসে মনযোগ সহকারে তার মাকে লক্ষ্য করতে লাগলো।

যাজক একটা নিঃশ্বাস ফেললো।

"তুমি কি কখনো তাকে সৎপথে ফেরাবার চেষ্টা করোনি?"

সই করা হয়ে গেলে মহিলাটি উত্তর দিলে।

"খুব ভালো লোক ছিল ও।"

যাজক প্রথমে একবার মহিলাটির দিকে তারপর মেয়েটির দিকে তাকালো আর আন্তরিক একটা বিস্ময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করলো যে তারা কান্নাকাটি করবে না। মহিলাটি সেই একই রকম স্বরে বলে চললে.

"আমি ওকে বলেছিলাম ও যেন কখনো কোনো লোকের খাবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস চুরি না করে, আমার কথা সে মনে রেখেছিল। অন্যদিকে আগে সে যখন বক্সিং করতো তখন ঘুষি খেয়ে খেয়ে বেদম হয়ে তিনদিন ধরে সে বিছানায় পড়ে থাকতো।"

'ওর দাঁতগুলো সব তুলে ফেলতে হয়েছিল", বাধা দিয়ে মেয়েটি বললে।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই", মহিলাটি সায় দিলে। "তখন প্রতিটি গ্রাস মুখে দিতাম আর প্রতি শনিবার আমার ছেলে যে মার খেতো তার স্বাদ পেতাম "

"ঈশ্বরের অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয়", ফাদার বললে। কিন্তু কথাটা সে বললো তেমন প্রত্যয়ের সঙ্গে নয়, অংশত অভিজ্ঞতা তাকে কতটা অবিশ্বাসী করেছিল আর অংশত গরমের জন্য। সর্দিগর্মি এড়াবার জন্য সে তাদের মাথা ঢাকা দেবার পরামর্শ দিয়েছিল। হাই তুলতে তুলতে এবার সে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল, কি করে কারলোস সেনটানোর কবর খুজে পাবে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে দিতে। যখন তারা ফিরে আসবে তখন আর তাদের দরজা ধাক্কাতে হবে না। তারা যেন চাবিটা দরজার নিচে দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়; আর যদি পারে তবে তারা যেন সেইখানেই গির্জার জন্য কিছু উৎসর্গ করে যায়। মহিলাটি খুব মনোযোগ দিয়ে তার নির্দেশগুলো শুনলো কিন্তু তাকে ধন্যবাদ দেবার সময় তার মুখে হাসি ছিল না।

রাস্তার দিকের দরজা খোলার আগেই ফাদার লক্ষ্য করলো কে যেন ভিতরে উঁকি মারছে, তার নাকটা লোহার জাফরীতে ঠেকিয়ে। বাইরে এক দঙ্গল বাচ্ছা। দরজা পুরোপুরি খুলতেই বাচ্ছারা পালিয়ে গেলো। সাধারণত এই সময় রাস্তায় কেউ থাকে না। এখন আর শুধু বাচ্ছারা নয়। বাদাম গাছগুলোর নিচে এখন দলবদ্ধ লোকের জটলা। ফাদার উত্তাপে ভাসমান রাস্তাটা লক্ষ্য করলে তারপর বুঝতে পারলো। নিঃশব্দে সে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

মহিলাটির দিকে না তাকিয়েই সে বললে "একটু দাঁড়াও।"

তার বোন নিজের রাত্রির পোশাকের ওপর কালো একটা জ্যাকেট পরে, চুল এলো করে দূর প্রান্তের দরজায় এসে দাঁড়ালো। নীরবে সে ফাদারের দিকে তাকালো।

"ব্যাপার কি?" ফাদার জিজ্ঞাসা করলো।

"লোকে জানতে পেরেছে," বিড়বিড় করে বললে তার বোন।

"তুমি বরং উঠোনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও," ফাদার বললে।

"সেখানেও সেই একই ব্যাপার," তার বোন বললে। "সকলেই তাদের জানলায় দাঁড়িয়ে আছে।"

মহিলাটি মনে হলো তখনও পর্যন্ত ঠিক বুঝতে পারেনি। লোহার জাফরীর মধ্যে দিয়ে সে রাস্তার দিকে দেখবার চেষ্টা করলো। তারপর মেয়েটির কাছ থেকে ফুলের তোড়াটা নিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে চললো। মেয়েটি তার পিছু নিলো।

"সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করো," ফাদার বললে।

"তোমরা গরমে গলে যাবে," তার বোন বললে ঘরের দূর প্রান্তে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে। "একটু দাঁড়াও একটা ছাতা এনে দিই।"

"ধন্যবাদ," মহিলাটি উত্তর দিলে। "আমরা এই ঠিক আছি।"

সে মেয়েটির হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়ে গেলো।

যুদ্ধ

রচনা : লুইজি পিরানদেল্লো

রাত্রের ট্রেনে যে সব যাত্রীরা রোম ছাড়তো, ফাব্রিয়ানা স্টেশনে তাদের ভোর পর্যন্ত থাকতে হতো তারপর সালমোনার মেল লাইন ধরবার জন্য হেরকালের ছোট্ট একটা লোকাল ট্রেনে করে তাদের যেতে হতো। দমবন্ধ করা, ধোঁয়া ভবা একটা সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি, ইতিমধ্যেই পাঁচজন লোক যার মধ্যে রাত কাটিয়েছে, ভোরবেলায় সেটাতে গভীর শোকের পোশাকপরা প্রায় বেঢপ একটা বস্তার মতো এক মহিলাকে টেনে তোলা হলো। তার পিছনে হাঁফাতে হাঁফাতে, কাতরাতে কাতরাতে উঠে এসেছিল তার স্বামী — ছোট্ট এতটুকু এক লোক। রোগাটে আর নিস্তেজ, মুখ তার মড়ার মতো ফ্যাকাশে, চোখগুলো ছোট ছোট আর চকচকে, তাঁকে কেমন যেন সলজ্জ আর অস্থির দেখাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত একটা সীটে বসে পড়ে সে, যে সব যাত্রীরা তার স্ত্রীকে টেনে তুলতে সাহায্য করেছিল আর তার স্ত্রীর জন্য জায়গা করে দিয়েছিল তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছিল। তারপর মহিলাটির দিকে ফিরে তার স্ত্রীর কোটের কলারটা নামাবার চেষ্টা করেছিল, আর সৌজন্য দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ

"হ্যাগো তুমি ঠিক আছো তো?"

স্ত্রী উত্তর দেবার পরিবর্তে নিজের মুখ লুকোবার জন্য কলাবটা আবার চোখ পর্যন্ত টেনে তুলেছিল।

"জগতটা হলো খুবই খারাপ জায়গা", করুণ হাসি হেসে স্বামীটি বিড়বিড় করে বলেছিল।

তার মনে হয়েছিল তার সহযাত্রীদের কাছে ব্যাপারটা খুলে বলা তার কর্তব্য। বেচারা মহিলাটিকে করুণা করা উচিত কেন না, যুদ্ধ তার কাছ থেকে তার একমাত্র ছেলেকে কেড়ে নিচ্ছে, বিশ বছরের এক ছেলে যার জন্য তারা দু'জনে তাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছে। এমনকি রোমে যেখানে তাকে ছাত্র হিসাবে যেতে হয়েছিল সেখানে তার কাছে যাবার জন্য তারা সালমোনাতে তাদের নিজেদের সংসার ভেঙে দিয়েছে, তারপর তাকে যুদ্ধে স্বেচ্ছা সৈনিক হিসাবে যোগ দিতে দিয়েছিল এই কড়ারে যে অন্তত ছ'মাস তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে না কিন্তু এখন হঠাৎ একটা তার

পেয়েছে যাতে বলা হয়েছে তিনদিনের মধ্যে ছেলেকে যেতে হবে আর তাদের বলা হয়েছে তারা যেন তাকে বিদায় জানায়।

মহিলাটি তার বিরাট কোটটার নিচে মোচড় খাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে বন্য একটা জন্তুর মতো গজরাচ্ছিল, বেশ নিশ্চিতভাবেই মহিলাটির মনে হচ্ছিল এইসব ব্যাখ্যায় ঐ সব লোকেদের মনে সহানুভূতির লেশমাত্র জাগবে না — তারাও খুব সম্ভব —তারই মতো অবস্থায় রয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে একজন যে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, বলে উঠেছিল :

"তোমার ছেলে যে মাত্র এখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে এর জন্য ভগবানকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আমারটাকে তো যুদ্ধের প্রথম দিনই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে দুবার সে জখম হয়ে ফিরে এসেছে আর আবারও তাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফেরত পাঠানো হয়েছে।"

"আর আমার? আমার দুই ছেলে আর তিন ভাইপো যুদ্ধ ক্ষেত্রে আছে", অন্য একজন যাত্রী বলেছিল।

"তা হতে পারে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে ও হলো আমাদের একমাত্র ছেলে," স্বামীটি অযাচিতভাবে বলেছিল। "তাতে আর তফাৎ কি হতে পারে? তুমি তোমার একমাত্র ছেলেকে অত্যধিক আদর দিয়ে নষ্ট করতে পারো, কিন্তু তোমার অন্য আরও সন্তান থাকলে তাদের সকলের থেকে তুমি তো আর তাকে আরও বেশি ভালোবাসতে পারো না। বাপের ভালোবাসা তো আর একটি রুটির মতো নয় যে সেটা টুকরো টুকরো করে সন্তানদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে পারা যায়। একজন বাপ তার ভালোবাসা কোন তারতম্য না করেই তার প্রত্যেকটি সন্তানকে দেয়, সে একজনই হোক আর দশজনই হোক, আর আমি এখন দুই ছেলের জন্য যে কষ্ট পাচ্ছি, সেটা তো আর তাদের প্রত্যেকের জন্য অর্ধেক করে পাচ্ছি না, বরং দ্বিগুণ কষ্ট পাচ্ছি ....।"

"ঠিক ..... ঠিক ....." অপ্রতিভ স্বামীটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, "কিন্তু ধরো (আমরা সকলেই অবশ্য আশা করছি তোমার ক্ষেত্রে তা হবে না) এক বাপ যার দুই ছেলে আছে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদের একজনকে যদি সে হারায়, তাহলেও তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য একজন থাকবে .... সেখানে ..."

"হ্যাঁ", অন্যজন উত্তর দিয়েছিল, রেগে গিয়ে, "সান্ত্বনা দেবার জন্য একছেলে অবশিষ্ট রইলো বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সেই ছেলের জন্য তাকে বাঁচতেই হবে, সেখানে একটি মাত্র ছেলের বাপ হওয়ার ক্ষেত্রে ছেলে মারা গেলেও বাপও মরতে পারে আর তার দুঃখের অবসান ঘটাতে পারে। এই অবস্থায় কোনটা বেশি খারাপ? তুমি বুঝতে পারছো না আমার অবস্থা তোমার অবস্থার থেকে আরও খারাপ কেন?"

"বাজে কথা", বাধা দিয়ে আর একজন যাত্রী বলে উঠেছিল, মোটাসোটা, লালমুখ একটি লোক, হালকা ধূসর রঙের চোখ দুটো তার রক্তবর্ণ।

সে হাঁফাচ্ছিল। তার ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো থেকে মনে হচ্ছিল অদম্য

জীবনীশক্তির অন্তর্নিহিত প্রচণ্ডতা যেন ফুটে বেরুচ্ছে, তার অশক্ত শরীর যেটা প্রায় ধরে রাখতে পারছিল না।

"বাজে কথা", সে আবার বলেছিল তার সামনের ভাঙা দাঁত দুটো লুকোবার চেষ্টায় মুখে হাত চাপা দিয়ে। "বাজে কথা। আমাদের উপকারে আসবে বলে কি আমরা আমাদের সন্তানদের জন্ম দিই?"

অন্য যাত্রীরা বেদনার্তভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই যার ছেলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে গিয়েছিল সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। "তুমি ঠিকই বলেছো। আমাদের সন্তানরা তো আমাদের নয়। তারা দেশের " ও সব হলো ফাঁকা কথা", মোটাসোটা লোকটি পালটা উত্তর দিয়েছিল "আমরা যখন আমাদের সন্তানদের জীবন দিই তখন কি আমরা দেশের কথা ভাবি? আমাদের সন্তানরা জন্মায় কেননা ... তাদের জন্মাতে হবে বলে আর তারা যখন জন্মায় তখন আমাদের জীবনগুলোও নিয়ে নেয়। এটাই হলো সত্য। আমরা তাদের, কিন্তু তারা কখনোই আমাদের নয়। আর তারা যখন বিশ বছর বয়সে পৌঁছায় তখন হয়ে যায় আমরা ঐ বয়সে যেমনটি ছিলাম ঠিক সেই রকম। আমাদেরও বাপ ছিল, মা ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক কিছুও ছিল — মেয়েরা, সিগারেট, মোহ, নতুন নতুন বন্ধন ... আর অবশ্য দেশ, আমাদের যখন বিশ বছর বয়স তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিতাম - এমন কি আমাদের বাপ মার নিষেধও সত্ত্বেও। এখন আমাদের এই বয়সেও দেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসা খুবই প্রবল কিন্তু তার থেকেও জোরালো হলো আমাদের সন্তানদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা। আমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে পারলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার ছেলের জায়গা নিতো না?"

চারিদিকে নীরবতা বিরাজ করছিল, সকলেই যেন সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ছিল।

"তাহলে কেন — "মোটা লোকটি বলে চলেছিল, "আমাদের সন্তানদের যখন বিশ বছর বয়স হবে তখন তাদের অনুভূতির কথা আমরা বিবেচনা করবো না? এটা কি স্বাভাবিক নয় যে তাদের ঐ বয়সে তারা আমাদের প্রতি ভালোবাসার থেকে দেশের প্রতি ভালোবাসাকে আরও অনেক বেশি বড় বলে মনে করবে (আমি অবশ্য ভালো ছেলেদের কথা বলছি)? তেমনটি যে হবে এটাই তো স্বাভাবিক, কেননা, তারা তো আমাদের দেখবে বুড়ো মতো করে যারা আর নড়তে চড়তে পারে না তাই ঘরেই থাকে, তাই নয় কি? দেশ যদি রুটির মতো প্রকৃতিদত্ত প্রয়োজনীয় একটা জিনিস হয় আমরা যাতে উপোষ করে না মরি তার জন্য যেটা থেকে আমাদের প্রত্যেককে খেতে হবে, তাহলে তাকে রক্ষা করার জন্য কাউকে যেতে হবে। আর আমাদের ছেলেদের যখন বিশ বছর বয়স হয় তখন তারা যায়, আর তারা চোখের জল চায় না, কেননা তারা যদি মারাও যায়, মারা যায় উদ্দীপিত হয়ে, পরমসুখে (আমি অবশ্য ভালো ছেলেদের কথা বলছি)। এখন যদি কেউ অল্প বয়সে সন্তুষ্ট মনে মারাও যায়, জীবনের কুৎসিত দিকগুলোর মধ্যে দিয়ে না গিয়ে, তার এক ঘেয়েমি, নীচতা, মোহভঙ্গের তিক্ততা ভোগ না করে তাহলে এর থেকে বেশি কি আর আমরা তার

জন্য চাইতে পারি ? প্রত্যেকেরই উচিত কান্নাকাটি বন্ধ করা ; প্রত্যেকের হাসা উচিত এই আমি যেমন করেছি ··· কিংবা অন্তত ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া — এই আমি যেমন করছি — কেন না আমার ছেলে মরার আগে আমাকে খবর পাঠিয়েছিল তাতে সে বলেছিল তার আকাঙ্ক্ষা মতো সব থেকে ভালোভাবে তার জীবনের সমাপ্তি ঘটাতে পেরে সন্তুষ্ট। সেই জন্যই তোমরা দেখছো আমি এমনকি শোকের পোশাকও পরিনি ····।"

সেটা দেখাবার জন্য সে তার হালকা বাদামী রঙের কোটটা ধরে নেড়েছিল, তার ভাঙা দাঁতের ওপরে তার বিবর্ণ ঠোঁটটা কাঁপছিল, তার চোখ দুটো জলে ভরা, স্থির, আর একটু ক্ষণ পরেই তীক্ষ্ণ উঁচু গলায় সে হেসে উঠেছিল যেটা আবার কান্নাও হতে পারতো।

"বটেই তো ····· বটেই তো ····" অন্যেরা সায় দিয়েছিল।

মহিলাটি, এতক্ষণ যে তার কোটের নিচেয় গুড়িসুড়ি মেরে একটা কোনায় বসেছিল, বসেছিল আর শুনছিল — কেননা গত তিন মাস ধরে — তার এই গভীর দুঃখে সে তার স্বামী আর তার বন্ধুবান্ধবদের কথাবার্তার মধ্যে থেকে সান্ত্বনা পাবার মতো কিছু একটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছিল, এমন একটা কিছু যা তাকে দেখাতে পারতো কি করে একজন মা তার ছেলেকে এমন কি মৃত্যুর মুখেও নয়, সম্ভবত একটা বিপদজনক অবস্থার মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়াটা মেনে নিতে পারে। অথচ যতসব কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে একটা কথাও সে খুঁজে পায়নি ··· তার দুঃখ আরও বেশি হয়েছিল এই দেখে যে এমন কেউ নেই, অন্তত তার যা মনে হয়েছিল, সে তার সমব্যথী হতে পারে।

কিন্তু এখন যাত্রীটির কথাগুলো তাকে বিস্মিত করেছিল তাকে প্রায হত চেতন করেছিল। হঠাৎ সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল অন্যেরা যে ভুল করে ছিল তা নয়, অন্যেরা যে তাকে বুঝতে পারতো না তা নয় সে নিজেই ঐসব বাপ মা যারা চোখের জল না ফেলে তাদের ছেলেদের শুধুমাত্র যুদ্ধে যাওয়াই নয় এমন কি তাদের মৃত্যু পর্যন্ত চোখের জল না ফেলে মেনে নিতে ইচ্ছুক ছিল তাদের সেই উঁচু পর্যায়ে সে উঠতে পারেনি।

সে মাথা তুলেছিল, নিজের কোনা থেকে ঝুঁকে পড়ে সে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেছিল মোটা লোকটি যখন তার সহযাত্রীদের কাছে সবিস্তারে বলছিল তার রাজা আর দেশের জন্য তার ছেলে কেমন করে কোনো অনুতাপ ছাড়াই, খুশি মনে প্রাণ দিয়েছে। মহিলাটির মনে হয়েছিল সে যেন হোঁচট খেয়ে একটা জগতে পড়েছে যে জগতের কথা সে কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি, একটা জগত যেটা তার কাছে এতদিন অজানা ছিল, আর সাহসী ঐ বাপকে যে এমন নির্বিকার ভাবে নিজের সন্তানের মৃত্যুর কথা বলতে পারে তাকে সকলে একসঙ্গে অভিনন্দিত করছে শুনে সে খুশি হয়েছিল।

তারপর হঠাৎ কি বলা হয়েছে তার কিছুই যেন সে শোনেনি আব সদ্য যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে সে বৃদ্ধটির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছিল :

"তাহলে — তোমার ছেলে কি সত্যিই মরে গেছে?"

সকলে তার দিকে তাকিয়েছিল। বৃদ্ধটিও তার দিকে তাকাবার জন্য ফিরছিল, তার বড় বড় ঠেলে বেরিয়ে আসা, অপ্রীতিকর জলভরা হালকা ছাই রঙের চোখ দুটো তার মুখের ওপর রেখেছিল। কিছুক্ষণ ধরে সে উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মুখে কোনো কথা আসেনি। মহিলাটির দিকে সে তাকিয়েই ছিল আর তাকিয়েই ছিল, প্রায় তখনই যেন — ঐ মূর্খের মতো বেখাপ্পা প্রশ্নে — সে হঠাৎ উপলব্ধি করেছিল যে তার ছেলে সত্যিই মরে গেছে — চিরদিনের মতো চলে গেছে — চিরদিনের মতো। তার মুখটা কুঁচকে গিয়েছিল, বিশ্রীভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তারপর তাড়াতাড়ি করে সে তার পকেট থেকে একটা রুমাল টেনে বার করেছিল, তারপর সকলের বিস্ময় জাগিয়ে সে যন্ত্রণাদায়ক, মর্মান্তিক, অদম্য কান্নায় ফেটে পড়েছিল।

নতুন যুগ, নতুন প্রথা

রচনা : কু ইউ

ছেলেমেয়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনের ভাব লক্ষ্য করে ওয়াং-এর মা আর মেয়ের বাপ তাদের বিয়ের ব্যাপারে কোনো আপত্তি তুললো না। ওযাং বেশ বলিষ্ঠ চমৎকার ছেলে, জেলা শাসন বিভাগে কাজ করবার জন্য তৈরি হচ্ছে। ফান ফেং-ল্যানকে সবাই জানে শক্ত সমর্থ, দক্ষ খেত কর্মী বলে। কৃষকরা সকলে তাদের দুজনকে বেশ পছন্দই করে। তাদের ধারণা দুজনে মিলেছে ভালো।

পৃথক পৃথক দুই গ্রামে দুজনের বাস, তবে এক গ্রাম থেকে অন্যটাতে যেতে হলে ছোট্ট একটা নদী পার হতে হয় মাত্র। বাগদত্ত অবস্থায ফেং-ল্যানকে দেখতে আসার জন্য ওয়াং সবসময় কোনো না কোনো ছুতো একটা খুঁজে বার করতোই। তাই অচিরেই ওর ঘন ঘন আসা নিয়ে দু'গ্রামের বুড়োরা কথা বলাবলি শুরু করে দিলো।

"বাগদত্ত অবস্থায় এমনিভাবে সবসময় দুজনে একসঙ্গে হওয়া", তারা বলাবলি করতে লাগলো, "বড্ড বেশি রকমের 'আধুনিক' হয়ে যাচ্ছে।"

বিয়ের ক'দিন আগের থেকেই ফেং-ল্যান-এর বাপ হিসেব করতে বসতো, মেয়ের বিয়ের যৌতুকের টাকার ব্যবস্থা করতে কত ফসল তাকে বিক্রি করতে হবে। একদিন খুব ভোরে ফসল ভর্তি ক'টা থলি নিয়ে তার তিন চাকাওয়ালা ঠেলাটার মধ্যে তুলে, সেগুলো বেশ ভালো করে বাঁধলো সে। ঠিক করলো, জল খাবার খেয়ে ফসলগুলো বাজারে বিক্রি করে সেই টাকায় ফেং-ল্যান-এর জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনবে। যাবার জন্য যখন তৈরি তখন মেয়ে এসে তাকে আটকালো।

"বাবা", সে বললো, "কি করছ তুমি? এবছর এই সামান্য কটা ফসল বাঁচাতে কি কষ্টই না আমাদের করতে হয়েছে। গ্রামে সভা করে সকলে মিলে কি ঠিক করা হয়নি যে গম কাটার আগে পর্যন্ত প্রত্যেকে পাঁচ "তু" করে ফসল হাতে রাখবে?"

ঠেলাটাকে নামিয়ে রেখে তার বাপ পাইপে তামাক ভরতে লাগলো।

"যবে তোমার খাটবার ক্ষমতা হয়েছে তবে থেকে তুমি আমাদের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছো। তোমার প্রতি আমি অন্যায় করতে চাই না, ফেং-ল্যান। নিঃশব্দে খানিকক্ষণ পাইপ টানতে লাগলো সে, তারপর আবার বলে চললো। "ভাবছিলাম

তোমাকে চার প্রস্থ পোশাক দেবো—দু'প্রস্থ ভালো সুতি কাপড়ের, দু'প্রস্থ ছিটের কাপড়ের; দু'একটা দরকারি আসবাবপত্র, একটা কেটলি, কয়েকটা বাটি, একটা আয়না, মুখে মাখবার পাউডার খানিকটা, এমনি টুকিটাকি কয়েকটা জিনিসপত্র। তুমি কি বলো? ঐ ধরনের জিনিসপত্র কি তুমি চাও না?"

ফেং-ল্যান হাসতে হাসতে ঠেলা থেকে থলেগুলো নামাতে লাগলো, এদিকে তার বাপ তার দিকে তাকিয়ে রইলো, অবাক হয়ে।

"ওয়াং কি বলেছিল তা কি তোমার মনে নেই, বাবা? সে জিজ্ঞাসা করলো। ও আমাদের একটা পয়সাও খরচ না করতে বলেছিল। আমি কি ওর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে গিয়ে থাকবো না? মুক্তাঞ্চলগুলোয় কি এমন কোনো পরিবার আছে যাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই? বাড়তি চেয়ার টেবিলে আমাদের প্রয়োজন কি? লাঙল দিতে বা ফসল বুনতে সেগুলো আমাদের কোনো সাহায্য করবে না। আর ছিটের কাপড়ের পোশাকের কথা বলছো—সেগুলো পরবার সুযোগ পাবো কোথায়? এখন তো আর আগের মতো নেই যে বিয়ের পর তিনটি বছর পার না হলে নতুন বউ খেতে কাজ করতে পারবে না? ওয়াং-এর পরিবারের লোক হয়ে গেলে তাদের খেতের কাজে আমাদের সাহায্য করতে হবে। মুখে পাউডার দেবার সময় পাবো না! ওয়াং একজন ক্যাডার, একজন সরকারী কর্মী সে। এসব কখনই সমর্থন করবে না সে, আর তাছাড়া ওসব আমিও চাই না!"

বাপ চিন্তিতভাবে ভুরু কুঁচকে, মাথা হেঁট করে উঠোনের সিঁড়ির একটা ধাপের ওপর বসে পড়লো, আর ফেং-ল্যান গিয়ে ফসল ভর্তি থলিগুলো গোলা ঘরে তুলে রাখলো। সে ফিরে এলে তার বাপ বললো, ফসল যদি আমরা বিক্রি না-ই করি তবে এসো বাচ্চা বলদটাকে বিক্রি করে দিই। লাঙল টানার জন্য দুটো বলদ আমাদের দরকার নেই।

"বাচ্চা বলদটাকে বিক্রি না করার সেইটাই তো সব থেকে বড় কারণ।" ফেং-ল্যান উত্তর দিলো। "ওর জন্মের থেকে আমিই ওকে বড় করে তুলেছি। এখন বছরখানেকের মতো ওর বয়স, শীগগিরই আমরা ওকে কাজে লাগাতে পারবো। তুমি ওকে বিক্রি করবে কি করে? ওয়াং-এর বলদ নেই। লাঙল দেবার সময় তোমার কাছে ছাড়া আর কার কাছ থেকে বলদ ধার করতে যাবো আমি?"

মেয়ের এসব যুক্তি তর্কের উত্তর কি দেবে বাপ তা খুঁজে পেলো না। মনে মনে ওর ভয় হচ্ছিল যে সব কৃষকরা তখনও পর্যন্ত সাবেকী প্রথা মেনে চলে তারা না ওকে ঠাট্টা করে, কিন্তু অন্য কোনো উপায় সে খুঁজে পেলো না।

বিয়ের দিন, মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াং-এর মা উঠে পড়েছে। রুষ্টভাবে জামাকাপড় পরে ছেলে যে ঘরে ঘুমোচ্ছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলো। বিয়ের পর ওটাই হবে নতুন বউয়ের ঘর আর বিয়ের আগে ওখানেই যৌতুকের আর উপহারের জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখার কথা। "উঠে পড়!" চিৎকার করে ছেলেকে ডেকে দিলো সে। "তুই ঘুমোতে পারছিস কি করে? দেখে মনে হচ্ছে বাড়িতে যেন কেউ মরেছে,

সারা রাত জেগে যেন মড়া পাহারা দেওয়া হয়েছে!" রাগে একেবারে ফুঁসতে ফুঁসতে সে ছেলের পাশে কাঙ*এর ওপর ধপ করে বসে পড়লো।

ওয়াং আধ ঘুমন্ত অবস্থায় চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলো। "এখনো ভোর হয়নি, মা," সে হাই তুলতে তুলতে বললো। "এত ভোরে উঠে কি করছো তুমি" ?

কি করে ঘুমোবো বল! তোকেই জিজ্ঞাসা করি — বাড়ির চেহারা দেখে কি মনে হচ্ছে এটা একটা বিয়ে বাড়ি?

"বাড়ির সামনে কনে আনবার ডুলি নেই বলে? আহঃ! মা আজকালকার দিনে ওটা আর কেউ ব্যবহার করে না। আজকের দিনে আরও বেশি করে খেটে কি করে আরও বেশি করে ফসল তোলা যায় তাই নিয়েই সকলে ব্যস্ত। ডুলি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আজ আর কোথায়! তাছাড়া আমি একজন ক্যাডার। কৃষকরাই যদি ওসব জিনিস আর না চায় তবে আমি এখনও কেমন করে ঐসব সামন্ততান্ত্রিক জঞ্জাল চাইতে যাবো?

"কি বলছিস কি, তুই! তোর মার মাথাটা তো আর এলম গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি নয়!" ভীষণ রেগে কাঙের ওপরে পাতা মাদুর চাপড়ে সে উত্তর দিলো। "বউ ডুলি চেপে এলো কিনা তাতে তো আমার ভারী বয়েই গেলো। আমার মাথায় যেটা ঢুকছে না সেটা হচ্ছে এই যে, বউয়ের বাড়ির লোক, তাদের অবস্থা তো বেশ ভালো, একটা সামান্য জিনিষও তারা পাঠালো না কেন? আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমার একটা তোরঙ্গ কেনার জন্য আমার ঠাকুমা তার ঘটিটা বাটিটা পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছিল…।" রাগে বুড়ির গলা বুজে এলো।

ছেলে তাকে শান্ত করবার সাধ্যমত চেষ্টা করলো। "মা আমাদের এখানে দুর্ভিক্ষ হয়নি ঠিকই, কিন্তু অন্য অনেক জায়গায় দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়েছে, আমাদের উচিত তাদের সাহায্য করা। আমাদের প্রত্যেককে ফসল বাঁচাতে হয়েছে। ফেঙ-ল্যান এর যৌতুকের জন্য ওর বাবা যদি ফসল বিক্রি করে তাহলে বসন্তকালে ওরা করবে কী?"

ওর একটা কথাও মা শুনলো বলে মনে হলো না। আপন মনে খানিকক্ষণ গজগজ করে আবার চীৎকার করে উঠলো :

"চমৎকার ব্যাপার!" ও তড়বড় করে বলে চললো, "এত কিপ্টে হাত দিয়ে একফোঁটা জলও গলে না। দুপুরে গাঁয়ের মেয়েরা সব আসবে যৌতুকের জিনিসপত্র দেখতে আমার মুখ একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে যাবে! গরিবের ঘর থেকে এসেছি বটে কিন্তু এমনি ধারা ব্যাপার কখনও দেখিনি।"

"এ হচ্ছে নতুন যুগ," ওয়াং উত্তর দিলো। সেকেলে সব আচার অনুষ্ঠানের কথা বার বার তুলছো কেন? আমাদের নিজেদের একটা বলদ পর্যন্ত নেই। ফেং ল্যান যদি বড় বড় দুটো লাল তোরঙ্গ সঙ্গে নিয়ে আসে তবে সে দুটো কি আমাদের লাঙল টানতে পারবে, না ফসল বুনতে পারবে" ?

---

*উত্তর চীনে ইঁটের তৈরি উঁচু পাটাতনের মতো শোবার জায়গা। শীতকালে বাড়ির বাইরে থেকে ওটা গরম রাখবার ব্যবস্থা করা হয়।

"তুই শুধু জমি চাষের কথাই বলিস"! মার মতের বদল হলো না, জিদ ধরে চিৎকার করে উঠলো, "তুই কি মনে করিস আমার জীবনের অর্ধেকটা কাটিয়েছি জমি কি চায় সেটা না বুঝেই? জমির জন্য আমাদের খাটতে হবে, ঠিকই। কিন্তু তাহলে আমাদের মান মর্যাদা বাড়াতে হবে! এই ধরনের বৃহৎ ব্যাপার জীবনে তো একবারই হয়।"

ইতিমধ্যে বেশ আলো ফুটে গেছে। ওয়াং হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় পরে নিলো। "মা", সে বললো। "আজকের দিনে উৎপাদন-শ্রমই মানুষের সব থেকে বেশি মর্যাদা বাড়ায়! এখন আর আগের মতো নেই। পরে যখন আমাদের সকলের অবস্থা ভালো হবে, তখন যদি আমরা চাই তাহলে ফেং-ল্যান এর বাবা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দিতে পারবে—আমাদের ভালো জিনিস কিনে দেবার পক্ষে এত কিছু দেরি হয়ে যাবে না তখন।" "দূর বোকা"! ব্যঙ্গ করে বুড়ী বলে উঠলো, "একবার বউ এ বাড়িতে এসে গেলে তুই মনে করছিস ও মেয়েকে আর কিছু কিনে দেবে?" "আমি মেয়েকে বিয়ে করছি", অসহিষ্ণু ভাবে উত্তর করলো ওয়াং, "ওর যৌতুককে নয়!" মা একেবারে মর্মাহত হয়ে গেলো, "তোদের বিয়ে নিয়ে তোরা থাক, আমাকে বাদ দে।" উত্তপ্ত ভাবে সে বলল। "একটা দিন আমি তোর দিদিমার ওখানেই থাকবো অখন!"

সবেগে দরজা দিয়ে বেরুতেই, একেবারে জোরে গ্রামের মোড়ল চু এর সঙ্গে ধাক্কা খেলো, চু তখন সবে দরজায় ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল। বিয়ের অনুষ্ঠান হবে যে সভা ঘরে তার দেওয়ালে কতকগুলো অভিনন্দন পত্র টাঙাতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু অর্ধেক পথ যেতেই কানে এলো মা ছেলের বচসার উচ্চরব, কাছে এগিয়ে আসতেই বুড়ীর সঙ্গে লাগলো ধাক্কা। হাঁফাতে হাঁফাতে মুখ রক্তবর্ণ করে বুড়ী মোড়লের কাছে সবিস্তারে তার অভিযোগগুলো খুলে বললো।

"ব্যাপারটা তুমি ভুলভাবে দেখছো", চু সান্ত্বনার স্বরে বললো তারপর মুচকি হেসে আরও বললো, "উদাহরণ দিচ্ছি তার; ধরো দুটি কনে রয়েছে — একজনের রয়েছে তোরঙ্গ ভর্তি ভর্তি উপহার আর বিছানাপত্র, কিন্তু সে কাজকর্ম কিছু জানে না, আর একজন যে সে তার কর্মকুশল হাত দুখানি ছাড়া আর কিছুই আনতে পারবে না — এদের মধ্যে থেকে কোন মেয়েটিকে তুমি বেছে নেবে?"

এবার শান্ত হয়ে হেসে মা বললো : গাঁয়ের লোকেরা যারা বেশি খাটিয়ে তাদেরই সব সময় চায়। এ ধরনের প্রশ্ন করে কি লাভ?"

সকালের জলখাবার সারা হলে বিয়ের ঘরটা খুব চমৎকার করে সাজানো হলো। দেওয়াল গুলোয় শুভেচ্ছাব বাণী দেওয়া লম্বা লম্বা কাগজের ফালি ঝোলানো হলো, মাঝখানে ঝোলানো হলো চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর ছবি। জেলাশাসন বিভাগের পক্ষ থেকে পাঠানো উপহারগুলো এসে পৌছে গিয়েছিল। কৃষকরা এসে এমন ভীড় করে দাঁড়িয়েছে যে ঘরে আর এক ফোঁটা জল ধরারও জায়গা নেই। মেয়ে পুরুষ, ছেলে বুড়ো সকলেই খুশি মনে গল্প গুজব করছে।

এক বুড়ী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর জিজ্ঞাসা করছে, "এখনও পর্যন্ত কনেকে দেখছি না কেন ? ডুলি করে তাকে আনছে না নিশ্চয়ই ? ভালোই করেছে। আমার বিয়ের সময় ডুলি করে আসতে আমার মাথা ঘুরছিল ! শুধু যে একগাদা খরচ তা নয় ওটাতে চড়ে আমার কষ্ট ও হয়েছিল খুব ! এই ব্যবস্থাই ভালো। পয়সাও বাঁচে আর কাজটাও উচিত মতো হয়।"

আর এক বাচাল বুড়ী ওয়াং-এর মার কাছে দৌড়ে গেল, "কনের যৌতুক সাজাবার ব্যবস্থা করেছো কোথায় ?" সে জিজ্ঞাসা করলো।

মা একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। কিছু বলবার জন্য মুখ খুললো কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কথাও বার হলো না। তাই এমন ভাব করলো যে যেন কথাটা শুনতেই পায়নি, তারপর থেকে সমানে প্রশ্নকর্ত্রীকে এড়িয়ে চলতে লাগলো।

গ্রাম্য প্রথামত বাপকে ছাড়াই ফেং-ল্যান এসে হাজির হলো, সে এসে পৌছাতেই বাজনাদারের দল বাজনা শুরু দিলো। গ্রামের মোড়ল চু উঠে দাঁড়িয়ে ফেং-ল্যানকে অভ্যর্থনা জানালো, বিয়ের অনুষ্ঠানের পৌরহিত্যও করবে সে, লোকজন একেবারে মৌমাছির ঝাঁকের মতো তাকে ছেঁকে ধরলো। গ্রামের মহিলা সমিতির চেয়ারম্যান গাদাগাদা অতিথিদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে অনেক কষ্টে কোনো রকমে ফেং ল্যানকে বার করে নিয়ে এলো।

কনের পরনে সাধারণ নীল কাপড়ের কোর্তা আর তারই সঙ্গে মিল করা পাতলুন ; মাথায় সে কৃষকদের চিরাচরিত ছিটের কাপড় জড়িয়েছে। ওয়াং এর পাশে গিয়ে বসলো সে, চোখদুটো তার আনন্দে ঝলমল করছে। অতিথিরা ঠেলাঠেলি করে গলা বাড়িয়ে দিলো তাকে ভালো করে দেখবে বলে, উপস্থিত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাততালি দিতে লাগলো।

এখন সব শান্ত হও, বন্ধুগণ ! চু চীৎকার করে বললো, "এবারে আমরা কাজ আরও করছি। প্রথমেই বলতে চাই ওয়াং আর ফেং-ল্যান তাদের নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় পরস্পরকে বেছে নিয়েছে। ওরা দুজনে একসাথে কাজ করতে করতে পরস্পরের কাজের দক্ষতায় খুবই চমৎকৃত হয়। তারপর পরস্পর পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায় তখন ঠিক করে বিয়ে করবে। খেতের কাজে ফেং-ল্যান যে কি রকম পটু তা তোমরা সকলেই জান। যে আমাদের সরকারের ব্যয় সংকোচন ও বর্ধিত কৃষি উৎপাদনের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাই সে নির্বোধের মতো যৌতুকের জন্য অর্থ ব্যয় করেনি……।"

"কনে এখন আমাদের বলুক কি করে প্রেমে পড়লো তারা", বাধা দিয়ে অল্প বয়সী এক কৃষক চীৎকার করে বললো, "অভিনয় করে আমাদের দেখিয়ে দিক সে !" অন্য অতিথিরা হাসতে হাসতে তার সঙ্গে চিৎকারে যোগ দিলো।

এইরূপ আনন্দ কোলাহলের মধ্যে কালো গোঁফওয়ালা বছর চল্লিশের একজন লোক এসে উঠোনে হাজির হলো, সঙ্গে তার একটা বলদ। লোকটি হচ্ছে ফেং-ল্যানদের গ্রামের মোড়ল লো, বর এগিয়ে এলো তাকে অভ্যর্থনা করতে।

"বলদটাকে সঙ্গে এনেছো কি জন্যে?" ওয়াং জিজ্ঞাসা করলো।

"ও হচ্ছে ফেং-ল্যানের যৌতুক," একটু হেসে লো উত্তর দিলো। তারপর ওয়াং-এর মাকে ডেকে বললো, "এধারে এসো একবার দেখো কনের বাবা কি উপহার পাঠিয়েছে!"

বুড়ী একেবারে দৌড়ে এলো উঠোনে। মসৃণ, মোটাসোটা বাচ্চা একটা বলদ নিয়ে একজন অপরিচিত লোককে দেখে ব্যাপাটা ঠিক আঁচ করতে পারলো না সে।

"এই বলদটা ছিল ফেং-ল্যানদের", লো খুলে বললো। "এখন যখন ওয়াংকে বিয়ে করছে তখন সে তোমাদেরই সঙ্গে থাকবে, তোমাদেরই সঙ্গে কাজ করবে। ওর বাপ জানে তোমাদের বলদ নেই, আর বলদ ছাড়া খেত চষা খুবই কষ্টকর। তাই এই বলদটাকে সে পাঠিয়েছে যৌতুক হিসেবে।"

ওয়াং এর মার গরু বলদ কোন দিনও ছিল না, এখন সে কুণ্ঠিতভাবে হাত বাড়ালো বলদটার মাথায় বোলাবে বলে। বলদটা নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগলো। ওর গায়ের কোঁকড়া কোঁকড়া লোমগুলো বাদামী রঙের কিন্তু বুকটা একেবারে সাদা। ওকে দেখে বেশ বোঝাই গেল যে এই বাচ্চা সুন্দর বলদটা কি রকম তাগড়া হবে, কত কাজ দেবে।

নিছক আনন্দে বুড়ী তার দন্তহীন মুখ ব্যাদন করে হাসতে লাগল। হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর চিন্তা তার মাথায় এলো।

"আমার ছেলেতো তার নিজের খেতে কাজ করে না, আর আমিও নিজে কখনও গোরু বলদ পালিনি", সে চিন্তিতভাবে বললো। "এই বলদ নিয়ে তো মহাঝঞ্ঝাটে পড়বো!"

কৃষকরা সব হেসে উঠলো, চু বললো, "আনন্দের চোটে তোমার মাথাই খারাপ হয়ে গেছে দেখছি! তোমার বৌমাটি যে একজন আদর্শকর্মী তা কি তুমি ভুলে গেছো?"

"ফেং-ল্যান তো নিজের হাতে এই বলদটাকে পেলেছে", লো বললো।

কিছু কিছু মাতব্বর লোক বলদটাকে ঘিরে জড়ো হলো ওকে ভালো করে দেখবে বলে। তারা ওর মুখের ভেতরটা দেখলো, ওর খুরগুলো পরীক্ষা করে দেখলো, ওর কোঁকড়া কোঁকড়া লোমে ভরা পিঠে হাত বোলালো। সবাই এক বাক্যে উপহারের বলদটা অনুমোদন করলো।

বছর খানেকের এই বলদটাকে যে মেয়েটি বড় করে তুলেছে কৃষকরা তাকেও প্রশংসা করতে ভুললো না। "আদর্শ কর্মী যেমন তেমনি কাজও করে আদর্শভাবে।" তারা মন্তব্য করলো।

"আমরা, এই গ্রামের অধিবাসীরা আমাদের মধ্যে এমন একজন দক্ষ কর্মীকে পাওয়াটা খুব সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করতে পারি", মহিলা সমিতিব চেয়ারম্যান কিছু কিছু সভ্যকে বললো।

এবার আমরা আন্তরিকভাবে উৎসাহের সঙ্গে উৎপাদনের কাজে লেগে পড়তে পারবো।"

"এই ধরনের যৌতুকের কথা কখনও চিন্তা করিনি কেন?" মেয়েদের মধ্যে একজন ভাবতে লাগলো।

" আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন যে সব জিনিস পত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম সেগুলো এত অসার, এত অকেজো। এর মতো এমন সজীব উপহার — যা ভালো কাজে লাগবে, তার সঙ্গে সেগুলোর কোনো তুলনাই করা যায় না।"

এই রকম আনন্দ উৎসবের মধ্যে অতিথিরা ওযাং এর মাকে ধরলো কিছু বলার জন্য। "তোমার পরিবারে একজন লোক বাড়লো", ওরা হেসে বললো।

"এই আনন্দের দিনে তোমাকে কিছু বলতে হবে।"

বুড়ি যাতে তাব ছেলেবৌয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে তার জন্য তারা তাকে পথ করে দিলো।

আনন্দ উদ্ভাসিত মুখে মা একবার ওয়াং একবার ফেং-ল্যান আর চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ানো বন্ধু বান্ধবদের দিকে তাকাতে লাগলো তার মনটা ক্রমশ হালকা হয়ে যেতে লাগলো। শেষকালে সে বলল : "যদিও মনটা আমার সেকেলে তবু এখন আমি কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করেছি। আজকের নতুন যুগে আমাদের রীতি নীতিও নতুন হওয়া উচিত ....".।

হাসি ও প্রচণ্ডরবের মধ্যে দিয়ে তার কথা-গুলোকে অনুমোদন করলো সবাই।

সেই থেকে লোকে এই নতুন ধরনের বিয়ের কথা বলাবলি করছে।

Kuyu "New times' New, methods" গল্পটির বঙ্গানুবাদ।

কুটিরে

রচনা : ওয়াণ্ডা ওয়াসিলেস্কা

'ঠাকুমা! বলি ও ঠাকুমা!'

আনিসিয়া চোখ তুলে তাকালো। বেড়ার ও ধার থেকে নাতালকা তাকে ডাকছে।

'কি হলো?'

"এক মিনিটের জন্যে একটু ভেতরে আসতে পারি কি?'

"তোমার ভেতরে আসতে না পারার কোনো কারণ তো দেখছি না। আসতে চাও তো এসো!" আনিসিয়া অস্পষ্টভাবে বিড় বিড় করে তাব স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষতার সঙ্গে বললো।

আঃ, রৌদ্রটা আজ কি চমৎকার গরম! অবশেষে তার আড়ষ্ট বেদনা জর্জরিত হাড় পাঁজরাগুলো একটু উত্তাপ পাবে। জুলাইয়ের মঙ্গলময় করুণাময় সূর্য! শুধু যদি বৃষ্টি না পড়ে আর। শুধুমাত্র তার সম্ভাবনার কথাতেই আগের থেকেই তার দুশ্চিন্তা আরম্ভ হয়ে গেলো। বৃষ্টি — না, তার থেকে খারাপ আর কিছু নেই। সে সময় তার প্রত্যেকটি হাড়-পাঁজরা ব্যথা করে, যন্ত্রণায় ঝনঝন করে, গাঁটগুলো সব ফুলে যায়, এক পা চলাও তখন কষ্টকর হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন রৌদ্র ঝক্‌ঝক্ করে বিশেষ করে এখন যেমন করছে — তখন সব কিছু একেবারে অন্য রকম হযে যায়। জুলাইয়ের করুণাময় সূর্য তার সোনালী কিরণ দিয়ে স্নেহভরে পৃথিবীকে স্পর্শ করে।

'ঠাকুমা!'

'আবার কি হলো'?

'আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছো?'

'কেন শুনতে পাবো না ···। তোমার কথা নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছি', আনিসিয়া নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলো। "ঐ মেয়েটা সব সময় লুকিয়ে লুকিয়ে একটা না একটা কিছু করছেই ···। এই বুড়ো মানুষটাকে ওরা একটু শান্তিতে বিশ্রাম করতে দেয় না কেন? এখন মানুষ জীবন থেকে আর কিছুই চায় না, চায় শুধু একটু শান্তি, শুধু একটু শান্তি, পথে অপেক্ষমান মৃত্যু, তাকে নিয়ে যাবার আগের ঘণ্টাগুলো কোনোরকমে শুধু কাটিয়ে যাওয়া" এইগুলোই তার মনে আসছিল।

'ঠাকুমা', নাতালকা ছাড়লো না, লেগেই রইলো "আমার দিকে তাকাও তো!'

'অনিচ্ছাভরে বৃদ্ধা তার ভারী ভারী চোখের পাতা দুটো তুললো। তার বিবর্ণ চোখদুটো মনে হচ্ছিল যেন পাতলা একটা আবরণে ঢাকা, সেই চোখ দিয়ে সে সঙ্কীর্ণভাবে মেয়েটির দিকে তাকালো।

'ঠাকুমা, জার্মানরা আসছে।'

আনিসিয়া নির্লিপ্তভাবে কাঁধ ঝাঁকালো। পর পর বেশ কয়েকদিন ধরে এই গুজবই সে শুনে আসছে। ওরা আসছে, ওরা আসছে কি? বেশ তো, ওদের আসতে দাও। জার্মানরা অন্তত তার মতো অস্থিচর্মসার বৃদ্ধাকে শান্তিতে মরতে দেবে। আসুক না ওরা তাতে ওর কি? জার্মানরা — কথাটাই তার কাছে কেমন যেন খুব একটা দূরের ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল আর তার কাছে ঐ কথাটার সত্যই কোনো অর্থ ছিল না। তার কাছে যেটা সত্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা হলো রোদ পোহানো আর তার বেদনা জর্জরিত হাড় পাঁজরাগুলোর মধ্য দিয়ে উষ্ণতার সুখকর সঞ্চার অনুভব করা। জার্মানরা — অল্প বয়সী লোকেরা জার্মানদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা করুক …। তার মতো এক বৃদ্ধার আর তাতে কি ইতর বিশেষ হতে পারে …।

'ঠাকুমা, আমরা জঙ্গলের মধ্যে চলে যাচ্ছি।'

'বেশ তো, যেতে চাও তো যাও না কেন', আনিসিয়া বিড়বিড় করে বললো। 'তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? … আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি না।'

নাতালকা অধৈর্যভরে তার হাতটা ধরলো।

'অমন কোরো না …। লাগছে …। এখন বলো কি …।'

'ঠাকুমা, ঠাকুমা, এখন এক মিনিট আমার কথাগুলো শোনো।'

'শুনছি তো …।'

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ পাচ্ছি, কি বলছো?'

'ঠাকুমা আমরা জঙ্গলের মধ্যে চলে যাচ্ছি। বাবা যাচ্ছে, আমি যাচ্ছি, আর অন্যরাও সকলে যাচ্ছে!'

'বেশ তো, যাও না তাহলে …। জার্মানরা আসছে …, আসছে কি? … তাহলে তো, নিশ্চযই তোমাদের জঙ্গলের মধ্যে চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু আমি এখানেই থাকবো আর রোদ পোহাবো …।'

'ঠাকুমা, আমাদের বাগানে দু'জন লাল সেনাবাহিনীর লোক রয়েছে।'

'দু'জন কি?'

'দু'জন লাল সেনাবাহিনীর লোক। কি বলছি বুঝতে পারছো?'

'হ্যাঁ …। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? …'

মেয়েটি হতাশ হয়ে বৃদ্ধার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিলো।

'ঠাকুমা, তুমি আবার ঘুমিয়ে পড়ছো। লক্ষ্মীটি, একটু জেগে থাকার চেষ্টা করো।'

'মোটেই আমি ঘুমিয়ে পড়ছি না। … আমার ঝিমুনি আসছে, এই আর কি …'।

'ঠাকুমা, আমার কথা শুনছো? আমাদের বাগানে দু'জন লাল সৈনিক রয়েছে, প্লাম গাছগুলোর কাছে আমাদের সেই চালাটার মধ্যে।'

"বেশ তো, তাতে হলো কি? তাদের মধ্যে কাউকে কি তোমার মনে ধরেছে?"

নাতালকা হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। উবু হয়ে বসে পড়ে সে বিবর্ণ, ঘোলাটে বার্ধক্যগ্রস্ত চোখ দুটোব দিকে তাকিয়ে প্রতিটি কথার ওপর যথাসম্ভব জোর দিয়ে উঁচুগলায় বৃদ্ধাকে সবিস্তারে বললো।

'ঠাকুমা, আমাদের বাগানে দু'জন লাল সেনাবাহিনীর লোক রয়েছে। তারা জখম হয়েছে। তাদেব আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো না। তারা এত অসুস্থ যে, তাদের নাড়াচাড়া করা যাবে না। বুঝেছো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি ···। তাদের তো তাহলে বাইরে এই রোদে থাকা উচিত ···।'

'কিন্তু ঠাকুমা, তাদের যে খুব বেশি রকম চোট লেগেছে, আমার কথা তুমি বুঝতে পারছো? আমরা সবাই জঙ্গলে পালিয়ে যাচ্ছি। জার্মানরা এখন যে কোনো মুহূর্তে এখানে এসে পড়বে ···। ঠাকুমা, কাউকে গিয়ে তাদের একটু জল খাওযাতে হবে, একটু দেখাশোনা করতে হবে, বুঝতে পারছো?'

'এর মধ্যে বোঝবার বিশেষ কিছু নেই, আছে কি?'

'তুমি কি এটা করতে পারবে?'

'কেন পারবো না? যতক্ষণ পর্যন্ত রোদ থাকবে আর হাড়পাঁজরাগুলো ঝনঝন টনটন করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ঠিক চালিযে নিতে পারবো।'

'আমাদের চালাটা কোথায় তা ভুলে যাওনি তো?

'না, একেবারেই না ···।'

'তাহলে ওদের একটু দেখাশোনা করবে তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ওদের একটু দেখাশোনা কববো ···।'

'কিন্তু সাবধান, জার্মানরা যেন কিছু টের না পায় ···।'

'ওরা কিছুই টের পাবে না ···। একটা বুড়ির ওপর ওরা নজর রাখতে যাবে কি জন্যে? আর আমিও এধার ওধার ঘুরতে ঘুরতে চেষ্টা করবে ঐ প্লামগাছগুলোর ধার ঘেঁসে ঘেঁসে গাছগুলো পেরিয়ে যেতে ···।'

'তুমি ভুলে যাবে না তো, ঠাকুমা?'

'ভুলে যাবো কেন ···। দুজন বললে, তাই না ···।

'ওদের জলের দরকার হবে, ওদের বিছানা ঝেড়ে দেবার জন্যে কাউকে দরকার হবে, অমনি আরো অনেক কিছু ···। বোধ হয় খাবারেরও। সেটা তো আন্দাজই করা যায় ···।'

মেয়েটি একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠাকুমা। এখন ওরা মোটে কিছু খেতেই পারছে না, বেচারারা ···। কিন্তু দু'একদিনের মধ্যে হয়তো ওরা একটু ভালো বোধ করতে আরম্ভ করবে ··· তখন।'

'আমি যা পারি করবো ···। ওদের কিছু রুটি আর অন্য কিছু খাবারও এনে দেবো ···। আমি ওদের দেখা শোনা করবো।'

'তুমি কখন যাবে' ?

'এখন একবার যাবো আর পরে একবার গিয়ে দেখে আসবো …। কিছু ভেবো না সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে …।'

'তুমি ভুলে যাবে না তো ?'

বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো।

'ডেঁপোমি কোরো না। মনে রেখো, আনিসিয়া, ঠাকুমা একবার যদি কোনো কথা দেয়, তাহলে সে কথা সে রাখে। এত চিন্তা করছো কেন ? ভাবছো আনিসিয়া ঠাকুমা তো বুড়ি থুত্থুড়ি হয়ে গেছে আর এমনিই এখন কাজের বার হয়ে গেছে ? মোটেই না …। যতক্ষণ রোদ থাকবে ততক্ষণ আমিও কিছু করতে পারবো …।

নাতালকা বৃদ্ধার কম্পিত, বলিপড়া হাতটা থাবড়ালো।

'বেশ, তাহলে চললাম ঠাকুমা ….। আমরা যে খুব শিগ্‌গিরই আবার গ্রামে ফিরে আসবো এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত … কিন্তু আপাতত আমাদের সরে থাকতেই হবে। জঙ্গলের ভেতর থেকে আমরা ওদের খোঁচাতে থাকবো।'

'সেই ভালো', বৃদ্ধা বিড়বিড় করে বললো। 'জঙ্গলের ভেতর থেকে …। কিচ্ছু ভেবো না, ফিরে এসো, ওদের বহাল তবিয়তে দেখতে পাবে …। তোমার ঐ ছেলেদের কথা আমি ভুলবো না …।'

বেড়ার ওধার থেকে একটা কণ্ঠস্বর ডাক দিলো।

"নাতালকা! কোথায় তুমি ? নাতালকা!"

তার অনাবৃত পা সূর্যের আলোয় ঝলক দিয়ে চলে গেলো। আনিসিয়া মাথা নাড়লো।

"ঠিক একটা চনমনে ছাগল ছানার মতো। তারপর, বৃদ্ধা, এবার তো একবার ওদের দু'জনকে দেখতে যেতে হয় …।"

বহুকষ্টে, কোনো রকমে সে উঠে দাঁড়ালো। উঠে দাঁড়াতে হলে সর্বদাই তাকে বহু চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু একবার পিঠটা সোজা করতে পারলে ব্যথা জর্জরিত পা দুটো তাকে বয়ে নিয়ে যেতে। তার লাঠির ওপর খুব বেশি করে ভর দিয়ে সে বাগানের মধ্যে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সূর্যের প্রখর আলোয় তার প্রায় অন্ধ চোখ দিয়ে সে পরিচিত পথগুলো খুঁজতে লাগলো। তাদের প্রত্যেকটাকে সে চোখবাঁধা অবস্থাতেও খুঁজে পেতো। এখানেই সে বাস করেছে, এই জমিতেই— কত বছর ধরে ? নব্বই ? একানব্বই ? …

"নাঃ, কত বছর তা আর আমার মনে নেই। বছরগুলো সব গোলমাল হয়ে গেছে। কত কত বছরই যে দেখলাম …।"

ঘুরতে ঘুরতে সে তার প্রতিবেশীর বাগানে ঢুকলো। সূর্যমুখী আর শনের সারিগুলো পার হয়ে রাসপ্‌বেরীর ঝোপগুলো পেরিয়ে নিভৃত এক কোণায় প্লামগাছগুলো বড় হয়ে উঠেছে। চালাটা — নেহাৎই ছোট, খড় দিয়ে ছাওয়া আর একরাশ ডালপালার নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রবেশপথ খুঁজে পেতে তাকে চারপাশে হাতড়ে বেড়াতে হলো।

"প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না …। এমনভাবে ঢাকা দিয়েছে যে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার বললেই হয় …।"

খানিকটা খড়ের ওপর আহত লোকদুটি শুয়েছিল। বৃদ্ধা হাঁটু গেড়ে বসে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালো।

"হায় ভগবান, এরা তো দেখছি নেহাৎই ছেলেমানুষ সব …।"

ওদের মধ্যে থেকে একজন লোক, জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্নের মতো পড়েছিল যে, জেগে উঠে তার ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথাটা তুললো।

'কে ওখানে?' সে চিৎকার করে উঠলো।

"স! স! … আনিসিয়া ঠাকুমা তোমাদের দেখতে এসেছে …। তোমরা চুপটি করে শুয়ে আরাম করো…।"

"জল …!"

"জল? … নিশ্চয়, তোমাদের জন্যে জল নিয়ে আসছি, বাছা। তোমাদের যা যা দরকার সব আমি এনে দেবো …।"

এত শক্তি যে কোথা থেকে পেলো আনিসিয়া তা নিজেই বুঝতে পারছিল না। তার পা দুটোর টনটনে ব্যথা চলে গেলো …। ব্যথার কথা সে একেবারে ভুলেই গেলো। কুয়ো থেকে খানিকটা জল টেনে তুলে একটা পাত্র ভর্তি করলো তারপর ফিরে গেলো বাগানে, প্লামগাছগুলোর ওধারে সেই চালায়।

"এই নাও একটু জল খাও, একটু জল খাও তো বাছা …। খুব ভালো জল, চমৎকার আর ঠান্ডা, আমাদের নিজেদের কুয়োর জল। এই নাও একটু জল খাও …। এ একেবারে সত্যিকারের জীবনদায়িনী জল, এমনি যে সে সাধারণ জল নয়।"

দ্বিতীয় আহত লোকটি প্রবল জ্বরে ছটফট করছিল।

বৃদ্ধা এক টুকরো নেকড়া ভিজিয়ে তার কপালে লাগিয়ে দিলো।

"তাহলে বুড়ো এহাড় ক'খানা দিয়ে এখনও কিছু কাজ হয় …। আর নাতালকা—কিভাবে চেপে ধরেছিল আমাকে, কি ভাবেই না চেপে ধরেছিল …। এতে বোঝাবার কি আছে? একটা অসুস্থ লোকের যে খাবার জল দরকার একথা কে না জানে … আর তুমি, তুমি বাবা, শুধু চুপচাপ শুয়ে আরাম করো …দু'একটা দিন চুপচাপ করে থাকো তাহলে দেখবে অনেক ভালো বোধ করছো …।"

জলের পাত্রটা আহত লোকদুটোর কাছে নামিয়ে রেখে সে আস্তে আস্তে পা ঘষে ঘষে নিজের কুটিরে ফিরে গেলো। ফিরে এসেই, সে চৌকাঠের ওপর বসে ঝিমোতে লাগলো, সারাদিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত হয়ে। তার ঘুমের মধ্যেই সে অনুভব করছিল নিদ্রালু অলস মাছিদের ভনভনানি, সূর্যের উত্তাপ আর সেই উত্তাপে তার সর্বাঙ্গ ছেয়ে যাওয়ার পরম সুখ। সন্ধ্যাবেলাকার বাতাসের শীতলতা তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলো। বেশ কষ্ট করেই সে টলতে টলতে আহত লোক দু'টির কাছে গেলো, তারপর আবার ফিরে এলো তার নিজের কুটিরে।

"যাক এতক্ষণে দিনটা শেষ হলো …। আর কালও দিনটা বেশ পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে থাকবে।"

পরেরদিন সকালে তিনজন লোক এসে তার উঠোনে প্রবেশ করলো। আনিসিয়া ঠাকুমা কিন্তু তাদের দেখে একটুও ভয় পেলো না। জার্মানদের সে কি পরোয়া করে? হয় তো আর কয়েকটা দিন মাত্র, তারপর মৃত্যু আসবে তাকে নিতে, যে মৃত্যু আসতে পথে এত দেরি করেছে।

সে বেশ অবিচলিত ভাবে অপেক্ষা করে রইলো। অচেনা এক ভাষার কর্কশ কতগুলো শব্দ তার কানে আসছিল। করুক ওরা বক্‌বক্‌ তাতে তার কি আসে যায়···। তবু, ওদের একটা কথাও সে বুঝতে পারছিল না।

বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করে ওরা চিৎকার করতে লাগলো, কিন্তু বৃদ্ধা শুধু অমায়িকভাবে হেসে যাচ্ছিল, ওরা কেমন তা খুঁটিয়ে দেখার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল সে। হ্যাঁ, ওরা মাত্র তিনজন, তিন ডেঁপো ছোকরা, তার প্রতিবেশীর বাগানের নিভৃতে এক কোনার চালায় শায়িত ঐ দু'জনের থেকে বয়সে কোনো মতেই বড় হবে না। এই সময় হঠাৎ তার মাথায় এক চিন্তা ঢুকলো — জগে যথেষ্ট জল আছে তো? শুধু এরা যদি চলে যায় তাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিয়ে; ঐ দু'জনকে দেখাশোনা করার সময় হয়ে গেছে ···। হ্যাঁ, সেটা সে গোপনেই করবে, গোপনেই করবে, আর কেউ তাকে লক্ষ্যই করবে না ···। বুড়ো এক মানুষ, নড়ে চড়েই যে বেড়াতে পারে না, তার ওপর আবার নজর রাখবে কে!

ওরা বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করে চিৎকার করেই চললো, শেষকালে চলে গেলো ওরা। আনিসিয়া ভাবলো ব্যাপারটার ওখানেই নিষ্পত্তি হলো, কিন্তু কোনো রকমে চৌকাঠ থেকে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তার উঠোনটা জার্মান সৈন্যয় একেবারে ভরে গেলো।

'এটা কি তোমার কুটির?'

সূর্যের আলো থেকে চোখ আড়াল করার জন্য সে হাত তুললো। কে যেন ইউক্রানীয় ভাষায় — তার মাতৃভাষায় কথা বলছিল, শুধু কথাগুলো বলছিল কেমন যেন কর্কশ স্বরে, ভাঙাগলায়। লোকটা যা বললো তা সবই সে বুঝতে পারলো। কিন্তু তার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না।

সেনাধিকারিকটি কিন্তু নাছোড়বান্দা।

'বলো, এটা কি তোমার কুটির?'

'আমার ···। কেন?'

সেনাধিকারিকরা নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করতে লাগলো। তারা রৌদ্র আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল বলে আনিসিয়ার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। সে ক্রুদ্ধভাবে নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজ করলো।

'ওটা কি?'

'কিছু না ···। ও কিছু নয় ···।'

'দরজাটা খোলো!'

'কেন, দরজাটা তো খোলাই আছে,' আনিসিয়া সবিস্ময়ে বললো।

'তোমাকে যখন খুলতে বলা হয়েছে তখন দরজাটা খোল', চিৎকার করে দোভাষী তাকে বললো।

আস্তে আস্তে অনেক গোঙানি আর কাতরানির পর বহু কষ্টে সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর তার লাঠির ওপর বেশি করে ভর দিয়ে তার কুটিরে প্রবেশ করলো। সেনাধিকারিকরা তার পিছু পিছু ভিড় করে চললো।

'নেহাৎই ছোট আর বুকচাপা', নাক মুখ সিঁটকে কর্নেল বললো।

'জানলাটা খোলা যেতে পারে,' অধীনস্থ এক সেনাধিকারিক ত্রস্তে সামনে এগিয়ে গিয়ে ছোট জানলাটায় ঠেলা মারলো। সকালের শিশিরে তখনও পর্যন্ত তাজা আর শীতল, ছায়ায় ঢাকা বাগানের ওপর জানালাটা সবেগে খুলে যাওয়ায়, জানলার শার্সিগুলো ঝনঝন করে উঠলো।

'ওকে জিজ্ঞাসা করো গ্রামের লোকেরা সব কোথায়', কর্নেল আদেশ করলো।

আনিসিয়া যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই রইলো, তার লাঠির ওপর ভর দিয়ে সে নীরবে বিদেশীদের খুঁটিয়ে দেখছিল।

'আমি তার কি জানি ?' দোভাষীর প্রশ্নের উত্তরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বললো। 'আমি বুড়ো মানুষ, বাইরে খুব কমই যাই।'

'এখানে কি তুমি একলা থাকো ?'

'হ্যাঁ, একেবারে একলা ···। প্রায় বছর দশেক হলো একলা আছি ···।'

তারা আর তাকে বিরক্ত করলো না। বেঞ্চি আর খাটের ওপর নিজেদের বাড়ির মতো করে বেশ আরামে বসে তারা কি একটা নিয়ে জোর গলায় আলোচনা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই রইলো তারপর পা ঘষে ঘষে দরজার দিকে গেলো। একটা ভারী হাত এসে পড়লো তার কাঁধের ওপর আর তাকে ভেতর দিকে টেনে নিয়ে গেলো। সে বুঝলো ওরা তাকে কুটির থেকে বার হতে দেবে না। কর্নেল দোভাষীর সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে কি যেন আলোচনা করলো।

'ওর ওপর নজর রাখো। বুড়ো হতে পারে, চোখে দেখতে না পারে, কিন্তু নষ্টামি যে ও করতে পারে তা এক ভগবানই জানে ···। তোমরা কিছু বোঝার আগেই ও হয়তো আমরা যে এখানে এসে গেছি এই খবরটাই কাউকে না কাউকে জানিয়ে দেবে। আমার হুকুম হচ্ছে ওকে কুটিরের বাইরে যেতে দেবে না, এক মুহূর্তের জন্যও ওকে চোখের আড়াল করবে না, এক মুহূর্তের জন্যও না ···।'

দোভাষী যখন তাকে খুলে বললো যে তাকে সব সময় কুটিরের মধ্যেই থাকতে হবে তখন আনিসিয়া সায় দিয়ে বার কয়েক মাথা নাড়লো। তার আর তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি হবে ? ··· তাকে যখন কুটিরের মধ্যে থাকবার হুকুম দেওয়া হয়েছে তখন সে কুটিরের মধ্যেই থাকবে।

চার হাত পায়ে সে স্টোভের (ঘর গরম ও রান্না করার উনান বিশেষ) চ্যাটালো মাথাটার ওপর বহুকষ্টে উঠলো, সেখানেই তার শোবার জায়গা, তারপর ঘুমিয়ে পড়লো। ঘরের মধ্যে জার্মানরা জোর গলায় কথা বলছিল, টেবিলের ওপর ম্যাপগুলো

সাজিয়ে রাখছিল, ঝগড়া করছিল, শিষ দিচ্ছিল, তাদের বড় বড় পেরেক আঁটা বুটগুলোর আঘাতে ঘরের মেঝে রমরম করছিল। তাতে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। সে ঝিমোচ্ছিল। মাছিরা তাদের অবিরাম ভনভনানি লাগিয়েই রেখেছিল, দরজাগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছিল, সৈন্যরা সমানে আসা যাওয়া করছিল। এসব কিছু তার কাছে পৌঁছাচ্ছিল যেন একটা ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে, তার সর্বাঙ্গ যেন বার্ধক্যজনিত জড়তায় আচ্ছন্ন হয়েছিল।

কিন্তু সন্ধ্যার দিকে সে অস্থির হয়ে উঠলো। প্লামগাছগুলোর নিচের লুকোনো চালার সেই পাত্রে হয়তো এক বিন্দুও জল অবশিষ্ট নেই। ছেলে দুটো নিঃসন্দেহে, আনিসিয়া ঠাকুমার জন্য অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করছে। এখানে যা ঘটছে সেটা তো তাদের জানার কথা নয়। তাদের যেটা সব থেকে সম্ভাব্য বলে মনে হবে সেটা হলো বৃদ্ধা তাদের কথা ভুলে গেছে, বৃদ্ধা এত অলস যে নড়তেই চায় না ···।

এবার সে পুরোপুরি জেগে উঠলো আর ঘরের মধ্যে কি ঘটছে তা বেশ ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলো। জার্মান সৈন্যে ঘরটা একেবারে ভর্তি। দরজা ঘিরে তারা ভিড় জমিয়েছে, আর দেখতে পেলো দালানেও তারা এধার ওধার পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। প্রবেশ পথের মুখে একজন রক্ষী দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। না, অলক্ষিতে বেরিয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। গোঙাতে গোঙাতে চার হাত পায়ে সে স্টোভের ওপর থেকে নেমে এলো।

"কোথায় যাচ্ছো তুমি?"

দোভাষী হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে এসে উদয় হলো।

বৃদ্ধা ক্রুদ্ধভাবে তার লাঠি দিয়ে দো-ভাষীর হাতটা সরিয়ে দিলো।

"খুব হয়েছে, ওটা চলবে না ···। কখনো না কখনো আমাকে বাইরে যেতেই হবে। বুঝেছো সেটা?'

দোভাষী সরে দাঁড়ালো কিন্তু বাইরে গিয়ে বৃদ্ধা দেখে সে তার পিছু নিয়েছে। ঔদাসীন্য দেখিয়ে বৃদ্ধা কাঁধ ঝাঁকালো।

'সত্যি, কি আর বলবো! জার্মানরা একটা বুড়িকে কি না ভয় পায়, বোঝ একবার ···। বাইরের দিক থেকে যদিও আমি বুড়ো হয়ে গেছি, তবু এখনও আমি কিছু করতে পারি। বেশ তো, আমার ওপর নজর রাখো, রাখো আমার ওপর নজর ···।'

সে কুটিরে ফিরে গেলো, ফিরে গেলো তার স্টোভের ওপরের জায়গায়। ঐ দু'জনের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিল সে। ওদের চিন্তা তার মনের মধ্যে পাথরের মত ভারী হয়ে চেপে বসেছিল।

'এখন নাতালকা থাকলে, হয় তো কোনো রকমে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারতো ···। আর আমি, আমার এই বুড়ো শরীর নিয়ে ···। কি করতে পারি আমি, বাছারা, দরকার মতো আমাকে যদি বাইরেই না যেতে দেয়, সব সময় কেউ না কেউ যদি পিছু পিছু যায় আমি না জানি একটা কি এমনি ভাবে। আমি এখন কি করবো? আমার এখন কি করা উচিত?

দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে অনেকক্ষণ ধরে সে বিছানায় এ পাশ ও পাশ করতে লাগলো।

অবশেষে, যখন সে ঘুমিয়ে পড়লো তখন ওদের দু'জনের স্বপ্ন দেখলো। ওরা জল চাইছে, জলের জন্য মিনতি করছে, কিন্তু চালাতে এক বিন্দু জল নেই। ওরা ওকে ডাকছে, আনিসিয়া ঠাকুমাকে ডাকছে, কিন্তু আনিসিয়া ঠাকুমা আসছেই না। আহতদের একজনের মাথার ব্যান্ডেজ খসে গেছে কিন্তু সেটা ঠিক করে দেবার কেউ নেই। আর ওরা নাতালকার কাছে অনুযোগ করছে আনিসিয়া ঠাকুমা তার কথা রাখেনি বলে আর নাতালকা আঙুল নেড়ে আনিসিয়াকে শাসাচ্ছে আর ওঃ! এমন কড়া করে ভর্ৎসনা করছে যে আনিসিয়া ঠাকুমার বার্ধক্যগ্রস্ত চোখ দুটো জলে ভরে উঠছে। ওঃ! কি জোরে জোরে ওরা আর্তনাদ করছে। ওরা এত জোরে আর্তনাদ করছিল যে আনিসিয়া চমকে জেগে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলো অশুভ কিছু একটা ঘটছে। স্টোভের ওপর থেকে সে উঁকি মেরে দেখলো, মনে হলো তখনও যেন সে স্বপ্ন দেখছে।

সেনাধিকারিকরা টেবিল ঘিরে টুল আর খাটের ওপর বসে আছে। তাদের দিকে মুখ করে, দুধারে দু'জন করে সৈনিকের সাহায্যে, দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রামগাছগুলির নিচেকার চালার সেই দু'জনা। আনিসিয়া ঠাকুমার মনে হলো বছরের পর বছর ধরে তার চোখের ওপর যে আবরণ পড়েছিল সেটা যেন হঠাৎ সরে গেলো। প্রতিটি জিনিস সে এত স্পষ্ট করে দেখতে পেলো, ওঃ, বহু বছর ধরে সে যা দেখছিল তার থেকে অনেক বেশি স্পষ্ট করে — তাদের মাথার, পায়ের আর হাতের ব্যান্ডেজগুলো, তাদের তরুণ মুখে অনেকদিন ধরে গজিয়ে ওঠা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তাদের চোখগুলোয় যেন জ্বরাতপ্ত উত্তেজনার আলো জ্বলছিল। আনিসিয়া স্টোভের ওপর একটু উঠে বসলো, পাছে আর্তনাদ করে ওঠে এই জন্য হাতের তোলো নখ দিয়ে খামচে ধরেছিল।

কর্নেল মাঝখানের চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছিল আর তার দোলানির সঙ্গে তাল রেখে বিরাট একটা দৈত্যের মতো ছায়া দেওয়ালের গায়ে নিঃশব্দে নড়াচড়া করছিল। কেরোসিনের বাতির আলোটা নিচের দিকে পড়ায় কর্নেলের অক্ষি কোটরের কালো ছায়ায় তার চোখ দুটো ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। টেবিলের ধার ঘেষে দোভাষী আহতদের কাছে দাঁড়িয়েছিল। কর্নেল চটপট প্রশ্ন করছিল আর দোভাষী সঙ্গে সঙ্গে সেটার পুনরাবৃত্তি করছিল কর্কশ ভাঙা গলায়।

'তুমি কোন ইউনিটে আছো?'

আনিসিয়া ঠাকুমা সব কিছুই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল, বছরের পর বছর যে ছিপি তার কান বন্ধ করে রেখেছিল সেটা যেন খুলে গেছে। প্রত্যেকটি কথা তার কানে পৌঁছাচ্ছিল এমন স্পষ্ট করে এমন পরিষ্কারভাবে এর আগে বহু বছর ধরে তেমন করে আর কখনো তা পৌঁছায়নি।

এমন কি ঐ স্টোভের ওপর থেকেও আনিসিয়া আহতদের কষ্টসাধ্য শ্বাস-প্রশ্বাসের

শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। তারা বাতাসের জন্য আকুল হয়ে তাদের শুকনো ঠোঁটগুলো ফাঁক করে হাঁপাচ্ছিল, বেশ কষ্ট করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছিল কিন্তু জার্মান সৈনিকদের হাতগুলো কড়াভাবে কিন্তু বেশ শক্ত করে তাদেব ধরে রেখেছিল।

'তুমি কোন ইউনিটে আছো?'

ওরা কোনো উত্তর দিলো না। কর্নেল ক্রুদ্ধভাবে টেবিলে ঘুঁষি মারলো।

"ওদের বলো আমি কোন ভদ্রতার ধার ধারবো না, সেটা পরিষ্কার তো? ওদের বলো আমার উপদেশ, আমাব আন্তরিক উপদেশ হচ্ছে ওরা যেন কথা বলে। ওদের বলো ওদের মতো লোকেদের শায়েস্তা করার আমার নিজস্ব একটা পন্থা আছে। ওদের জিজ্ঞাসা করো ওরা কোন ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত, সেটা কবে এখানে ছিল, এখন কোথায় যাচ্ছে, কোথা থেকে এসেছে, সৈন্যবাহিনী এখন কোথায় আর গ্রামবাসীরা, কোন্ কোন্ যুদ্ধে ওরা অংশ নিয়েছে? এই সমস্ত। বলো এবার।'

আনিসিয়া তার গলার স্বরে আসন্ন অমঙ্গলের একটা অশুভ ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে পারলো। সে অনুভব করলো তার বুকের ভেতরটা ধক ধক করছে মনে হচ্ছে যেন ফেটে যাবে। তার হৃৎপিণ্ডটা এমনভাবে স্পন্দিত হচ্ছে যেমনটি বহু বছর ধরে হয়নি আর বৃদ্ধার মনে হতে লাগলো টেবিল ঘিরে বসে থাকা লোকগুলো নিশ্চয় তার বুক বিদীর্ণ করা আলোড়ন শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু তার দিকে কেউ ফিরেও তাকালো না। সব ক'টি চোখ তখন ন্যস্ত ঐ দু'জনার ওপর, সৈনিকদের কড়া হাতের সাহায্যে টলমল অবস্থায় যারা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'তুমি কোন্ ইউনিটে আছো?'

আহতদের মধ্যে যার মাথায় আঘাত লেগেছিল সে গভীরভাবে একটা নিঃশ্বাস নিলো। আনিসিয়া ঠাকুমা অপেক্ষা করে রইলো সে কি বলে তার জন্য, সারা অঙ্গ তার কাঁপছিল।

'তা আমি তোমাকে বলবো না।'

'বলবে না, বটে? বেশ তাহলে, হানস্ ওকে বাইরে নিয়ে যাও। মুখ দিয়ে ও কথাগুলো বার করতে পারছে না। ওকে একটু সাহায্য করো তো।'

সৈনিকটি ঘুঁষি তুলে সজোরে ওর মুখের ওপর মারলো। অপরিচ্ছন্ন, জমাট রক্তলাগা ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথাটা অসহায়ভাবে পিছনের দিকে হেলে পড়লো। কিন্তু যথাসাধ্য মনের জোর খাটিয়ে আহত লোকটি নিজেকে সামলে নিলো।

'তা আমি তোমায় বলবো না।'

'সৈন্যবাহিনী কোথায়?'

'জানি না।'

'জানো না? বেশ, হানস্, ওর স্মৃতি শক্তিটা ওর হয়ে শুধু একটু চাঙ্গা করে দাও তো দেখি। বেচারা মনে হচ্ছে ভুলেই গেছে ···। আমরা ওকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করবো, ও, হ্যাঁ, আমরা ওকে মনে করিয়ে দেবার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবো ···।'

এরপর চোয়ালের ওপর পড়লো একটা ঘুষি, তারপর দ্বিতীযটা, তৃতীয়টা। ব্যান্ডেজের ওপর নতুন করে রক্তের দাগ দেখা দিলো। তার গলা ফেটে যে আর্তনাদটা বেরিয়ে আসতে চাইছিল অনেক কষ্টে, আনিসিয়া সেটাকে রোধ করলো।

'গ্রামের লোকেরা সব কোথায় ?'

'জানি না। আমি তাদের একজনকেও দেখিনি', শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর এলো।

কর্নেল প্রচণ্ড ক্রোধে তার সামনের কাগজগুলো মুচড়ে ফেলে দিলো।

'ও তাদের একজনকেও দেখেনি হানস্ ···। ব্যাপারটা শুধু একবার চিন্তা করে দেখো, ও তাদের একজনকেও দেখেনি ···। ওহে, একবার যাও, ওর দৃষ্টিশক্তিকে একটু সাহায্য করো তো, ওর দৃষ্টিশক্তিকে একটু সাহায্য করো। বুঝেছো, এমনভাবে সাহায্য করো যাতে করে ও দেখতে পায় ···।'

লালসৈনিকটি মাটিতে পরে গেলো। আনিসিয়া আরো একটু সোজা হযে বসলো। নাঃ, এ হতে পারে না, এ তার বার্ধক্যগ্রস্ত চোখের ভ্রম। সৈনিকটি তার সঙ্গীন বার করলো। আরো দুজন মাটিতে পড়া লোকটির ওপর চেপে বসলো। তারপর, সন্তর্পণে অত্যন্ত মৃদুভাবে হাত চালিয়ে সৈনিক হানস্ তার সঙ্গীনের ফলাটা আহত লোকটির বাঁ চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। এক অমানুষিক, রুদ্ধশ্বাস আর্তনাদ বাতাস বিদীর্ণ করে দিলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর্তনাদটা স্তব্ধ হযে গেলো।

'সৈন্যবাহিনী কোথায় ?'

'জানি না ···। তা আমি তোমায় বলবো না ···। আমার কাছ থেকে তুমি একটা খবরও জানতে পারবে না ···' আহত লোকটি ভাঙা গলায় বেশ কষ্ট করে উত্তর দিলো। চোখের কোটর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো, মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে লাগলো। কর্নেল টেবিল থেকে উঠে এসে মরণোন্মুখ লোকটির ওপব ঝুঁকে পড়লো। তার মুখে যেন একটা কৌতুহলের ভাব। তার বুটের ডগা দিয়ে অনড় দেহটাতে সে লাথি মারলো।

'ওকে শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করো ও কথা বলবে কিনা।'

দোভাষী মাটিতে পড়ে থাকা লোকটির ওপর ঝুঁকে পড়লো। আনিসিয়া ঠাকুমা শুনতে পেলো লোকটিব গলার মধ্যে রক্তের গলগল শব্দ। আর ঐ ভযঙ্কর শব্দেব ওপর দিযে সে শুনতে পাচ্ছিল বহুকষ্টে নিঃসৃত যন্ত্রণার আর্তনাদ মিশ্রিত কথাগুলো।

'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ ··· কমরেড ··· এসো মোরা ··· মিলি একসাথ ···।'

'কি বলছে ও ? কি বলছে ?' কর্নেল কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলো। 'কি বললো ও ?'

'কিছু না।'

'কিছু না মানে ? ও তো কি বললো যেন ···।'

'কি যে বললো ঠিক বোঝা গেলো না ···।'

'ওকে খতম করে দাও,' কর্নেল আদেশ দিলো। সৈনিকটি তার সঙ্গীন উঁচিযে ধরলো।

'এখানে নয়,' কর্নেল চিৎকার করে উঠলো, 'বাইরে নিয়ে গিয়ে করো।'

সৈনিকটি নিশ্চল দেহটার দুই বগলের তলা দিয়ে হাত গলিয়ে তাকে দরজার দিকে টেনে নিয়ে চললো। আনিসিয়া দেখলো অসহায় পা দুটো মেঝের ওপর দিয়ে ঘষটাতে ঘষটাতে যাচ্ছে, সারা ঘরের দৈর্ঘ্য জুড়ে দীর্ঘ একটা রক্তের চিহ্ন রেখে।

সে উঠে বসলো, একটা হাত তার বুকের ওপর। দেওয়ালের গায়ে কালো কালো ছায়া সব নৃত্য করছিল, বড় বড় পেরেক আঁটা বুটগুলো সজোরে সশব্দে মেঝের ওপর দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। এবার দ্বিতীয় লোকটি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে টলছিল। সৈনিকদের কড়া হাতগুলো তাকে ধরে রেখেছিল।

'ওকে প্রশ্ন করো।'

আনিসিয়া তাড়াতাড়ি তার লেপের নিচেয় মাথা লুকোলো। যাতে শুনতে না পায় তার জন্য সে কান বন্ধ করলো। যাতে দেখতে না পায় তার জন্য দুটো হাত দিয়ে সে চোখগুলো চেপে ধরলো। গভীর একটা আর্তনাদ করে অভিশাপ দিলো সে তাব পরমায়ুকে, এই নব্বই, একানব্বইটা বছর যে পরমায়ু টানতে টানতে তাকে নিয়ে এসেছে আজকের এ রাত্রিতে, এই বীভৎস রাত্রিতে! সে তা চোখ দুটোকে অভিশাপ দিলো সময় মতো তারা দৃষ্টিশক্তি হারায়নি বলে, তারা একেবারে অন্ধ হয়ে যায়নি বলে, তারা দেখেছে বলে। সে তার কান দুটোকে অভিশাপ দিলো তারা সময় মতো বধির হয়ে যায়নি বলে, যা ঘটছে তার সব কিছু শুনেছে বলে।

লেপের ভেতর থেকে তাব বার্ধক্যগ্রস্ত কানদুটো শুনতে পাচ্ছিল গোঙানি আর কাতরানির শব্দ আব বেপরোয়া এক ঘেয়ে সুরে একই আর্ত চিৎকারের পুনরাবৃত্তি।

'আমি জানি না। আমি তোমায় বলবো না।'

অবশেষে নীরবতা নেমে এলো। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার আর কিছুতেই লেপের তলা থেকে মাথা বার করে দেখবার সাহস হচ্ছিল না। শেষকালে সে তার মাথা বার করলো। দেখে মনে হলো জার্মানরা ঘুমোতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাদের বেল্ট আর বুট খুলছে। জানলার খড়খড়িগুলো ঠিক করে লাগালো, দরজায় খিল দিলো সৈন্যরা কুটিরের বাইরে ছাউনি ফেলেছিল। একজন রক্ষী দরজার সামনে পায়চারি করতে লাগলো কিন্তু সেনাধিকারিকরা স্পষ্টই কাউকে বিশ্বাস করে না। কর্নেল নিজে দরজার খিল পরীক্ষা করে দেখলো। দরজা আর খড়খড়িগুলো টেনে টেনে পরীক্ষা করলো, এমনকি স্টোভের কাছে পর্যন্ত এসে দেখে গেলো বৃদ্ধা ঘুমিয়েছে কিনা।

আনিসিয়া তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে ফেললো আর শান্ত সমানভাবে নিঃশ্বাস ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো।

বাতিটা নিভিয়ে দেওয়া হলো। আনিসিয়ার মনে হচ্ছিল তার হাত পা গুলো যেন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাদের ওপর যেন সীসে চাপানো হয়েছে।

অপেক্ষা করতে লাগলো সে। সময় বয়ে চললো মন্থর গতিতে, ওঃ। অত্যন্ত মন্থর গতিতে। ঘরের অশুভ অন্ধকারের মধ্যে মুহূর্তগুলো যেন অনন্তকাল ধরে বয়ে

চললো। সময়টা যেন থমকে থেমে গেছে। আনিসিয়ার হাত-পাগুলো যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেলো আর বরফের মতো ঠাণ্ডা ঘামের ফোঁটায় ভরে গেলো তার কপাল আর পিঠ। তবু, এটা তাকে করতেই হবে!

কে যেন ইতিমধ্যেই নাক ডাকাচ্ছিল, আনিসিয়া স্টোভের ওপর নিঃশব্দে উঠে বসলো। তার মনে হচ্ছিল তাকে যেন অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আর তার নড়াচড়া সব শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু জার্মানগুলো অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। তাদের সশব্দ শ্বাসপ্রশ্বাস আর নাকের ডাক চারিদিক থেকে শোনা যাচ্ছিল। এখানে মাটিতে বিছানো খড়ের উঁচুনিচু বিছানার ওপর হাত পা ছড়িয়ে সব শুয়েছিল। কর্নেল শুয়েছিল খাট দখল করে। স্টোভের পাশ দিয়ে একটা পা সে সন্তর্পণে নামালো। অপেক্ষা করে রইলো সে। কিন্তু কেউ নড়াচড়া করলো না। তারপর অন্য পাটা - এ পর্যন্ত সব ঠিকই আছে। ঠিক তেমনি নিঃশব্দে আর সন্তর্পণে সে স্টোভের ওপর থেকে নেমে পড়লো। শুধু যদি তার হৃৎপিণ্ড যেটা ঠিক একটা টমটম (ঢোল মাদল ধরনের বাদ্যযন্ত্র) এর মতো দুমদুম করছে, সেটা না ওদের জাগিয়ে দেয়। কিন্তু না, তারা অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, শ্রান্ত ক্লান্ত লোকেদের অগাধ গভীর গাঢ় ঘুম। আনিসিয়া হাতড়ে হাতড়ে দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছালো। নিঃশ্বাস ফেলতেও সাহস হচ্ছিল না তার, দরজার তালায় চাবিটা একবার ঘুরিয়ে চাবিটা বার করে নিলো। তারপর খড়খড়ির আড়াআড়ি খিলগুলো ভালো করে এঁটে দিলো। ঐ কম্পিত স্ফীত হাতগুলোয় এখনও কি শক্তি ধরে! এখন দরজাটাও বেশ আঁট করে বন্ধ হলো যেন লোহার পাত দিয়ে আটকানো হয়েছে আর জানলাগুলোও তাই। এখন কেউ আর কুটিরের মধ্যে ঢুকতে পারবে না, সেনাধিকারিকদের ঘুম বা বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না।

কয়েকটা মিনিট সে অপেক্ষা করে রইলো। তারপর বেঞ্চির নিচে চারপাশ হাতড়ালো। হ্যাঁ, বোতলটা বরাবরের মতো একই জায়গাতে রয়েছে। একেবারে মুখ পর্যন্ত ভর্তি। নাতাশা মাত্র সম্প্রতি দোকান থেকে ওটা কিনে এনে এখানে রেখেছে। বোতলটা একেবারে ভর্তি রয়েছে।

আনিসিয়া ছিপিটা টেনে খুলে ফেললো। নিঃশব্দে খাটের ওপর ঝুঁকে পড়ে, আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে খানিকটা কেরোসিন সে কর্নেলের পায়ের কাছের খড়ের ওপর ঢাললো। তারপর এক পা পিছু হটে তেমনি আস্তে আস্তে আরো সন্তর্পণে খানিকটা কেরোসিন ঢাললো সেনাধিকারিকরা যেখানে শুয়েছিল সেইখানে মেঝের উপর, চৌকাঠের ওপর, সারা ঘরময়।

কড়ি কাঠগুলো সব শুকনো ছিল, কাঠের দেওয়াল আর মেঝেও তাই। কত বছর ধরে কুটিরটা ওখানে রয়েছে? কুটিরের কাঠেগড়া অংশটা একেবারে খড়ের মতো শুকনো হয়েছিল। ওঃ, হ্যাঁ, খড়, বটেই তো খড় ···। সে সন্তর্পণে মেঝেয় পাতা খড়ের বিছানাটার ওপর কেরোসিন ছিটিয়ে দিলো।

কম্পিত হাতে সে স্টোভের খাঁজের মধ্যে দেশলাই খুঁজতে লাগলো। ওখানে দেশলাই থাকতো তো। ঐ তো রয়েছে, তার বরাবরের জায়গায় ···।

লেপটা মাথার ওপর ফেলে সে একটা দেশলাই কাঠি জ্বাললো। দেশলাই কাঠি জ্বলে ওঠার শব্দটা যেন রাইফেলের গুলির থেকে জোরালো বলে মনে হলো তার। কিন্তু না, কুটিরের মধ্যে সব কিছু চুপচাপ, একমাত্র শব্দ শুধু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন শ্রান্ত ক্লান্ত লোকগুলোর নাকের ডাক। নিচু হয়ে সে জ্বলন্ত কাঠিটা মেঝেতে ঠেকালো। কিন্তু পিঠটা আর সোজা করতে পারলো না। আগুন চকিতে খড়ের ওপর দিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো।

আনিসিয়া আগুনের শিখাগুলোর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। তার কেরোসিনে ভেজা স্কার্টে আগুন ধরার কথা আর টের পেলো না সে।

ঘুমন্ত লোকেদের মধ্যে থেকে একজন যখন অবশেষে চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠে পড়লো ততক্ষণে কুটিরটা সর্বগ্রাসী, দ্রুত বর্ধমান আগুনে ঢাকা পড়ে গেছে। কে যেন মরীয়া হয়ে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল।

আনিসিয়া ঠাকুমা অনেক কষ্টে দাঁড়িয়ে উঠলো বটে কিন্তু পরক্ষণেই সটান আগুনের মধ্যে পড়ে গেলো। শেষ যে কথাটা তার মনে ছিল সেটা হলো দরজা জানলা তো সব বন্ধ, আর এমন আঁটসাঁট করে বন্ধ যে কেউ আর কোনো মতেই সেগুলো খুলতে পারবে না।

সোভিয়েত লেখিকা Wanda Wasilewsk-র "Inside the hut" গল্পটির ছায়াবলম্বনে।

পৃথিবীর সব থেকে সুখী মানুষ

এলবার্ট মালজ

জেসির কান্না পাচ্ছিল। টম এর আসার অপেক্ষায় সে চালা-ঘরটার মধ্যে বসেছিল, তার জখমী পাটাকে একটু জিরান দেবার সুযোগ পেয়ে বেশ কৃতজ্ঞ বোধ করছিল, শান্তভাবে, উৎফুল্ল মনে সেই মুহূর্তটির প্রত্যাশায় উদগ্রীব হয়েছিল যখন টম বলবে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বটেই তো, জেসি, তুমি তোমার সুবিধা মতো যে কোনো সময় কাজে যোগ দিতে পারো!"

দু'সপ্তাহ ধরে সে নিজেকে ঠেলে নিয়ে এসেছে মিশৌরীর কানসাস সিটি থেকে ওকলাহামার টালসাতে, বৃষ্টিভরা রাত আর সপ্তাহব্যাপী নিদারুণ রৌদ্রদাহের মধ্য দিয়ে, নিদ্রাবিহীন অবস্থায় উপযুক্ত খাবার ছাড়াই শুধুমাত্র এই মুহূর্তটির কল্পনাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর তখনই টম এসে অফিসে ঢুকলো। হাতে তার এক বাণ্ডিল কাগজ নিয়ে সে চট করে এসে ঢুকলো; জেসির দিকে একবার তাকিয়েও ছিল চকিতের জন্য, ঠিকই—তাহলেও চেনার পক্ষে যথেষ্ট দীর্ঘ সময়। সে ওকে চিনতে পারেনি। মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে·····আর টম ব্র্যাকেট কিনা তার আপন সম্বন্ধী। এটা কি তার জামাকাপড়ের জন্য? জেসি জানতো তাকে সাংঘাতিক দেখাচ্ছে। পার্কের একটা জলখাবার ফোয়ারায় নিজেকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে চেষ্টা করেছিল, তাতে কোন কাজ হয়নি; দাড়ি কামাতে গিয়ে উত্তেজনার বশে গালের একটা পাশ একটু কেটে গেছে, কাটাটা বেশ বিশ্রী ধরনের। তার স্যুট থেকে লাল গাম্বো মাটির ধুলো কিছুতেই আর ঝেড়ে ফেলতে পারেনি যদিও সারা গা চাপড়াতে চাপড়াতে হাত দুটো তার ভেরে গেছে···। না কি তার এতই পরিবর্তন হয়েছে?

পাঁচ বছর তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি ঠিকই; কিন্তু টমকে দেখে তো শুধু মনে হয় পাঁচ বছর বয়সই তার বেড়েছে, আর কিছু নয়। সে তো সেই টমই রয়ে গেছে। ভগবান! তার নিজের কি তাহলে সত্যিই এত পরিবর্তন হয়েছে!

ব্র্যাকেট এর টেলিফোনে কথা বলা শেষ হলো। তার সুইভ্‌ল (ঘোরানো) চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সে জেসির দিকে তাকালো, তার সন্দিগ্ধ বিরাগভরা ছোট ছোট স্বচ্ছ নীল চোখ তুলে। ভারী গড়নের, ভুঁড়িওয়ালা বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের লোকটি,

লালচে বাদামী চুল, গম্ভীর চেহারা ; মাংসালো মুখ, মুখাবয়ব বেশ চোখাচোখা, জোরালো, নাকটা গোলাকার, ডগাটা লাল। তাকে দেখে বেশ নির্ভরযোগ্য, সজ্জন, দক্ষ ব্যবসায়ী বলে মনে হয়– অবশ্য সে তো তাই। ঠাণ্ডা নির্লিপ্তভাবে জেসিকে পরীক্ষা করে দেখছিল, তার ওপর সময় ব্যয় করার অনিচ্ছাটা বেশ খোলাখুলি ভাবে দেখিয়ে। এমনকি তার মুখের খড়কে কাঠিটা চিবানোর ধরনটাও জেসির কাছে কেমন যেন তাচ্ছিল্য মাখানো বলে মনে হচ্ছিল।

"কি ব্যাপার"? হঠাৎ ব্র্যাকেট প্রশ্ন করলো। "কি চাও তুমি?"

গলার স্বরটা বেশ ভদ্র এটা জেসিকে স্বীকার করতেই হবে। সে তো এর থেকেও অনেক বেশি খারাপ কিছু আশঙ্কা করেছিল। চালা ঘরটাকে দু-ভাগ করেছে কাঠের যে কাউন্টারটা তার কাছে এগিয়ে গেলো সে। তার জটাপড়া চুলের মধ্যে উদ্বিগ্নভাবে একটা হাত চালিয়ে দিলো।

"মনে হচ্ছে তুমি আমায় চিনতে পারো নি, টম", সে থেমে থেমে বললো, "আমি জেসি ফুলটন।"

"হিউ?" ব্র্যাকেট বললো। আর তাই সব।

"হ্যাঁ, আমিই সে, এলা তোমাকে তার ভালোবাসা জানিয়েছে।"

ব্র্যাকেট উঠে কাউন্টারের কাছে এগিয়ে এলো, একেবারে দু'জনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। বিস্ময়ে সে ফুলটনকে লক্ষ্য করছিল, তার ভগ্নীপতির চেহারার যতটুকু তার মনে ছিল তার সঙ্গে এর মিল খুঁজছিল। এই লোকটা লম্বা, বছর তিরিশ মতো বয়স। সেটা মিলে গেছে। সরল সুন্দর মুখাবয়ব আর ঋজু দোহারা শরীর। সেটাও মিলছে। কিন্তু মুখটা বড়ই শুকিয়ে গেছে, আর ঢলঢলে জামা-কাপড়ের নিচে শরীরটা নেহাৎই অস্থিসার বলে নিশ্চিত হতে পারছে না। ওর ভগ্নীপতি তো ছিল বেশ বলিষ্ঠ, জোয়ান যুবা, বেশ পেশল চেহারা। এ যেন একটা খারাপ ভাবে তোলা বিবর্ণ ফোটোগ্রাফ থেকে বিষয়বস্তুকে চেনার চেষ্টা ঃ মিল আছে ঠিকই কিন্তু অমিল প্রচণ্ড। চোখ পরীক্ষা করে দেখছিল সে। সে দুটো অন্তত নিশ্চিত ভাবে পরিচিত বলে মনে হলো, ধূসর রঙা, আর চাউনিতে কেমন একটা আশ্চর্য রকমের সলজ্জ কিন্তু ভদ্রভাব। ফুলটন সম্বন্ধে এইটাই তার খুব ভালো লেগেছিল।

জেসি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ভেতর ভেতর সে ফুঁসছিল। ঘোড়ার মাংসের থেঁৎলানো একটা টুকরোকে যেমন করে লোকে পরীক্ষা করে ব্র্যাকেট যেন ঠিক তাই করছিল ; তার চোখদুটোয় অবিমিশ্র করুণা। ওটা জেসিকে দারুণ ক্রুদ্ধ করে তুলছিল। সে জানতো তার ঠিক অতটা অবনতি হয়নি।

"হ্যাঁ, তুমিই সেই লোক বটে", ব্র্যাকেট অবশেষে বললো, "তবে সত্যই তোমার খুব বদল হয়েছে।"

"বটেই তো, পাঁচ বছর হয়ে গেলো, তাই নয় কি?" জেসি ক্ষুব্ধভাবে বললো। "আর আমাকে তো তুমি কয়েকবার মাত্র দেখেছো।" তারপর ঠোঁট চেপে লজ্জা মিশ্রিত প্রখরতার সংগে স্বগতোক্তি করলো, আমি যদি বদলেই গিয়ে থাকি তাতেই বা কি হোল। লোকে কি বদলায় না? আমি তো আর একটা মরা মানুষ নই।

"তুমি তো বেশ মোটাসোটা ছিলে," ব্র্যাকেট বলে চললো, মৃদু কণ্ঠে বিস্ময়ের স্বরে। "মনে হচ্ছে ওজন কমে গেছে, তাই না?"

জেসি চুপ করে রইলো। ব্র্যাকেটকে খুবই প্রয়োজন তার তাই তাকে চটাবার ঝুঁকি নিলো না। কিন্তু অনেক চেষ্টায় সে রাগে ফেটে পড়া থেকে নিজেকে সম্বরণ করলো। বিরতি দীর্ঘতর হয়ে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে পড়লো। ব্র্যাকেট-এর মুখ লাল হয়ে গেলো। "কি কাণ্ড দেখতো, আমায় মাপ করো", প্রবলভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করলো সে। কাউন্টারটা এক ঝটকায় তুলে দিলো। "ভেতরে চলে এসো। বোসো। আরে বাসরে, ভাই," —জেসির হাত চেপে ধরে করমর্দন করলো— "তোমায় দেখে খুব খুশি হয়েছি ; তুমি যেন অন্য কিছু ভেবে বোসো না! তোমায় এত রোগা লাগছিল।"

"ঠিক আছে," জেসি বিড় বিড় করে বললো। তার কোঁকড়ানো অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে, সে বসে পড়লো।

"তুমি খোঁড়াচ্ছো কেন?"

"একটা পাথরের ওপর পা পড়ে গিয়েছিল ; জুতোর তলায় একটা ফুটো হয়ে গেছে।" জেসি তার পাটা চেয়ারের তলায় টেনে নিলো। জুতোর জন্য তার লজ্জা করছিল। আসলে ওগুলো এসেছে 'রিলিফ' থেকে, আর দু'সপ্তাহ ধরে রাস্তা চলায় ওগুলোর একেবারে দফারফা হয়ে গেছে। সারা সকাল ধরে, কেমন একরকম সুখকর, নির্বোধজনোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করেছে অন্য সব কিছুর আগে, এমন কি এক প্রস্থ স্যুটের আগে, নিজের জন্য মজবুত আনকোরা নতুন একজোড়া জুতো সে কিনবে।

ব্র্যাকেট জেসির পায়ের ওপর থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। ছেলেটি কি নিয়ে বিব্রত তা সে বুঝতে পেরেছিল আর তাতে করে অন্তরটা তার করুণায় ভরে গেলো। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন দুঃখজনক। এর আগে এমন চরম দুর্দশাগ্রস্ত আর কোনো লোককে সে দেখেনি। তার বোন তাকে প্রতি সপ্তাহেই চিঠি লেখে, কিন্তু তাদের যে এমন দুরবস্থা এ কথা তো তাকে বলেনি।

"বেশ এখন শোনো", ব্র্যাকেট আরম্ভ করলো, "তোমাদের সব খবর বলো। এলা কেমন আছে?"

"ওঃ সে তো বেশ ভালোই আছে," জেসি অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলো। তার গলার স্বরটা বেশ মৃদু, শ্রুতি মধুর, একটু লাজুক ধরনের, তার কোমল ধুসর রঙের চোখ দুটোর সঙ্গে বেশ খাপ খায়। কি ভাবে শুরু করবে সেইটাই সে চিন্তা করছিল।

"আর বাচ্চারা?"

"ওঃ তারাও ভালো আছে····। তবে, জানো বোধহয়', জেসি আরো একটু মনোযোগ সহকারে বললো, "ছোটটাকে একটা ব্রেস (Brace) পরতে হয়েছে। জানো নিশ্চয়, ও তো দৌড়োদৌড়ি করতে পারে না। কিন্তু খুব চালাক। ছবি আঁকতে পারে, আরো অনেক কিছু করতে পারে।"

"হ্যাঁ", ব্র্যাকেট বললো। "সেটা তো ভালো।" একটু ইতঃস্তত করলো সে। এক

মুহূর্তের জন্য সব কিছু চুপচাপ। জেসি তার চেয়ারে বসে উসখুস করতে লাগলো। এখন যখন সময় এসেছে, তখন তার কেমন যেন অপ্রস্তুত লাগছিল। ব্র্যাকেট সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার একটা হাত জেসির হাঁটুর ওপর রাখলো। "তোমাদের যে এমন দুঃসময় চলেছে এলা তো সে কথা কিছু আমায় জানায়নি, জেসি। তাহলে আমি হয়তো তোমাদের কিছু সাহায্য করতে পারতাম।"

"বারে", জেসি মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলো. "তোমার নিজেরও তো নানা ঝামেলা চলেছে, তাই নয় কি?"

"তা বটে।" ব্র্যাকেট আবার পিছনে হেলান দিয়ে বসলো। তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখটা বিষণ্ণ, তিক্ত কালিমাখা হয়ে গেলো। "জানো তো আমার লোহার দোকানটা গেছে?"

"হ্যাঁ, জানি বই কি", জেসি উত্তর দিলো বিস্মিতভাবে। "তুমিইতো আমাদের লিখেছিলে। সেই কথাই তো বলছি।"

"আমার মনে ছিল না," ব্র্যাকেট বললো। "সে ব্যাপারটা নিয়ে এখনও আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই। খুব যে একটা বড় ব্যবসা ছিল তা নয়," সে তিক্তভাবে শুধু বললো। "তিন বছর ধরে মন্দাই যাচ্ছিল। বোধহয় নিজের ব্যবসা বলেই আমি ওটা চাইছিলাম।" নীরসভাবে অযথাই সে হেসে উঠলো। "এবার তোমার নিজের কথা বলো", সে জিজ্ঞাসা করলো।

"যে চাকরিটা ছিল সেটার কি হলো।"

জেসি উত্তেজিতভাবে হঠাৎ বলে ফেললো, "ও কথা এখন থাক, টম, আমার একটা অন্য কথা বলার আছে।"

"তোমার আর এলার ব্যাপারে কিছু নয় তো?" ব্র্যাকেট উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলো।

"না, না!" জেসি পিছিয়ে বসলো। "কিন্তু একথা তোমার মনে এলো কেন? এলা আর আমার—" সে থেমে গেলো হাসতে হাসতে। "সে কি টম, আমি যে এলার জন্য একেবারে পাগল। অদ্ভুত ভালোবাসে। সেই তো আমার সব, টম।"

"ক্ষমা করো ভাই, ও কথা ভুলে যাও।" ব্র্যাকেট মুখ ফিরিয়ে অস্বস্তিভরে হাসল। ছেলেটির ভালোবাসার আচমকা প্রকাশের নগ্ন গভীরতায় সে বিচলিত হয়েছিল। এতে করে তাদের জন্য কিছু করার দারুণ ইচ্ছা তার মনে জেগেছিল। এত কষ্ট পাবার পক্ষে ওরা দুজনেই অত্যন্ত ভালো। এলাও ঠিক এই ছোকরার মতোই লাজুক, আরো একটু নম্র।

"টম, শোনো," "জেসি বললো, 'এখানে আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।" তার চুলের মধ্যে সে আঙুলগুলো চালিয়ে দিলো। "আমি তোমার সাহায্য চাই।"

"কি বলেছো, ছোকরা," ব্র্যাকেট আর্তনাদ করে উঠলো। এইটাই সে আশঙ্কা করছিল। "আমি বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারবো না। সপ্তাহে মাত্র ৩৫ করে পাই আর তারজন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ।"

"নিশ্চয়, আমি তা জানি", জেসি উত্তেজিত ভাবে জোর দিয়ে বললো। আজকের

ভোব বেলাকাব সেই অদ্ভুত, সুখপ্রদ উত্তেজনা সে যেন আবাব অনুভব কবছিল "আমি জানি তুমি আমাদেব টাকা-পযসা দিযে সাহায্য কবতে পাববে না! কিন্তু একজন লোকেব সঙ্গে আমাদেব দেখা হযেছিল, সে তোমাবই এখানে কাজ কবে। আমাদেব শহবে গিযেছিল সে। সে বললো তুমি আমাকে একটা কাজ দিতে পাবো।"

"কে বলেছে?"

"কিন্তু তুমি আমাকে কেন বলোনি?" জেসি ভর্ৎসনাভবে বলে উঠলো। "যাবজন্য কথাটা শোনামাত্রই আমি বেবিযে পড়েছি। দুসপ্তাহ ধবে পাগলেব মতো ছুটে আসছি।"

ব্র্যাকেট জোবে আর্তনাদ কবে উঠলো। "দু'সপ্তাহ ধবে কানসাসসিটি থেকে তুমি হেঁটে আসছো। আমি তোমায চাকবি দিতে পাবি এই আশায?"

"বটেই তো, টম, সেইজন্যে তো বটেই। এছাড়া আব আমাব কবাব কি ছিল?"

"হে ভগবান, এখানে কোনো চাকবি খালি নেই, জেসি। এটা কাজ পডতিব মবসুম চলেছে। আব তুমি এই তেলেব ব্যবসাব ব্যাপাব জানো না এটা একটা বিশেষ ধবনেব ব্যবসা। এখানে আমাব বন্ধু-বান্ধব আছে ঠিকই, কিন্তু এখন তাবা কিছুই কবতে পাববে না। কোনো সুযোগ থাকলে আমি কি তোমায ডেকে পাঠাতাম না?'

জেসি একেবাবে স্তম্ভিত হযে গেলো। গত দু'সপ্তাহেব সব আশা যেন তাব পেটেব মধ্যে তালগোল পাকানো একটা যন্ত্রণাব গোলায পবিণত হযে গেলো। তাবপব মবিযা হযে সে চিৎকাব কবে উঠলো। "কিন্তু, শোনো ঐ লোকটা যে বললো তুমি ঠিকা লোক নিযোগ কবতে পাবো। আমাকে বলেছে সে। সে তো তোমাব ট্রাক চালায। সে বলেছে তোমাব সব সময লোকেব দবকাব হয।"

"ওঃ। ....তুমি আমাব ডিপার্টমেন্টেব কথা বলছো?"

ব্র্যাকেট নীচু গলায বললো।

'হ্যাঁ, টম, হ্যাঁ।"

'না, না, তুমি আমাব ডিপার্টমেন্টে কাজ কবতে চাইবে না", ব্র্যাকেট সেই একই বকম নিচু গলায বললো। "সে কাজ যে কি তা তুমি জানো না।"

"হ্যাঁ, আমি জানি," জেসি জোব দিযে বললো। "সে আমাকে সব কিছু বলেছে, টম। তুমি তো ডিসপ্যাচাব, তাই না? তুমি তো ডাইনামাইট ভবা ট্রাকগুলো পাঠাও, তাই না?"

"সে লোকটা কে, জেসি?"

"এভাবেট, মনে হচ্ছে তাব নাম এভাবেট।"

"এগবার্ট? আমাব মতো গডন কতকটা?" ব্র্যাকেট আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা কবলো।

"হ্যাঁ, এগবার্টই। ধাপ্পাবাজ নযতো সে?"

ব্র্যাকেট হেসে উঠলো। এই দ্বিতীযবাবেব হাসিও আশ্চর্য বকমেব নীবস। "না

ধাপ্পাবাজ নয়।" তারপর তার স্বর পাল্টে গেলো ঃ "জিমি, ভাই, এতদূর পায়ে হেঁটে এখানে আসার আগে তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করলে পারতে।"

"আমি তা চাইনি," সরল চাতুর্যের সঙ্গে জেসি তাকে বুঝিয়ে বললো। "আমি জানতাম তুমি 'না' করবে। আমাকে সে বলেছিল কাজটা বিপজ্জনক, টম। কিন্তু আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।"

ব্র্যাকেট আঙুলগুলো একত্রে সন্নিবদ্ধ করলো। তার মাংসল, ভারী মুখ কঠিন হয়ে গেলো। "সে যাই হোক, আমি কিন্তু 'না' বলতেই যাচ্ছি, জেসি।"

জেসি চীৎকার করে উঠলো। ব্র্যাকেট যে বাজি হবে না এটা সে কল্পনাই করতে পারেনি। তার মনে হয়েছিল টালসা পৌঁছানোটাই তার একমাত্র সমস্যা। "না," সে অনুনয় করে বললো, "তুমি তা করতে পারে না। কোনো চাকরি কি খালি নেই টম?"

"চাকরি নিশ্চয়ই আছে। চাও তো এডবার্গ-এর চাকরিটাও নিতে পারো।"

"ও কি ছেড়ে দিয়েছে?"

"মারা গেছে।"

"ওঃ!"

"কাজ করতে করতেই, জেসি। যদি জানতে চাও তো বলি, গতরাত্রেই।"

"ওঃ!.....তারপর, আমি ওসব গ্রাহ্য করি না!"

"এবার তুমি আমার কথাগুলো শোনো," ব্র্যাকেট বললো। "এবার আমি তোমাকে কয়েকটা জিনিষ বলবো, যেগুলো সম্বন্ধে ওখান থেকে যাত্রা শুরু করার আগেই আমাকে তোমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। ট্রাকে করে তোমাকে ডাইনামাইট নিয়ে যেতে হবে না। তেলের কুয়ো খোঁড়ার কাজে ওরা ডাইনামাইট-এর মত নিরাপদ কোনো জিনিষ ব্যবহার করে না। পারলে ওরা তাই করতো, কিন্তু তা করতে পারে না। ব্যবহার করে নাইট্রোগ্লিসারিন! স্যুপ (Soup)!"

"আমি তা জানি," জেসি তাকে বললো সান্ত্বনাসূচক-ভাবে!" "ও তা আমাকে বাৎলে দিয়েছিল, টম। তুমি ভেবো না যে আমি জানি না।"

"একটু চুপ করো," ব্র্যাকেট ক্রুদ্ধভাবে আদেশ করলো। "শোনো! তোমাকে একবার 'স্যুপি'এর দিকে শুধু তাকাতে হবে বুঝেছো? শুধু জোরে একটু কাশো অমনি বিস্ফোরণ হবে! তুমি জানো কি করে ওরা ওটা নিয়ে যায়? এমনি পাখার মতো আকারের একটা টিনের পাত্রে করে? আকারটা অমনি করে ওটার ফাঁকে ফাঁকে কামরা তৈরি করার জন্য, কেন না প্রতিটি কামরায় আবার রবারের আস্তরণ দিতে হয়। ওটাই হোল একমাত্র উপায় যে উপায়ে তুমি অন্তত ওটাকে নাড়াচাড়া করার কথা চিন্তাও করতে পারো।"

"শোনো, টম—"

'এখন, এক মিনিট একটু অপেক্ষা করো, জেসি। ভগবানের দোহাই, এই কথাটা একটু ভেবে দেখো। আমি জানি একটা চাকরির ওপর তোমার মন পড়ে রয়েছে,

কিন্তু এই ব্যাপারটা তোমাকে বুঝতেই হবে, এ জিনিসটা যায় শুধু বিশেষ এক ধরনের ট্রাকে করে। রাত্রি বেলায়। বিশেষ একটা রাস্তা ধরে তাদের যেতে হয়! কোনো শহরের মধ্যে দিয়ে তারা যেতে পারে না। যদি তাদের থামতে হয় তবে তা করতে হয় বিশেষ ধরনের কোনো গেরাজে! এসবের অর্থ যে কি তা কি তুমি বুঝতে পারছো না? এটা কি তোমায বলে দেয না কাজটা কি রকম বিপজ্জনক?"

"আমি সাবধানে চালাবো," জেসি বললো। "কি করে ট্রাক চালাতে হয তা আমি জানি। আমি আস্তে চালাবো।"

ব্র্যাকেট আর্তনাদ কবে উঠলো। "তোমার কি মনে হয এগবার্ট সাবধানে চালায নি কিংবা কি কবে ট্রাক চালাতে হয তা সে জানতো না?"

"টম", জেসি ঐকান্তিক ভাবে বললো, "তুমি আমাকে ভয দেখাতে পারবে না। শুধুমাত্র একটি জিনিসেব ওপব আমাব মন পডে রযেছে; এগবার্ট বলেছিল মাইল পিছু সে এক ডলাব কবে পায। সে বলেছিল পনেরো দিনেব কাজ করে সে মাসে পাঁচশো থেকে ছ'শো ডলাব বোজগার করছে। আমি কি তা পেতে পারি?"

"তুমি নিশ্চয তা পেতে পাবো", ব্র্যাকেট তাকে রুষ্টভাবে বললো। "মাইল পিছু এক ডলার। সোজা কাজ। কিন্তু কোম্পানিকে কেন এত টাকা দিতে হয বলোতো? সোজা কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত—যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার হেড লাইটের আলো এড়িয়ে যাওযা পাথরের ওপর দিয়ে চালিয়ে দাও, যেমন করেছিল এগবার্ট। কিংবা যদি চাকা পাংচার হয়। কিংবা তোমার চোখে কিছু পড়ে যায়, হাতের চাকা বেঁকে যায় তোমার ট্রাকে ঝাঁকুনি লাগে! কিংবা আরো অনেক কিছু যার সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। আমরা তো আর এগবার্টকে জিজ্ঞাসা করতে পাবি না তার কি হয়েছিল। কোনো ট্রাক নেই যে সাক্ষী দেবে। কোনো মৃতদেহও নেই। কিচ্ছু নেই। হয়তো কাল কেউ দূরের কোন এক ভুট্টা ক্ষেতে এক টুকরো বাঁকানো লোহার পাত খুঁজে পাবে। কিন্তু ড্রাইভারকে আমরা কখনো খুঁজে পাইনি। নখের একটু কণাও না। সময়মতো সে আসেনি আমরা শুধু সেটাই জানতে পারি। তারপর অপেক্ষা করে থাকি পুলিসের টেলিফোনের জন্য। কাল রাত্রে কি ঘটেছিল তুমি জানো? ব্রিজের ওপর একটা কিছু গোলমাল হয়েছিল। হয়তো এগবার্ট ঘাবড়ে গিয়েছিল। ব্রিজের গায়ে হয়তো তার ফেন্ডারটার ঘষা লেগেছিল। এখন ব্রিজ বলে আর কিছু নেই। কোনো ট্রাকও নেই। এগবার্টও নেই। এখন বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? তোমার ঐ মাইলপিছু এক ডলার ছাই ভস্মের পরিবর্তে তুমি ওটাই পাবে!"

এক মুহূর্তের জন্য সব চুপচাপ। তার লম্বা সরু হাতগুলো মোচড়াতে মোচড়াতে জেসি বসে রইলো। তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে, মুখের ভাব যন্ত্রনামাখা। তারপর সে চোখ বুঁজে মৃদুকণ্ঠে বললো . "আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না, টম। তুমি আমাকে বলেছো। এবার ভালো মানুষের মতো কাজটা আমাকে দাও।"

ব্র্যাকেট হাতের তালু দিয়ে তার ডেস্কের ওপর একটা চাপড় মারলো। "না!"

"শোনো, টম", জেসি মৃদু কণ্ঠে বললো, "তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছো

না।" সে চোখ খুলে তাকালো। চোখদুটো অশ্রুসজল। সে দিকে তাকিয়ে ব্র্যাকেট চোখ ফিরিয়ে নিলো। "শুধু, একবার আমার দিকে তাকাও, টম। দেখে কি তোমার কিছু মনে হচ্ছে না? আমাকে যখন প্রথম দেখলে তখন তোমার কি মনে হয়েছিল? তোমার মনে হয়েছিল : 'বাউন্ডুলেটা ভিক্ষে করা বন্ধ করে চলে যাচ্ছে না কেন?' এই কথাই মনে হয়েছিল, তাই নয় কি, টম? টম, আমি এইভাবে আর বাঁচতে পারছি না। এখন আমি রাস্তা দিযে মাথা উঁচু করে হাঁটতে চাই।"

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে" ব্র্যাকেট বিড়বিড় করে বললো। প্রত্যেক বছরে প্রতি পাঁচজনে একজন করে ড্রাইভার মাবা পড়ে। সেটাই হলো গড়পড়তা হিসাব। তাব মূল্য কি?"

"এখন আমার জীবনের কি কোন মূল্য আছে? বাড়িতে এখন আমরা উপোষ করে মরছি, টম। এখনও পর্যন্ত ওরা আমাদেব "রিলিফ"এর খাতায নাম তোলেনি।"

"তাহলে সে কথাটা তোমার আমাকে জানানো উচিত ছিল," ব্র্যাকেট রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠলো। "সেটা তোমারই দোষ। যখন পরিবারের লোক খেতে পাচ্ছে না তখন কোনো লোকের অধিকার নেই মিথ্যে অহঙ্কাব দেখাবাব। কিছু টাকা আমি ধার করবো, তারপর সেই টাকাটা আমরা টেলিগ্রাফ করে এলাকে পাঠিয়ে দেবো। তারপর তুমি ফিরে গিয়ে রিলিফের খাতায় নাম তোলাও।" "আর তারপর?"

"তারপর অপেক্ষা করে থাকবে। নিরুচি করেছে। তুমি তো বুড়ো নও। নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোনো অধিকার তোমার নেই। কখনো না কখন চাকরি একটা তুমি পেয়ে যাবে।"

"না!" জেসি লাফিয়ে উঠল। "না, আমিও তাই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন জানি না," সে আন্তরিক ভাবে বললো। "তুমি যেমন তোমার লোহার দোকান আর ফিরে পাবে না আমিও সে রকম চাকরি আর পাবো না। আমি আমার কর্মকুশলতা হারিয়ে ফেলেছি, টম। লাইনো টাইপিং হলো নৈপুণ্যের কাজ। আমার মরচে ধরে গেছে। ছ'বছর ধরে আমি রিলিফে আছি। একমাত্র কাজ যা আমি পেয়েছিলাম তা হলো গাঁইতি আর বেলচার কাজ। এ বছর বসন্তকালে যখন সে চাকরি পেলাম তখন সে কাজে আমার একেবারে পয়লা নম্বর হবার কথা। কিন্তু আমি মোটেই তা ছিলাম না। আর তাছাড়া ওরা এখন নতুন নতুন মেশিন এনেছে পড়তির মরসুম শুরু হতেই আমাকে বার করে দিলো।"

"তাতে কি হলো?" ব্র্যাকেট রুক্ষভাবে বললো। "আর অন্য কোন চাকরি কি নেই?"

"তা কি করে জানবো?" জেসি উত্তর দিলো। "ছ'বছর ধরে একটাও চাকরি ছিল না। এখন আমার চাকরি নিতেও ভয় করবে। এতগুলো সপ্তাহ ধরে রিলিফের জন্য অপেক্ষা করে থাকাটা খুবই কঠিন হয়েছিল।"

"তোমার মনে সাহস আনতে হবে," ব্র্যাকেট চিৎকার করে উঠলো। "মনে আশা জাগিয়ে রাখতে হবে।"

"যত সাহস চাও তা আমার আছে," জেসি প্রচণ্ডভাবে প্রত্যুত্তর করলো, "কিন্তু না। আমার মনে কোনো আশা নেই। ছ'বছরের প্রতীক্ষায় আমাব সব আশা শুকিয়ে গেছে। তুমিই আমার একমাত্র আশা।"

"তুমি পাগল হয়ে গেছো," ব্র্যাকেট বিড়বিড় করে বললো। "ও আমি করবো না। ভগবানের দোহাই একবার শুধু এলার কথা চিন্তা করো।"

"তুমি কি জানো না যে আমি তার কথাই চিন্তা করছি?" জেসি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো। সে ব্র্যাকেট এর জামার আস্তিন চেপে ধরলো। "সেই ভেবেই তো মনস্থির করলাম, টম।" তাব কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে প্রায় যন্ত্রণাদায়ক ফিসফিসানিতে পরিণত হলো। "যে রাত্রে এগবার্ট আমাদের বাড়ি গিয়েছিল যেন তাকে প্রথম দেখছি এমনিভাবে এলার দিকে তাকিয়েছিলাম। সে আর সুন্দর নেই, টম।" ব্র্যাকেট মাথা ঝাঁকিয়ে সবে দাঁড়ালো। অশ্রুমাখা দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে জেসি তাকে অনুসরণ করলো। "এলা কি তোমায় কিছু বলে না, টম? মনে পড়ে, এলা ছিল যেন একটা ডল পুতুলের মতো। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া যেতো না, কেউ না কেউ ফিরে তাকাতো তাকে দেখবার জন্য। এখনও তার বয়স ২৯ বছরও হয়নি, টম—তাকে আর সুন্দর দেখতে নেই!"

ব্র্যাকেট ক্লান্তভাবে তার কাঁধ দুটো ঝুঁকিয়ে বসে পড়লো। হাতদুটো একত্র করে চেপে ধরলো তারপর ঝুঁকে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

জেসি তার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো, তার বিশুষ্ক মুখ আবেগ রক্তিম, মুখে মিনতি ও নিদারুণ আত্মগ্লানির ভাব অপ্রীতিকর বলা চলে। "এলার ওপর আমি অন্যায় করেছি, টম। এর থেকে অনেক বেশি কিছু পাবার উপযুক্ত এলা। আমাব মনে হয় আমার সারা জীবনে তার জন্য কিছু করাব এটাই হলো একমাত্র সুযোগ। আমি একটা অপদার্থ।"

"বাজে বোকো না," রাগদ্বেষহীনভাবে ব্র্যাকেট মন্তব্য করলো। "মোটেই তুমি অপদার্থ নও। অন্তত আমার থেকে বেশি নও। লক্ষ লক্ষ লোকের আজ এই একই রকম অবস্থা। এ হলো বাজার মন্দা, কিংবা অর্থনীতির অবনতি কিংবা হতচ্ছাড়া নিউডিল' (New Deal) কিংবা·····"। গালাগাল দিয়ে সে চুপ করে গেল।

"না, না," জেসি বেদনভরা কণ্ঠে অভিজ্ঞের মতো তাকে শুধরে দিলো, "ও সব ব্যাপারগুলো অন্যদের ক্ষমা করতে পারে। কিন্তু আমাকে নয়। এর থেকে ভালো করার দায়িত্ব ছিল আমার। এ দোষ আমার নিজেরই।"

"তোমার মাথা!" ব্র্যাকেট বললো।

জেসির মুখ অস্বাস্থ্যকর রকমের লাল হয়ে গেলো।

মনে হলো মুখটা যেন ফুলে গেছে। "আমি তোয়াক্কা করি না," পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো সে। "আমি কিচ্ছু তোয়াক্কা করি না। এটা আমাকে তোমায় দিতেই হবে। আমায় মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। এক ধরনের নরকের মধ্যে দিয়ে গেছি বটে কিন্তু আরো একটার মধ্যে যেতে পারবো না। তুমি কি চাও আমি আমাব

ছেলের পাদুটোর দিকে তাকাই আর নিজেকে বলি আমার একটা চাকরি থাকলে তার এই দশা হতো না ? প্রতিবার হাঁটার সময় সে আমাকে বলে "রিকেট" হয়ে আমার হাড়গুলো নরম হয়ে গেছে। তোমারই জন্যে, তুমি আমাকে ঠিক মতো খাবার দাওনি! ভগবান, টম, তুমি কি মনে করো আরো ছ'বছর ধরে আমি ওকে এমনি অবস্থায় দেখে যাবো ?"

ব্র্যাকেট লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। "যদি তাই করে যাও তাতে হলো কি ?" সে চিৎকার করে উঠলো। "তুমি বলছো তুমি এলার কথা চিন্তা করছো। তুমি মরে গেলে তার কি রকম লাগবে ?"

"হয়তো মরবো না", জেসি মিনতি করে বললো। "কোনো না কোনো সময় আমার ভাগ্যটা একটু ফিরবে।" 'ওরাও সকলে সেই কথাই ভাবে", ব্র্যাকেট অবজ্ঞার ভরে উত্তর দিলো। "এই চাকরি নিলে ভাগ্যটা তোমার হয়ে যাবে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন। একমাত্র নিশ্চিত জিনিস হলো, আগেই হোক আর পরেই হোক, কোনো না কোনো সময় তুমি মরে যাবেই।"

"ঠিক আছে," জেসি চিৎকার করে বললো। "মরেই না হয় যাবো! কিন্তু তার আগে তো কিছু পাবো, তাই নয় কি ? আমি একজোড়া জুতো তো কিনতে পারবো, আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখো! আমি একটা স্যুট কিনতে পারবো, যে স্যুটের কার্ট দেখে মনে হবে না রিলিফ ছাপ দেওয়া আছে। সিগারেট খেতে পারবো। বাচ্ছাদের জন্য লজেন্স কিনতে পারবো। আমি নিজেও খেতে পারবো। হ্যাঁ, বটেই তো আমি লজেন্স খেতে চাই। দিনে এক গ্লাস করে বীয়ার চাই। আমি চাই এলা ভালো করে সাজগোজ করুক। আমি চাই সপ্তাহে সে যেন তিনবার কি চারবার করে মাংস খাক। আমি আমার পরিবারের সকলকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চাই।"

ব্র্যাকেট বসে পড়লো। "আঃ, চুপ করো," সে ক্লান্তভাবে বলে উঠলো।

"না," জেসি মৃদুকণ্ঠে আবেগের সঙ্গে তাকে বললো। "তুমি আমাকে ঘাড় থেকে নামাতে পাববে না। শোন, টম" সে মিনতি করে বললো, "সবকিছু আমি ভেবে রেখেছি। মাসিক ছ'শো ডলার থেকে কতটা বাঁচাতে পারবো ভাবো। যদি তিন মাসও টিঁকে থাকি, তাহলে ভাবো কত ডলার হয়— হাজার ডলার—তারও বেশি! আব আমি হয়তো আরো বেশিদিন টিঁকে যেতে পারি। হয়তো বছর দুয়েক। এলার সারা জীবনের জন্য ব্যবস্থা করে যেতে পারি!"

"ঠিক বলেছ", ব্র্যাকেট বাধা দিয়ে বললো। 'তুমি বোধহয় ভাবছো তুমি এই ধরনের কাজ করছো জেনে এলা খুব আনন্দে থাকবে ?"

'তাও আমি ভেবে রেখেছি", জেসি উত্তেজিতভাবে উত্তর দিলো। "ও তা জানবে না, বুঝেছো ? ওকে বলবো আমি মাত্র চল্লিশ ডলার করে পাচ্ছি। বাকিটা তুমি ওর নামে ব্যাঙ্কে জমা দেবে, টম।"

"আঃ চুপ করো," ব্র্যাকেট বললো। "তুমি ভাবছো তুমি সুখী হবে ? প্রতিটি মুহূর্ত, জেগে কি ঘুমিয়ে, তুমি চিন্তা করবে আগামী কাল তুমি বেঁচে থাকবে কি না।

সব থেকে খারাপ হবে তোমার ছুটির দিনগুলো, যখন তুমি গাড়ি চালাবে না। একদিন অন্তর অন্তর ওদের তখন তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে তোমার মনের সাহস ফিরে পাবার জন্য। আর তুমি তখন বাড়িতে শুয়ে বসে মর্মযন্ত্রণা ভোগ করবে। ঠিক সেই রকম সুখী হবে তুমি।"

জেসি হেসে উঠলো। "আমি সুখী হবো। তুমি কিছু ভেবো না, আমি খুবই সুখী হবো, আমি গান গাইবো। ভগবান, টম, গত সাত বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি নিজের সম্বন্ধে গর্ব বোধ করবো।"

"আঃ, চুপ করো, চুপ করো" ব্র্যাকেট বললো।

ছোট চালা ঘরের ভেতরটা নিঃস্তব্ধ হয়ে গেলো। একটু পরে জেসি ফিসফিস করে বললোঃ "এটা তোমাকে করতেই হবে টম, এটা তোমাকে করতেই হবে। করতেই হবে।"

আবার সব নিঃস্তব্ধ। ব্র্যাকেট তার হাত দুটো মাথার ওপর তুলে হাতের তালু দিয়ে কপাল চেপে ধরলো।

"টম, টম—" জেসি বললো।

ব্র্যাকেট দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "নিকুচি করেছে," সে অবশেষে বললো। "ঠিক আছে, আমি তোমায় নেবো, ভগবান আমায় রক্ষা করুন।" তার গলার স্বর নিচু, ভাঙা ভাঙা, অপরিসীমভাবে ক্লান্ত। "যদি আজ রাত থেকেই চালাবার জন্য তৈরি থাকো তো আজ রাত থেকেই চালাতে পারবে।"

জেসি কোনো উত্তর দিলো না' উত্তর দিতে পারলো না। ব্র্যাকেট মুখতুলে তাকালো। জেসি-র গাল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়ছিল। ঢোক গিলছিল আর কথা বলার চেষ্টা করছিল সে কিন্তু শুধুমাত্র একটা অদ্ভুত হাঁপানির শব্দ বার হচ্ছিল।

"এলাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেবো", ব্র্যাকেট বললো, সেই একই রকম ভাঙা ভাঙা ক্লান্ত কণ্ঠে। "ওকে জানাবো তুমি চাকরি পেয়েছো, দু'এক দিনের মধ্যেই তাকে তার গাড়ি ভাড়ার টাকা পাঠিয়ে দেবে। তখন তোমার হাতেও কিছু টাকা হবে— অবশ্য, সপ্তাহটা যদি তুমি টিঁকে থাকো, বাঁদর কোথাকার!"

জেসি শুধু ঘাড় নাড়লো। তার হৃদপিণ্ডটা মনে হচ্ছিল ফেটে যাবে তাই সে ওটার ওপর হাত দুটো চেপে রাখলো, যেন ওটাকে তার বুকের মধ্যে আটকে রাখবে।

"ছ'টার সময় এখানে ফিরে এসো," ব্র্যাকেট বললো। "এই নাও কিছু পয়সা। ভালো করে খেয়ো।"

"ধন্যবাদ," জেসি ফিসফিস করে বললো।

"একটু দাঁড়াও", ব্র্যাকেট বললো। "এই আমার ঠিকানা।" ওটা সে একটুকরো কাগজে লিখে দিলো। "ওদিকে যাচ্ছে এমন কোনো বাসে উঠে পড়ো। কনডাকটারকে জিজ্ঞাসা করো কোথায় নামতে হবে। স্নান করে একটু ঘুমিয়ে নিও।"

"ধন্যবাদ", জেসি বললো। "ধন্যবাদ, টম।"

"হয়েছে, এখান থেকে যাও এখন", ব্র্যাকেট বললো।

"টম!"

"কি?"

"আমি শুধু—" জেসি থেমে গেলো। ব্র্যাকেট তার মুখ দেখতে পেলো, চোখ দুটো তখনও অশ্রুসজল, কিন্তু বিশুষ্ক মুখখানা এক অদ্ভুত দীপ্তিতে উদ্ভাসিত।

ব্র্যাকেট মুখ ফিরিয়ে নিলো। "আমি একটু ব্যস্ত আছি", সে বললো।

জেসি বেরিয়ে গেলো। চোখের জলের আচ্ছাদন তাকে অন্ধ করে দিলো, কিন্তু সমস্ত জগৎটা যেন মনে হলো সোনালী হয়ে গেছে। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ধীর গতিতে চললো, তার রগের মধ্যে রক্ত দপদপ করছিল আর মনের মধ্যে ছিল অদম্য, অন্যকে বোঝানো যায় না এমন একটা আনন্দ। "পৃথিবীতে আমি সব থেকে সুখী মানুষ" সে ফিসফিস করে নিজেকে বললো। "সারা জগতে আমিই সব থেকে সুখী মানুষ, আমি হচ্ছি সব থেকে সুখী মানুষ।"

ব্র্যাকেট বসে তাকিয়ে রইলো যতক্ষণ পর্যন্ত না জেসি রাস্তার মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তারপর দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে কুঁজো হয়ে বসলো। তার বুকের ভেতরটা যন্ত্রণাদায়কভাবে ধকধক করছিল, পুরোনো বন্ধ হয়ে আসা জিনিসের মতো। সে তার ধকধকানি শুনছিল। দু হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে সে একটা বেপরোয়া প্রশান্তির মধ্যে বসে রইলো।

বন্যার পরে

রচনা : রিচার্ড রাইট

বন্যার জল নেমে গেলে
নদীর পাশের গরিব মানুষদের
আবার গোড়ার থেকে জীবন
যাত্রা শুরু করতে হয়।

অবশেষে বন্যার জল নেমে গেল। কর্দমাক্ত মাঠগুলোর মধ্যে দিয়ে একটু কবে সরু রশিতে বাঁধা শ্রান্ত একটা গাইকে টেনে নিয়ে চলেছে কৃষ্ণাঙ্গ এক বাপ, কৃষ্ণাঙ্গ এক মা, আর কৃষ্ণাঙ্গ এক শিশু। একটি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে তারা কাঁধের ওপরের পোঁটলাপুঁটলিগুলো একটু নাড়াচাড়া করে রাখলো। যতদূর দৃষ্টি যায় চারিপাশের জমি বন্যার জলে বয়ে আসা পলিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ছোট মেয়েটি শীর্ণ একটা আঙুল তুলে কর্দমাক্ত এক কুটিরের দিকে দেখালো।

'বাবা দেখো। ওই তো আমাদের বাড়ি, তাই না?' আনত কাঁধ, নীল রঙের জীর্ণ ওভার অল (একত্রে সংযুক্ত সার্ট ও ট্রাউজার) পরনে লোকটি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিযে রইলো। শরীরের একটা পেশিও তার নড়লো না, প্রায় ঠোঁট না নেড়েই সে বললো : 'হ্যাঁ'।

মিনিট পাঁচেক তারা নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এখানে বন্যার জল আট ফুটের বেশি উঠেছিল। প্রতিটি গাছ, প্রতিটি ঘাসের ডগা আর প্রতিটি ফুটোর গায়ে লেগে রয়েছে বন্যার চিহ্ন ; হলুদ রঙের কাদা। জমির গায়ে লেপটে রয়েছে কাদা, সেই জমাট বাঁধা কাদার মাঝে মাঝে ইতঃস্তুতভাবে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফাটল ধরেছে। রিক্ত মাঠগুলোর ওপর দিয়ে বয়ে এলো বসন্তের ঝোড়ো বাতাস। ঊর্ধ্বে আকাশ, নীলবরণ, সাদা মেঘ আর রৌদ্রে ভরা। এসব কিছুকে আচ্ছন্ন করেছে প্রথম দিনের অপরিচয়।

'মুরগির খাঁচাটা গেছে',নিঃশ্বাস ফেলে বললো মেয়েটি।

'শুয়োরের খোঁয়াড়টাও গেছে', নিঃশ্বাস ফেলে বললো লোকটি। তাদের কথার মধ্যে কোনো তিক্ততা ছিল না।

'মনে হয় মুরগিগুলোও সব ডুবে মরেছে।'

'তাই হবে'।

'মিস ফ্লোরার বাড়িও ভেসে গেছে', ছোট্ট মেয়েটি বলে উঠলো।

তাদের প্রতিবেশীর বাড়িটা যে জায়গায় ছিল সেইখানের কতকগুলো গাছের দিকে তাকালো তারা।

'হায় ভগবান!'

'ওরা যে কোথায় তা কি কেউ জানে বলে তোমার মনে হয়?'

'সে কথা বলা শক্ত'।

পুরুষটি টিলার ঢাল বেয়ে নেমে গিয়ে অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'এখানে কোথায় যেন একটা রাস্তা ছিল না', সে বললো।

এখন আর সেখানে কোনো রাস্তা ছিল না। ছিল শুধু হলুদ রঙের খাঁজ কাটা কাটা পলিমাটিতে ঢাকা বিস্তীর্ণ এলাকা।

'টম, দেখো!' মেয়েটি ডাক দিয়ে বললো। 'আমাদের ফটকের খানিকটা এখানে পড়ে আছে।'

ফটকের খুঁটিটার অর্ধেকটা মাটির মধ্যে গাঁথা। মরচে কব্জা একটা একক আঙুলের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেটা উপড়ে নিয়ে টম নিজের হাতের মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরলো। ওটাকে কাজে লাগাবার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য তার ছিল না; ওটাকে শুধু শক্ত করে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। শেষ পর্যন্ত কব্জাটা ফেলে দিয়ে মুখ তুলে সে বললো :

'চলে এসো। ওখানে একবার নেমে গিয়ে দেখি কি করতে পারা যায়'।

একটু নিচু জায়গায় তৈরি বলে কুটিরের চারপাশের জমি বেশ নরম আর পিছলা হয়েছিল।

'চুনের বস্তাটা একবার দাও তো, মে', ও বলেলো।

জুতোর মধ্যে তার কাদা ঢুকেছিল, তাই নিয়েই সে তার মোটামোটা আঙুলগুলো দিয়ে কুটিরের চর্তুদিকে সাদা চুন ছড়াতে ছড়াতে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো। চর্তুদিকে ঘুরে আবার সামনে এলো যখন তখন বস্তার মধ্যে চুনের খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট রয়েছে; বারান্দার ওপর বস্তাটা রেখে দিলো, চূণের ভাসমান সুক্ষ্ম কণাগুলো সূর্যেব আলোয় চিকচিক করছিল।

'এতে খানিকটা সুবিধা হতে পারে, টম বললো।

'স্যাল, তুই একটু সাবধান হ' বাছা'। সে বললো।

'ঐ কাদার মধ্যে আবার যেন আছাড় খেয়ে পড়িস না, কথাটা কানে গেল কি?

'হ্যাঁ, মা'।

সিঁড়ির ধাপগুলো নেই। মে আর স্যালিকে টম বারান্দার ওপর তুলে দিলো। কুটিরের আধখোলা দরজার দিকে তাকিয়ে ওরা এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো। কুটির ছেড়ে যাবার সময় টম দরজাটা বন্ধ করেই গিয়েছিল তবু খোলা অবস্থায়

ওটাকে দেখতে পাওয়াটা তার কাছে স্বাভাবিকই লেগেছিল। বারান্দার তক্তাগুলো সব ফুলে বেঁকে গেছে। কুটিরের গা এখন দুরঙা ; তলার দিকটা একেবারে গাঢ় হলুদ রঙ ; উপরের দিকটার সেই চিরপরিচিত ছাই রঙ। কেমন অদ্ভুত লাগছিল, যেন কুটিরের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছ ওরই প্রেতাত্মা।

গাইটা ডেকে উঠলো।

'বারান্দার ধারের খুঁটিটায় প্যাটকে বাঁধো, মে।'

মে ধীরে ধীরে শ্রান্তভাবে রশিটা বাঁধলো। সামনের দরজাটা খুলতে গিয়ে ওরা দেখে ওটা প্রায় নাড়ানোই যাচ্ছে না। কাঁধ লাগিয়ে টম সজোরে একটা ধাক্কা মারতে একটা ঝাঁকি মেরে ঘষটে ঘষটে খুলে গেলো। সামনের ঘরটা অন্ধকার, নিস্তব্ধ। বন্যার জলে ভেসে আসা পলিমাটির ভেজা গন্ধ নতুন করে তীব্রভাবে তাদের নাকে এসে লাগলো। ওপরের দিকের জানলাটার অর্ধেকটা মাত্র ফাঁকা ছিল, তারই মধ্য দিয়ে নিষ্প্রভ আলোর একটা ফালি এসে পড়েছিল। মেঝে কাদায় ভরা। মৌন একটা সতর্ক বাণীর মত। খরের বেশ উঁচুতে দেওয়ালের গা বেয়ে বন্যার জলের একটা কাঁপাকাঁপা দাগ চলে গিয়েছে। টেরছাভাবে একটা ড্রেসিং টেবিল পড়ে আছে, ওটার দেরাজ আর পাশগুলো একটা মৃতদেহের মতো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তোষকসমেত খাটটাকে মাটির তৈরি একটা বিরাট বাক্স বলে মনে হচ্ছে। ঘরের কোণায় দুটো ভাঙা চেয়ার, বিপদ থেকে রক্ষা পাবার আশায় যেন একত্রে এসে জড়ো হয়েছে।

'এবার রান্নাঘরের ভেতরটা দেখা যাক', টম বললো। উনোনের নলটা নেই। উনোনটা কিন্তু সেই আগের জায়গাতেই রয়েছে।

'চুলোটাতো ঠিকই আছে। ওটাকে সাফ করে নিতে পারবো।'

'তা বটে।'

'কিন্তু টেবিলটা কই ?'

'ভগবান জানেন।'

'মনে হয় অন্যসব জিনিসপত্রের সঙ্গে ওটাও ভেসে গেছে।'

পিছনের দরজা খুলে ওরা বাইরের দিকে তাকালো। গোলা ঘর, মুরগির খাঁচা আর শূযোরের খোঁয়াড়। কিছুই চোখে পড়লো না।

'টম, পুরোনো পাম্পটা বরং একবার চালিয়ে দেখো, জল ওঠে কি না।'

পাম্পটা বেশ শক্ত লাগলো। হাতলের ওপর তার শরীরের সম্পূর্ণ ভারটা দিয়ে টম ওটাকে একবার ওঠাতে একবার নামাতে লাগলো। একটু জলও পড়লো না। পাম্প সে করেই চললো। শুকনো একটা ফাঁকা আওয়াজ বেরোতে লাগলো। তারপর ঝির ঝির করে হলুদ রঙের জল বেরোতে লাগলো। নিঃশ্বাস বন্ধ করে টম পাম্প করে চললো। পরিষ্কার জল বেরোতে লাগলো অবাধে।

'ভগবান রক্ষা করেছেন। জলটা অন্তত পাওয়া গেছে। ব্যবহার করার আগে জলটা বরং ফুটিয়ে নিও', সে বললো।

'হ্যাঁ গো। জানি সেটা।'

'বাবা, দেখো! এই তো তোমার কুড়ুল,' স্যালি ডাক দিয়ে বললো।

টম তার কাছ থেকে কুড়ুল নিয়ে নিলো। 'হুম, এটা আমার কাজে লাগবে।

'এখানে আরো কি সব রয়েছে,' স্যালি কাদার মধ্যে থেকে চামচগুলেকে খুঁড়ে বার করতে করতে হাঁক দিয়ে বললো।

'যাক, এবার একটা বালতি নিয়ে সাফসুতরো করতে আরম্ভ করা যাক, সে বললো।' আব দেবি করে কাজ নেই, রাতে তো এই মেঝের ওপরেই শুতে হবে।

পাম্প থেকে বালতি করে জল তুলতে তুলতে সে শুনলো কুটিরের কাছ থেকে টম তাকে ডাকছে। 'মে দেখো, দেখো! আমার লাঙলটা খুঁজে পেয়েছি।' গর্বিতভাবে কাদামাখা লাঙলটা সে পাম্পের কাছে টেনে নিযে এলো। 'ধুয়ে নিলেই ঠিক হযে যাবে।'

'আমার ক্ষিদে পেযেছে' স্যালি বলে উঠলো।

'একটু সবুব কর। সকালেই তো খেযে এসেছিস।' সে বললো। তারপর টমের দিকে ফিবে তাকালো। 'এখন কি কবব বলো টম?'

কর্দমাক্ত মাঠগুলোর দিকে তাকিয়ে টম দাঁড়িয়ে বইলো।

'বার্জেসের কাছে কি আবার ফিরে যাবে?'

'তাই করতে হবে বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'তাছাড়া আর কি করবো বলো?'

'কিছু না,' টম বললো। 'ভগবান, কিন্তু সেই সাদা চামড়ার লোকটার কাছে গিযে আবার গোড়াপত্তন করতে হবে একথা ভাবতেই খারাপ লাগছে। পারলে এখান থেকে চলেই যেতাম। আমাব কাছে ওর আটশো ডলার মতো পাওনা। এখন আমাদের দরকার একটা ঘোড়ার, খাবারের বীজের আর অনেক জিনিসের। এইভাবেই চলতে থাকলে ঐ সাদা চামড়ার লোকটাব কাছে আমাদের চুল পর্যন্ত বাঁধা পড়বে।'

'কিন্তু, টম, এছাড়া আমাদেব তো আর কিছু করার নেই', সে বললো।

'যদি পালাবার চেষ্টা করি তাহলে ওরা আমাদের গরাদে পুরবে।'

'তার থেকেও খারাপ কিছু হতে পারতো!'

রান্নাঘর থেকে স্যালি দৌড়ে এসে ডাকলো, 'বাবা!'

'অ্যাঁ?'

'রান্নাঘবের একটা তাকে বানের জল লাগেনি!'

'কোনখানে?'

'চুলোর ঠিক ওপারে।'

'কিন্তু ওখানে তো কিছু নেই, মা', সে বললো।

'কিন্তু ওর ওপর কি যেন রয়েছে,' স্যালি বললো।

'চল দেখি গিয়ে।'

তাকের ওপর এক বাক্স দেশলাই, বানের জলের ছোঁওয়া লাগেনি তার গায়ে। আর তার পাশেই রয়েছে আধ বস্তা বুল ডারহাম (Bull Durham) তামাক। দেশলাইয়ের বাক্স থেকে একটা কাঠি বার করে টম নিজে ওভারঅলের গায়ে ঘষে জ্বালালো। জ্বলতে জ্বলতে আঙুল ছুঁই ছুঁই করতেই কাঠিটা সে ফেলে দিলো।

'মে!

'অ্যাঁ?'

'দেখো। এখানে আমার তামাক, দেশলাই সব রয়েছে!' অবিশ্বাস্যভাবে সে তাকিয়ে দেখলো। 'ভগবান।' ফিস ফিস করে বললো সে।

যেমন তেমন করে একটা সিগারেট বানালো টম।

সে উনোন ধুয়ো কতকগুলো কাঠকুটো জড়ো করলো, তারপর অনেক কষ্টে উনোন ধরালো। উনোন থেকে ধোঁওয়া বেরোতে লাগলো, ওদের চোখ জ্বালা করছিল। জল গরম করতে বসিয়ে সে গেল সামনের ঘরে। অন্ধকার হয়ে আসছিল। পৌঁটলা থেকে একটা কেরোসিনের ল্যাম্প বার করে জ্বালালো সে। বাইরের ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে থেকে প্যাট ব্যাকুলভাবে ডাকতে ডাকতে তার গলার ঘণ্টা নাড়তে লাগলো।

'বুড়ি গাইটার ক্ষিদে পেয়েছে', মেয়ে বললো।

'মনে হচ্ছে এবার বার্জসের কাছে যেতে হবে।'

বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো ওরা।

তুমি এইবেলা যাও টম, বেশি অন্ধকার হয়ে যাবে শেষে।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। পূর্ব আকাশে একরাশ তারা দেখা যাচ্ছে।

'তুমি এবার যাচ্ছো তো, টম?'

'মনে হচ্ছে যেতেই হবে।'

'মা আমার ক্ষিদে পেয়েছে', স্যালি বললো।

'একটু সবুর কর, সোনা। মা তো জানে তোর ক্ষিদে পেয়েছে।'

তার সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টম একটা নিঃশ্বাস ফেললো।

'দেখো! কে যেন আসছে।'

'এতো দেখছি মিঃ বার্জেস!'

কাদামাখা একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামলো। লোমওয়ালা ঘোড়াটার সাবা গায়ে কাদার ছিট। গাড়ির থেকে তার সাদা মুখটা বার করে বার্জেস থুথু ফেললো।

'বেশ, বেশ, তোমরা সব ফিরে এসেছো দেখছি।'

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'ব্যাপার কেমন বুঝছো?'

'ব্যাপার মোটেই সুবিধের নয় হুজুর।

'কেন, হয়েছে কি?'

'কি আর বলবো। ঘোড়া নেই, খাবার নেই, কোনো কিছু নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু ঐ বুড়ি গাইটা ....।'

'দোকানে তোমার আটশো ডলার ধার, টম।'

'হ্যাঁ, হুজুর সেটা আমি জানি। কিন্তু মিঃ বার্জেস এখন আমার এই দৈন্যদশা দেখে ওর থেকে কিছুটা কি বাদছাদ দিতে পারেন না?'

'ওসব খাবার দাবার তো তুমিই খেয়েছো টম, সেগুলোর জন্য কি আমাকে পয়সা দিতে হবে?'

'হ্যাঁ হুজুর সেটা আমি জানি।'

'একটু কঠিন হবে টম। কিন্তু ওটাতো তোমাকে শুধতেই হবে। আজ অকালে দুই ছোকরা দেনা এড়াবার জন্য পালাবার চেষ্টা করেছিল, তাদের ধরবার জন্য আমায় শেরিফ (জেলার নির্বাচিত উচ্চপদস্থ কর্মচারী — জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত)-কে ডাকতে হল। তোমার কাছ থেকে আমি অবশ্য কোনো ঝামেলার ভয় করছি না, টম ....। বাকি পরিবারগুলো সব ফিরে যাচ্ছে।

গাড়ি থেকে ঝুঁকে পড়ে বার্জেস অপেক্ষা করে রইলো। চতুর্দিকে নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে গাইয়ের গলার ঘণ্টাটা আবার বেজে উঠলো। একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে টম দাঁড়িয়ে রইলো।

'তোমাকে যেতেই হবে টম। ঘরে আমাদের কিছু নেই,' মে বললো।

টম বার্জেসের দিকে তাকালো।

'আমি কোনো ঝামেলা বাঁধাতে চাইনা মিঃ বার্জেস। কিন্তু আমার পক্ষে এটা বড্ড বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আমার এখন আগের থেকেও খারাপ অবস্থা। একেবারে গোড়ার থেকে শুরু করতে হবে আমায়।'

'গাড়িতে উঠে পড়ো, আমার সঙ্গে চলো আমি তোমার খাবারের ব্যবস্থা করে দেবো। তারপর কি করে সেটা তুমি শোধ দেবে সেটা নিয়ে কথা বলা যাবে।' টম কোনো কথা বললো না। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে কর্দমাক্ত মাঠগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো।

'তাহলে', বার্জেস জিজ্ঞাসা করলো। 'তুমি আসছো তো?' টম কোনো কথা বললো না। ধীরে ধীরে বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে গাড়ির মধ্যে উঠলো। মে দেখলো তারা গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলো।

'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, টম!'

'ঠিক আছে'।

'মা, বাবাকে বলো আমার জন্য একটু গুড় নিয়ে আসবে,' স্যালি মিনতি করে বললো।

'শোনো, টম!'

'অ্যাঁ?'

'স্যালের জন্য একটু গুড় নিয়ে এসো!

'ঠিক আছে।'

সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো কর্দমাক্ত টিলার ওপর দিয়ে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেলো। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে স্যালির হাত ধরে কুটিরের দিকে ফিরলো।

[Richard Wright-এর The Man Who Saw The Flood গল্পের ছায়াবলম্বনে]

ৎসাবুনিয়া

কনস্তানতিন লর্দকিপানিদজে

যখন বৃষ্টি পড়ে (ইমেরেতিতে মার্চ এপ্রিল মাসে বরাবরই বৃষ্টি হয়) আর রিয়োনির ঝোপগুলো থেকে বাতাস পীচ আর বুনো প্লাম ফুলের গন্ধ আনে, ছোট্ট ৎসাবুনিয়া তার মাকে জিজ্ঞাসা করে :

"মা, তোমার চাদরটা কি আমি গায়ে দিতে পারি ?"

"হ্যাঁ', বাছা।"

ৎসাবুনিয়া পুরোনো বাক্স থেকে ওটাকে টেনে বার করলো, পাখির পালকের মতো চাদরটা বাতাসে সাদা পায়রার মতো উড়তে লাগলো।

ৎসাবুনিয়া চাদর দিয়ে নিজেকে এমন আঁট সাঁট ভাবে জড়িয়ে নিলো যে শুধু তার মেছেতার দাগ ওয়ালা ছোট্ট নাকটি আর তার আগুনে সেঁকা লাল লাল পাগুলো দেখা যেতে লাগলো। বাচ্ছা মেয়েটির জন্য তার বাপের গলোশগুলো (বৃষ্টি বাদল থেকে বাঁচাবার জন্য জুতোর ওপর পরবার একরকম জুতো) পাপোষের ওপর প্রস্তুত হয়ে ছিল।

"ঐ যাচ্ছে আবুলাদজেদের মেয়েটা", প্রতিবেশীরা বলাবলি করতো গ্রামের ভিজে রাস্তার ওপর দিয়ে বড় মাপের গলোশ গুলোর চটাশ -চটাশ শব্দ যখন তাদের কানে আসতো।

সকলেই জানতো এত সকালে ছোট্ট ৎসাবুনিয়া তড়বড়িয়ে কোথায় চলেছে। সে চলেছে বাতুমি ট্রেনের হাসপাতাল গাড়ি দেখতে।

যদি দিনটা একটু পরিষ্কার হয়ে যেতো, তাহলে ৎসাবুনিয়া তার হলুদ রঙের জুতো আর গলোশগুলো খুলে খালি পায়ে রাস্তা দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলতো। সে অবশ্য জলে ভরা খানা-খোন্দলগুলো বাঁচিয়ে চলতো না। দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে সেগুলো সে লাফ দিয়ে পার হতো। মাঝে মাঝে কিন্তু তার আন্দাজ ঠিক হত না আর গিয়ে পড়তো গর্তের মাঝখানে। লজ্জায় তখন সে একেবারে লাল হয়ে যেতো আর তাড়াতাড়ি কান্না গিলে ফেলতো। কিছুই যেন হয়নি এমনি ভাবে নিঃশব্দে চলতো।

ওষুধের দোকানের কাছে, যেখানে বড় রাস্তা শুরু হয়েছে। সেখানে গিয়ে ৎসাবুনিয়া তার জুতো পায়ে দিতো। গ্রামের মেয়েরা ফুটপাতের ওপর বসে পড়ে কিংবা দোকানের দেওয়ালের গায়ে ভর দিয়ে তাদের জুতো বদলাতো। ৎসাবুনিয়া কিন্তু তা করতো না, এক পায়ে ভর করে সে জুতো পরে নিতো। তারপর তড়বড় করে সে স্টেশনে চলে যেতো।

সে বছর ৎসাবুনিযা এগারোয় পড়েছে। বোনার কাঁটার মতো সিড়িঙ্গে, হাতগুলো লম্বা লম্বা সরু সরু কনুইগুলো খোঁচা খোঁচা।

তার নাক আর গালগুলো সোনালি রঙের মেছেতায ভরা, তার মুখের ওপর কে যেন এক চালনীভরা ভুসি ছুঁড়ে দিয়েছে।

কালে ৎবাসুনিয়া হয় তো বেশ সুশ্রী, সৌষ্ঠবময়ী নারীতে পরিণত হবে …। কিন্তু আমি যখন তাকে প্রথম দেখি তখন সে ছিল তার বয়সী যে কোনো মেয়ের মতোই কুৎসিত আর শীর্ণ।

সাসত্রেদিয়া স্টেশনের সকলেই ওকে চিনতো, লালটুপি মাথায় সহকারী স্টেশান মাস্টার তার অফিসে ঢোকা মাত্রই ছোট্ট মেয়েটিকে হাসপাতাল গাড়িতে ঢোকার ইঙ্গিত করা হলো।

বদ্ধ, গুমোট কামরার মধ্যে উঁকি দিয়ে ৎসাবুনিয়া জিজ্ঞাসা করলো ·

"খুড়ো, তুমি কি কাচের লোক ?"

ওষুধ পত্র, ক্ষত আর তামাকের গন্ধে বাচ্ছা মেয়েটির প্রায় বমি আসছিল কিন্তু সে এটাও বুঝতে পেরেছিল যে কিছুক্ষণ বাদে ওসব গ্রাহ্যও করবে না।

শানটিং এঞ্জিন হাসপাতাল গাড়িটাকে সাইডিং পৌঁছে দেবার আগেই ৎসাবুনিযার সব কামরাগুলোয় গিয়ে খোঁজ করা আর প্রতিটি সৈনিকের সঙ্গে কথা বলা হযে গেছে।

'পাঁচ মাস হলো আমার বাবার কাছ থেকে কোনো চিঠি পত্র পাইনি। আমাদের পদবী হলো আবুলাদজে। তোমরা কি তাকে দেখেছো কোথাও ?'

"তোমার বাবার নাম কী ?"

"ভালিকো।"

"ভালিকো আবুলাদজে। না গো, বাছা, তাকে আমি দেখিনি।"

"ধন্যবাদ।"

ইতিমধ্যে আর্দালীরা চলাচলের পথটা বাক্স-পত্র, স্ট্রেচার আর ক্রাচ দিয়ে প্রায বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু ছায়া যেমন কাউকে বিরক্ত করে না একটা ঐ ছোট্ট মেয়েটিও তেমনি ভাবে এক কামরা থেকে আর এক কামরায় নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। প্রতিটি কামরায় তার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগলো :

"তুমি কি কার্চ থেকে আসছো খুড়ো ?"

(২)

ভালিকো আবুলাদজে একজন নতুন বাসিন্দা। সে থাকতো পুরোনো সামত্রেদিয়া

রাস্তার ধারে, আমাঘলেরা পারঘাটের কাছে, যেখানে পরে যুদ্ধের সময়, একটা আঁকা-বাঁকা গলির লাগোয়া এক সারি ডালিম গাছ কেটে ফেলা হয়েছিল আর চওড়া একটা বড় রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল।

মে থেকে শুরু করে শরৎকালের শেষাশেষি পর্যন্ত ভালিকো একটা চায়ের কারখানায় ওজনদারের কাজ করতো।

চা তোলা শেষ হলে, সে কিছুদিন বাড়িতে থাকতো, কিছু জ্বালানি কাঠ কেটে জড়ো করতো, শীতের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য লেবু গাছগুলো মুড়ে দিতো, ছাতের টালিগুলো ঠিক করতো আর কাঠের পুলের কাছের ডোবা থেকে জল নিকাশ করে দিতো। তারপর চলে যেতো সে রেল স্টেশনে।

সেখানে মাল গুদামে সব সময়েই কাজ থাকতো, বিশেষ করে তুমি যদি স্বাস্থ্যবান আর কাজ করতে ইচ্ছুক হতে। তাই ভালিকো বড় বড় শেডে কাজ করতো যতদিন না আবার চায়ের ঝোপে প্রথম পাতা দেখা দিতো।

দিনের শেষে সূর্য যখন পাটে বসতো, তখন সে বগলের তলায় গোটা কতক রুটি নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হতো।

যতই ক্লান্ত হোক না কেন তার বাড়ির দু'কিলোমিটার পথ সাধারণত সে বেশ তাড়াতাড়িই যেতো। কিন্তু মাঝে মাঝে স্টেশনের পানশালায় গিয়ে তার সাথীদের সঙ্গে সে একপাত্র মদ্যপান করতো।

এসব সময় তার বাড়ি পৌঁছতে প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক লাগতো। তার কারণ দু'এক পাত্র পেটে পড়লেই ভালিকো আকাশ কুসুম কল্পনা করতো। কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই একজন তো আর তাড়াতাড়ি পথ চলতে পারে না। ভালিকো নীলচে অন্ধকারে ভরা সন্ধ্যায় কোনোরকমে এগিয়ে চলতো, মদ্যপান উত্তপ্ত মস্তিষ্ক তার নানারকমের চিন্তাভাবনা ও কল্পনাছবিতে যেন টগবগ করে ফুটতে থাকতো।

বল্গা ছেড়ে দিলে, যে কোনো চিন্তা লাগামহীন হয়ে যায়, তোমাকে নিয়ে যায় নতুন নতুন দেশে, কিংবা আঁকে অদ্ভুত অসম্ভব সব ছবি। কিন্তু সে তার অন্তরের গভীরতম অন্তঃস্থলে একটি মাত্র স্বপ্ন পোষণ করতো — একজন দক্ষ কারিগর হবার আর কি শীত কি গ্রীষ্ম — সারাটা বছর ধরে কোনো কারখানায় স্থায়ী ভাবে চাকরি করার।

একবছর সে সান্ধ্য ক্লাসে ভর্তি হবার একটা প্রতিশ্রুতিও পেয়েছিল, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো, সব কিছুর ভিত নড়ে গেলো।

ৎসাবুনিয়া তার বাবাকে প্রায়ই চিঠি লিখতো। সন্ধ্যাবেলায়, ছাগলটার দুধ দোওয়া আর বাসনপত্র মাজা শেষ হলে বাতিটা কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতো যাতে তার ছোট্ট ভাই উচার ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, তারপর বসে যেতো চিঠি লিখতে।

লিখতে অনেক সময় লাগতো। মাঝে মাঝেই সে পেনসিলের শিষটা তার জিবের ডগায় ভিজিয়ে নিতো। প্রতিটি অক্ষর সে লিখতো খুবই যত্ন করে।

"এখানে বরফপড়া শুরু হয়ে গেছে। কাল রাত্রে জল জমে গিয়েছিল, কুঁজো ফেটে গেছে।"

"মেতিয়া মাসীর ছেলে এক ঠ্যাঙ নিয়ে ফিরে এসেছে।"

"মা বলছে তুমি উচাকে চিঠি লিখো, সে বড় বড় ছেলেদের সঙ্গে স্টেশনে গিয়ে শুকনো আপেল চুরি করছে।

"কাল রাত্রে আমরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। জানলাটায় ভালো করে কালো রঙ লাগাইনি! তার ভেতর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল আর হঠাৎ রাতের রক্ষীরা আমাদের জানলার নীচে এসে হুইসেল দিতে লাগলো ....।

"সাশুড়িয়া আমার ভূগোলের বই হারিয়ে দিয়েছে .....।"

এইভাবে ৎসাবুনিয়া তার বাপের সঙ্গে কথা বলতো, তার বাপ ছিল কার্চ পাহাড়ের কোনো একটা জায়গায়। তার বাবাকে সে সব কিছুর সম্বন্ধে লিখতো কিন্তু জীবন-যাপন করা যে কত কষ্টকর, আগুন জ্বালাবার কাঠ নেই তাদের, এমন কি পারিজ খাওয়াটাও একটা বিলাসিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে, একথা সে কখনো লিখতো না।

পরের দিন সে ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই উচা আরম্ভ করতো :

"বাবাকে তুই কি লিখেছিস? আবার আমার নামে লাগিয়েছিস না কি?"

"আমাকে রেহাই দে তো। আমি কোনো চিঠিই লিখিনি।"

"তাহলে তোর ঠোঁটে ওটা কি? আয়নায় দেখ একবার।"

কোনো সাবান পাওয়া যেতো না। শুধু গরম জলে নীল দাগ ওঠানো গেলো না। ছোট্ট একটা আবছা দাগ তার নীচের ঠোঁটে রয়েই গেলো।

শেষ চিঠি এসেছিল ক্রিমিয়ার রণাঙ্গন থেকে। তারপর পাঁচ মাস ব্যাপী এক নীরবতা — তার মধ্যে ডাকহরকরা একটিবারও আবুলাদজেদের ফটকে আসেনি।

মা শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। রেশমগুটি পোকার জন্য যখন তুঁতপাতা সাজাচ্ছিল তখন বেড়ার খুঁটি খসে যায় আর তার পা টি ভাঙে। পা প্লাস্টার করে হাসপাতাল থেকে তাকে বাড়ি আনা হলো, আর তার বিছানাটা রাখা হলো জানালার কাছে। দুপুরে ডাকহরকরা তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে গেলেই, মা ৎসাবুনিয়াকে ডাকতো :

"ৎসাবুনিয়া, একবার যা তো, দেখতো কে চিঠি পেয়েছে? কেউ হয় তো তোর বাবার সম্বন্ধে কিছু লিখছে।"

তারপর কার্চ থেকে আহতদের দল আসতে শুরু করলো। ভোরে ৎসাবুনিয়া সামত্রেদিয়া স্টেশনে যেতো কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকে পেতো না যে তার বাবাকে দেখেছে। মনে হচ্ছিল এই অভিশপ্ত যুদ্ধ যেন ভালিকো আবুলাদজেকে একেবারে গিলে খেয়েছে।

এমনিভাবে বর্ষণস্নাত এপ্রিল মাস কেটে গেলো।

সেদিনটা ছিল হাটবার, স্টেশন একেবারে লোকে লোকারণ্য। ৎসাবুনিয়ার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই হাসপাতাল গাড়িতে ঢুকতে পারলো না। গাড়িটার পাশে ঘোরাফেরা করলো কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

"দয়া করে আমাকে ঢুকতে দাও না, খুড়ো।" সে অনুনয় করলো।

"দাঁড়াও, বাছা। এখন তুমি ভেতরে যেতে পারবে না।"

আহতদের ইতিমধ্যেই গাড়ি থেকে নামানো হয়েছে। রেডক্রশ দেওয়া এ্যাম্বুলেন্স গাড়িগুলো কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের এঞ্জিন চালু করে।

একটি মহিলা ভীড়ের মধ্যে দিয়ে ঠেলেঠুলে ঢুকে এসে দৌড়ে গেল একটা স্ট্রেচারের কাছে, তারপর সৈনিকটির মাথার কাছে কিছু চুরখেলাস (জর্জিয়ার মিষ্টি) রাখলো। তারপর বেশ একটা বড় গোছের দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

প্ল্যাটফর্মের আহতদের মধ্যে ৎসাবুনিয়া একবার চট করে ঘুরে গেলো। প্রত্যেকেই তার সঙ্গে কথা বললো তাকে প্রফুল্ল করার চেষ্টায়। একজন সৈনিক তো তার হাতে এক টুকরো চিনির ডেলাও গুঁজে দিলো। সান্ত্বনা হিসাবে সেইটুকুই তার লাভ। তারা কেউ ভালিকো আবুলাদজেকে চিনতো না।

ৎসাবুনিয়া আরও একটুক্ষণ অপেক্ষা করে রইলো যেন কোনো অলৌকিক ঘটনার আশায়। এইসব অপরিচিত সৈনিকের দল, ওষুধ আর তামাকের গন্ধ, ট্রেনের শব্দ, সমস্ত হট্টগোল তার চোখের সামনে তার বাবার এমন স্পষ্ট একটা ছবি এনে দিলো যে তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এলো।

"এই যে, খুকী", কে যেন হঠাৎ তাকে ডাক দিলো।

লাল গোঁফওয়ালা একজন সৈনিক বেতের তৈরি হালকা স্ট্রেচার থেকে মাথা তুলে হাতছানি দিয়ে ডাকলো তাকে।

ৎসাবুনিযা তার কাছে গেলো। লোকটির ডান পা একটা মদভর্তি থলের মতো ফুলে গেছে। তার নাকের পাটাগুলো এমন পাতলা হয়ে গেছে দেখে মনে হয় ওগুলো যেন স্বচ্ছ।

"তুমি ভালিকো আবুলাদজের কথা জানতে চাইছো কেন?" সে তাকে জিজ্ঞাসা কবলো?

"ও তো আমার বাবা"?

"বটে। তুমি কাঁদছো কেন খুকী? সে তো ভালোই আছে। আমি যেদিন চলে আসি সেদিন তো তার সাথে আমার দেখা হয়েছে। সে তো আমাকে বললো, তোমাকে জানাতে যে সে ভালো আছে, তার জন্য তুমি চিন্তা কোরো না .....।"

কথাগুলো বলে, সে তার দিকে চেয়ে সমঝদারের মতো চোখ টিপলো, যেন তারও বয়স এগারো বছর।

তার বাবা ভালো আছে!

ৎসাবুনিয়ার মেছেতাপড়া গাল দুটোয় রক্ত ছুটে এলো, তার কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করতে লাগলো।

আহত লোকটি ম্লানভাবে হাসলো, আরও কিছু বললো, কিন্তু বাচ্চা মেয়েটা আনন্দে তখন আত্মহারা, কিছু শুনতে পাচ্ছিল না কিছু দেখতেও পাচ্ছিল না।

এত তাড়াতাড়ি সে ঘুরে দৌড়ে যেতে গেলো যে তার জুতোর ফিতে গেলো ছিঁড়ে

আর একটা পা তার জুতোর থেকে বেরিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি সে অন্য পায়ের জুতোটা খুলে ফেলে খালি পায়ে দৌড় দিলো।

গত বছর রেলকর্মীদের ছুটির আবাসনকে হাসপাতালে পরিবর্তিত করা হয়েছে। তিনদিকে সবুজ রঙের বেড়া দেওয়া হয়েছে আর চতুর্থদিকে রয়েছে রিয়োনির পাড়, ফটকের কাছে ডোরাকাটা ছোট একটা ঘর তার গায়ে একটা ধাতুর ফলক আঁটা তাতে লেখা রয়েছে :

"প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ"।

ঘরটার পিছনে বৃদ্ধ এক প্রহরী একটা বেঞ্চির ওপর বসে আছে। তার কোলের ওপর একটা পাত্র, আর তার থেকে খাবার নিয়ে সে ধীরেসুস্থে খাচ্ছে। তার হাত কেঁপে উঠলো। সরুয়াটা যাতে পড়ে না যায়, সেইজন্য চামচটা মুখে তোলার সময় একটু করে লাল আটার পাঁউরুটি নিয়ে সে চামচের নীচে ধরলো। ৎসাবুনিয়া বেড়ার পিছনে লুকিয়ে চুপ করে বসে রইলো যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃদ্ধ প্রহরী তার চামচটা চেটেপুটে একেবারে পরিষ্কার করে খালি পাত্রটা একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখলো। তখন বাচ্চা মেয়েটা ফটকের কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল :

"দয়া করে আমাকে একটু ঢুকতে দেবে, দাদু!"

বৃদ্ধ তার মুখ মুছে, দাঁড়িয়ে ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে রুটির টুকরোগুলো ঝেড়ে ফেলে দিলো।

"তুমি কার সঙ্গে দেখা করতে চাও, খুকী?"

"আমি একজন জখমী সৈনিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"সে কে গো বাছা? তাব নাম কি?"

"তার নাম আমি জানি না দাদু। সে হলো আমার বাবার বন্ধু।"

ৎসাবুনিয়া বেড়ার গায়ের ছোট দরজাটা খুলে, এক নিঃশ্বাসে তার আগের দিন সামত্রেদিয়া স্টেশনে কি হয়েছিল তা বলে গেল।

"ইস! বোকা মেয়ে কোথাকার!" বৃদ্ধ তাকে মৃদুভাবে ভর্ৎসনা করলো। "তার নাম জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলে কি করে?"

বাচ্চাটা বড়দের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেললো!

"আমার মাও ঠিক এই কথাই বললো। প্রথমে আমাকে চুমু খেয়ে কাঁদলো, কিন্তু তারপরেই আবার বকতে লাগলো, কি করে আবার তাকে আমরা খুঁজে পাব? তাকে আমি যে করেই হোক খুঁজে বার করবো বলে কথা দিলে তবে সে ঠাণ্ডা হলো।"

জিবে চুকচুক শব্দ করে, বৃদ্ধ তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলো, "আবুলাদজেদের কোন বংশের মেয়ে তুমি, নদীর ওপাশে যারা থাকে তাদের না গিরিগিটি চাটা'দের?

"গিরিগিটি চাটাদের বংশের" ৎসাবুনিয়া অনিচ্ছার সঙ্গে উত্তর দিলো।

একজন আবুলাদজে বংশের মেয়ের চিরস্থায়ী শত্রুতা অর্জন করতে হলে প্রয়োজন শুধু তাকে তার ঐ অপমানজনক উপনামের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার। এ কাজ

যে করবে সে কখনও আর সেই মেয়ের মন পাবে না যদি সে আকাশের চাঁদ ও পেড়ে এনে তার হাতে দেয়।

কিন্তু এইবার ৎসাবুনিয়া ক্ষেপে উঠলো না।

"তাহলে তুমি হলে পাচুলিয়া আবুলাদজের নাতনী, তাই না?" প্রহরী মুখ টিপে হাসলো। "আমি তোমার ঠাকুর্দাকে ভালো করেই চিনতাম। ঈশ্বর রক্ষা করুন তাঁকে, ভারী ছোট মন ছিল বুড়োর। একবার আমায় রেখেছিল সামুবজাকানস এ কাঠ কাটবার জন্য, আমাকে উপোষ করিয়ে প্রায় মেরে ফেলেছিল। সে তোমাদের বংশের নাম খারাপ করেছে। তার আগে একজনও বংশের নাম খারাপ করেনি। তুমি জানো তোমার ঠাকুর্দা কি করেছিল? হাঃ হাঃ হাঃ।"

ৎসাবুনিয়া অবশ্যই জানে। একবার যখন মাঠে তার খাবার নিয়ে গিয়েছিল তখন তার বীনের পাত্রে একটা গিরগিটি পড়ে গিয়েছিল। লোকে বলে পলকের মধ্যে তার ঠাকুর্দা ঝোল মাখানো গিরগিটিটাকে তুলে নিয়ে চেটেপুটে একেবারে পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

"আমি তোমার কিছু চাই না, কিন্তু তুমিও আমার কাছ থেকে কিছু পাচ্ছো না তা বলে", এই কথা বলে সে গিরগিটিটাকে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

সেই থেকে পাচুলিয়া আবুলাদজে আর তার পরিবারের সকলের নাম দেওয়া হয়েছিল "গিরগিটি চাটা।"

"সে তোমাকে তার পা ধোওয়া জল দিতেও আপত্তি করতো, হাঃ হাঃ।" হাসতে হাসতে প্রহরীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছলো।

তারপর দম নিয়ে সে হাত নেড়ে বলল :

"এখন আমরা কি করবো, লোকটা কোন ওয়ার্ড-এ আছে তা তো আমরা জানি না।

"আমি তাকে দেখলেই চিনতে পারবো। বিরাট একটা লাল গোঁফ আছে তার। তাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করেই চলে আসবো।"

"না, বাছা। আমি যদি তোমাকে যেতেও দিই ভেতরে ওরা তোমাকে আটকে দেবে, আর আমি বকুনি খাবো। তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আমি ভেতরে গিয়ে যে ডাক্তার এখন ডিউটিতে আছে তার সঙ্গে দেখা করি।"

ফটকে চাবি দিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

অনেকক্ষণ আর তার দেখা পাওয়া গেলো না। ৎসাবুনিয়া অস্থিরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো।

"গলির শেষে লরেল গাছের ঝোপের কাছে ঐ যে এক মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাচ্ছো?" ফিরে এসে বৃদ্ধ ৎসাবুনিয়াকে বললো, "ঐ তোমাকে দেখিয়ে দেবে কালকে কারা এসেছে। এখন তুমি যাও তো বাপু।"

(৪)

ক্যাপ্টেন আয়োসেলিয়ানি,

ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার সমীপেষু

কমরেড ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় সার্জিকাল (অস্ত্রোপচার) ওয়ার্ড থেকে আমি আরচিল

মেসখি আপনাকে লিখছি। আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি, কিন্তু এ ছাড়া আর আমার কোনো উপায় নেই। ঘটনাচক্রে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে আমার আর এই হাসপাতালে থাকা চলবে না। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আমাকে অন্য কোথাও বদলি করে দিন। কোথায় পাঠাবেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না, শুধু এই শহর থেকে আমাকে সরিয়ে দিলেই হবে।

আপনি আমার এই অনুরোধ অসুস্থ লোকের খেয়াল বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু দয়া করে চিঠিটা শেষ পর্যন্ত পড়বেন।

আপনি হয়তো জানেন ৎসাবুনিয়া বলে একটি ছোট্ট মেয়ে আমাকে এখানে দেখতে আসে। বেচারা বাচ্চাটা মনে করে (অন্যরাও তাই মনে করে) যে আমি তার বাবার বন্ধু আর রণক্ষেত্রের সাথী।

দুর্ভাগ্যবশত সেটা সত্য নয়।

আমি তার বাবাকে কখনও দেখিনি। তার নাম আমি এখানেই প্রথম শুনি, ৎসাবুনিয়া যখন স্টেশনে আহত সৈনিকদের তার কথা জিজ্ঞাসা করছিল, তখন।

আমি দেখলাম গাড়ির সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মেয়েটা হতাশভাবে কান্না গিলছে। কিছু না ভেবেই আমি তাকে ডাকি আর বলি আমি ভালিকো আবুলাদজেকে চিনি, আমি তাকে দেখেছি, সে ভালোই আছে।

হয়তো আমার এটা করা ঠিক হয়নি, কিন্তু তখন তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমি এত ব্যগ্র হয়েছিলাম যে এর পরিণতি যে কি হবে বুঝতে পারিনি।

এটা হলো শুক্রবারের কথা। পরেরদিন আমার এক্স'রের পর, আমি ডাক্তারের সঙ্গে যখন কথা বলছি তখন হঠাৎ দরজা খুলে গেলো আর মেয়েটি এসে ওয়ার্ডে ঢুকলো।

আমাকে দেখেই সে মহানন্দে ছুটে এলো।

"খুড়ো, আমাকে তুমি চিনতে পারছো? আমি ভালিকো আবুলাদজের মেয়ে", আমার করমর্দন করে সে বললো।

আমার অস্বস্তি হতে লাগলো। "হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি বইকি।"

ভাবছিলাম এর পর আমার কি বলা উচিত।

"কালকে আমি এমন উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম, যে তোমাকে বাবার কথা কিছু জিজ্ঞাসাই করিনি। আমার সঙ্গে কথা বলতে কি তোমার কষ্ট হবে?"

কি আর করতে পারি? আমার কি তাকে সব কথা খুলে বলা উচিত ছিল যে আমি তার বাবাকে চিনি না? আমার কাছ থেকে কত কি আশা করে থাকা তার জ্বলজ্বলে চোখদুটো দেখে আমি আর তাকে সত্যি কথাটা বলতে পারলাম না।

"বোসো, বাছা", এটুকুই শুধু বলতে পারলাম।

বিছানার প্রান্তে বসলো সে হাসিমুখে প্রত্যাশা নিয়ে, প্রথমে আমার তামাকের থলি বের করলাম। কয়েকটা সিগারেট বানাতে কয়েক মিনিট কাটালাম। তারপর খানিকক্ষণ দেশলাইয়ের খোঁজে হাতড়ালাম। ৎসাবুনিয়া স্থির হয়ে বসে রইলো আমার দিকে

তার বড়ো বড়ো জ্বলজ্বলে চোখদুটো মেলে দিয়ে। শেষকালে আমি কথা বলতে শুরু করলাম। আমি কি বলেছি তা ভগবানই জানে! তাকে বললাম কি করে প্রথম ভালিকো আবুলাদজের সঙ্গে আমার দেখা হয়, কি করে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে পড়ি, আর ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সে কি রকম সম্মান আর খ্যাতি লাভ করেছে তার কথা।

ৎসাবুনিয়া শুনলো নিঃশ্বাস বন্ধ করে। শেষকালে সে বললো।

'কিন্তু এতদিন ধরে চিঠি দেয়নি কেন? বাবার কি মার জন্য কষ্ট হয় না?'

এর কি উত্তর আমি দেবো? অথচ কিছু তো বলতেই হবে।

"শোনো খুকু!" আবার আমি আমার তামাকের থলি বার করলাম আর সিগারেট বান ানাতে বেরুবার একটা পথ বার করলাম। "মাঝে মাঝে সৈনিকদের অনেক দূরে পাঠানো হয় বিশেষ ধরনের কাজে। সেখান থেকে চিঠি লেখা শুধু যে অসম্ভব তাই নয় তুমি যে কোথায় আছো সেটাও তুমি কাউকে বলতে পারো না। চিঠিপত্র আসার পথে হয়তো বোমা পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জানোতো এখন যুদ্ধের সময়। যে কোনো কিছু ঘটতে পারে।"

এই ভাবে আমি এই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। বাচ্ছা মেয়েটা আমাকে এমন ভাবে নিয়েছে আমার সঙ্গে যেন তার রক্তের সম্পর্ক। কখনও কখনও একলাই ওয়ার্ডে আসে, অন্যান্য সময় তার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আসে ···। সেদিন তার স্কুলের সহপাঠিদের আমায় অভ্যর্থনা করতে হয়েছিল। সে চেয়েছিল তার বাবা যে কত বীর সেটা তারা জানুক। সকালে ঘুম ভাঙা মাত্রই, কমরেড ক্যাপ্টেন, আমার প্রথম চিন্তা হচ্ছে ৎসাবুনিয়া আর আমি নিজেকে তার জন্য প্রস্তুত করি। তাই আমি তার বাবার বীরত্বের গল্প বানাই কি করে ভালিকো আবুলাদজে একটা ট্যাঙ্কে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, কি করে ভালিকো আবুলাদজে কতজন আহত কমরেডকে রক্ষা করেছিল, কি করে ভালিকো আবুলদাজে একজনকে বন্দী করেছিল ·········।

এখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি কমরেড ক্যাপ্টেন। এটার নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। তাছাড়া আমার ভয় পরে হয়তো কোথাও গুলিয়ে ফেলবো। যদি কোথাও একটা ভুল বলে ফেলি সব কিছু ফাঁস হয়ে যাবে বড় ফুটো ওয়ালা মদের থলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার মতো করে। আর তাতে করে ৎসাবুনিয়া মনে আঘাত পাবে, সে কথা ভাবতেই ভয় করে।

সব থেকে ভালো হয় আমি যদি কোথাও বদলি হয়ে চলে যাই। তার বাবার জন্য সে অপেক্ষা করে থাকুক। যুদ্ধে যে কোনো কিছু ঘটতে পারে — অনেক সময় মনে হয় কেউ মারা গেছে, কিন্তু পরে, একদিন দেখতে পাওয়া যায় সে আগের মতোই অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছে।

একটি মায়ের অন্বেষা

রচনা : গিয়োরগি শাটবেরাশভিলির

আরচিল ঘুমোতে পারলো না···। সে হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ছাদের দিকে ক্লান্তভাবে তাকিয়ে চিৎ হয়ে শুচ্ছিলো, নয় তো উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশের মধ্যে তার উত্তপ্ত মুখখানা গুঁজছিলো। চোখ বুঁজলেই চোখের সামনে ভাসছিলো কেতিনোর পাণ্ডুর মুখখানা। তুষার-ধবল বালিশের গায়ে তার কুচকুচে কালো চুল যেন আরও কালো লাগছিল। তার কালো কালো চোখ দুটো আঁখিপল্লবে ঢাকা, তার ঠোঁট দুটি কাঁপছিল, যেন সে ফিস ফিস করে কিছু বলছে।

আরচিল উঠে বসলো, চোখ খুলে যে ভয়ঙ্কর স্বপ্নগুলো তার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে তাদের মন থেকে তাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো।

উদ্বিগ্ন এক মা তার অসুস্থ কন্যার শয্যার উপর ঝুঁকে পড়েছে। নিদ্রাহীন রাতগুলোর পর ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে ; আর সভয়ে চমকে জেগে উঠে, নিজেকে জাগিয়ে রাখার জন্য ঠোঁট কামড়াচ্ছে, হাতের তেলোয় চিমটি কাটছে।

"বাবা শীগ্‌গির ছুটি পাবে আর তখন এসে আমাদের কাছে সর্বক্ষণ থাকবে, সোনা।'

'না, মা।' কেতিনো খুব কষ্ট করে ফিসফিসিয়ে বললো, 'বাবার আসতে এখনো অনেক দেরি।'

আরচিল ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে তিবলিসি থেকে আসা তারটা আবার পড়লো :

'তোমার জন্য কেতিনোর খুব মন কেমন করছে। শীঘ্র চলে এসো।'

মাঝরাতে তারটা যখন পড়েছিল তখন শেষের দুটো কথার গুরুত্বের ওপর বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। কেতিনোর বিছানার পাশে আরও বেশিক্ষণ কেন সে থাকেনি সেই কথা ভেবে তার অনুতাপ হচ্ছিলো। এখন হঠাৎ একটা আশঙ্কা তাকে পেয়ে বসলো। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে তা না হলে সে চলে আসার পরের দিনই একটা জরুরী তারবার্তা ওরা তাকে পাঠাতো না। 'শীঘ্র চলে এসো' এর অর্থ কি হতে পারে?

'আজ সন্ধ্যায়ই যাতে চলে যেতে পারি তার ব্যবস্থা আমায় করতেই হবে,' সে ঠিক করলো, তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।

পার্টির জেলা কমিটির অফিসে তখনও কেউ আসেনি। নিজের ডেস্কে বসতে না বসতে তার ঘুম এসে গেলো।

'দুর ছাই', মনে মনে সে ভাবছিল। 'কাল রাত্রে এক ফোঁটা ঘুমোতে পারলাম না কিন্তু এখন আর চোখ খুলে রাখতে পারছি না।'

সারাদিনে এমন একটু সময় পেলো না যে বিশ্রাম নেয়। আশঙ্কা ও উদ্বেগে তার মন আচ্ছন্ন হয়ে রইলো।

শেষকালে তার ড্রাইভারকে ডেকে বললো তারা তিবলিসি যাবে।

অফির্স ছেড়ে প্রায় চলে আসার মুখে আধভেজানো দরজার মধ্যে দিয়ে শুনতে পেলো কলহপূর্ণ এক নারী কণ্ঠ। জেলা কমিটির সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ দাবি করছে।

'উনি ব্যস্ত আছেন, তোমাকে এখন ভেতরে যেতে দিতে পারবো না। উনি এখনি তিবলিসি যাবেন', কর্তব্যরত মেয়েটি তাকে বললো। কিন্তু মহিলাটি ভিতরে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো।

মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকলো। পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে।

'কমরেড আরচিল, এক বুড়ি এসেছে। ও রোজ আসছে। বলছে সে জোর করে ঢুকবে।'

আরচিল-এর আর উত্তর দেবার অবকাশ মিলল না, এরই মধ্যে শাল মুড়ি দেওয়া বেঁটেখাটো এক বৃদ্ধা দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলে, মেয়েটির দিকে ভ্রুকুটি করে তাকিয়ে, ক্ষিপ্রভাবে আরচিল-এর দিকে এগিয়ে এলো। তার বাঁ হাতের ওপর থেকে ঝুলছিলো নানা রঙে চিত্রবিচিত্র করা ছোট স্যাডল ব্যাগ (জিনের পাশে বাঁধা থলি) আর তার ডান হাতে ধরা ছিল সরু সরু চামড়ার ফালি দিয়ে বোনা একটা চাবুক।

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় আলোকিত ঘরে আরচিল লক্ষ্য করলো তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সমালোচনা আর তার বিদ্রুপ মাথা তাচ্ছিল্যে ভরা মুখের ভাব।

'এ তো দেখি এক বাঘিনী', অনিচ্ছাকৃতভাবে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সে মনে মনে ভাবছিলো।

'ওঃ! বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠলো, ঘরের মাঝখানে থমকে থেমে গিয়ে।

তার এ চিৎকারের অর্থ এতটুকুও পরিষ্কার হলো না সে যখন আবার সশব্দে হেসে উঠলো, নিজের হাতের স্যাডল ব্যাগের দিকে একবার তাকিয়ে চাবুকটা দিয়ে নিচের দিকে আলতোভাবে একটা বাড়ি মারলো তারপর দরজার দিকে আবার ফিরে দাঁড়ালো।

স্যাডল ব্যাগটা বৃদ্ধা ঘরের এক কোণায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো, চাবুকটাও গেলো তার পিছু পিছু, তারপর এধারে ফিরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে বললো :

'চাবুকটা সত্যিই আমার হাতে রাখা উচিত, কিন্তু—কেমন আছো?

আরচিল তার ডেস্কের কাছের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলো, কিন্তু বৃদ্ধা তার সে আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে, দূরে কনফারেন্স টেবিলের একেবারে অপরদিকে এগিয়ে বসলো।

'কার ওপর এতো রেগে আছো?'

'তা জানি না, তা জানি না', বৃদ্ধা উত্তর দিলো, তারপর নীরব হয়ে গেলো। ধীরভাবে বড় ঘরটার চতুর্দিক দেখতে লাগলো, স্পষ্টত আরও কিছু বলতে অনিচ্ছুক হয়ে।

'জ্বালালে দেখছি', ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আরচিল মনে মনে ভাবছিলো।

'তুমি নিশ্চয়ই কোনো কাজে এসেছো, আর আমারও খুব তাড়া আছে—তাই, বলো তোমার কি দরকার?'

'সত্যিসত্যিই যেন তোমাকে কিছু করতে হয় কখনও' বৃদ্ধা সশব্দে হেসে উঠে তাকে বাধা দিয়ে বললো। 'করার মধ্যে তোমাকে তো শুধু ফোনটা তুলে হুকুম দিতে হয়।'

'কাকে?' তার বিদ্রুপের মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে করতে আরচিলো ভাবছিলো, ভ্রূকুঞ্চিত করে সে মৃদুভাবে বললো :

'তুমি কি তাই মনে করো? তুমি কি সত্যিই মনে করো জেলা কমিটির সম্পাদকদের কোনো কাজ নেই, সমস্যা?' আরচিল ধীরভাবে বলে চললো, বৃদ্ধার দিকে সে তাকাচ্ছিলো না। সেই সঙ্গে সে ভাবছিলো অদ্ভুত এই অতিথির কাছে কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজনবোধ করলো কেন সে।

মহিলাটি কৌতূহল ভরা চোখে লম্বা চওড়া এই লোকটিকে দেখতে লাগলো।

'সম্পাদক হওয়া বেশ কঠিন কাজ, তাই কি? কাজের মধ্যে তো শুধু ভুরু কুঁচকে, জেঁকে বসে থাকতে হবে, তাই না?' বৃদ্ধা হেসে উঠলো।

'পাগল না কি?' আরচিল ভাবছিলো, আর ভুরু কোঁচকাবে না হাসবে না কি শুধু 'জেঁকে বসে থাকবে,' তা ঠিক করতে পারছিলো না।

'তোমার মুখে তো কিছু বাধে না দেখছি, তাই না?'

'কেনই বা বাধবে? ভয় করার একমাত্র জিনিস হলো তোমার নিজের মন। মিটিং তোমাকে সম্পাদক নির্বাচিত করেছে, কিন্তু আমার মন আমাকে আমার নিজের হয়ে কথা বলিয়েছে।'

আবার সে হেসে উঠলো।

এবার আরচিলও হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে উঠে পড়ে সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো। তারপর আবার তেমনি চট করে বৃদ্ধার সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়ে, হাসি মুখে তাকে জিজ্ঞাসা করলো :

'তুমি আসছো কোথা থেকে? কোনো বিপদে পড়ে এখানে এসেছো কি?'

'আমি আসছি খেভিসুবানি থেকে। ওটাই আমার দেশ', চিন্তাপূর্ণ একটা বিরতির পর বৃদ্ধা বললো। তার মুখের চারপাশে উর্ণনাভের মতো বলিরেখা, যদিও দাঁতগুলো তাঁর তখনও পর্যন্ত বেশ শক্ত আর সাদা।

'আমি আমার ছেলেকে খুঁজছি।'

'তোমার ছেলে?' আরচিল অনিচ্ছাকৃতভাবে পুনরাবৃত্তি করলো আর চোখ বুঁজলো। সাদা বালিশের ওপর কালো চুলে ঘেরা তার মেয়ের পাণ্ডুর মুখখানা তার চোখের সামনে আবার ভেসে উঠলো।

"কাকের মতো কু ডাক ডাকছে, দেখছি," কথাটা ভেবেই শিউরে উঠলো সে। মুখ তুলে ক্লান্তভাবে বৃদ্ধার দিকে তাকালো।

"তোমার ছেলের কি হয়েছে?"

"যুদ্ধ থেমে গেছে অনেকদিন, হতাহতের তালিকায় তার নাম নেই, কিন্তু কেউ জানেও না সে কোথায় আছে। আমি কি তার মা, না মা নই? তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, তার সঙ্গে একটা কথা বলতে পারছি না। তার জামার বোতাম সেলাই করে দিতে পারছি না। আমি এখন আধা—মা।"

তার চোখ দুটো জলে ভরে গেলো। মুখ ঘুরিয়ে, সে তার হাতদুটো মুঠি করে বুকের ওপর আঘাত করলো।

"কীভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি? সামরিক কমিশারকে কি ফোন করবো?"

"কমিশার কিছু করতে পারবে না। তার কাছেও ওর সম্বন্ধে কোনো খবর নেই। ও মরে গেছে কিনা জানতে চাই তাহলে ওর জন্য শোক করতে পারবো, আবার আমি একজন মা হয়ে যাবো।"

এরপর দীর্ঘ একটি অস্বস্তিকর নীরবতা।

"ওকি ওর দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে?" একটু ইতস্তত করে আরচিল জিজ্ঞাসা করলো।

মহিলাটি আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলো।

"শান্ত হও, দোহাই তোমার।"

আবার সে চেয়ারে বসে পড়লো, শূন্যভাবে বললো : "তুমি যদি কিছু জেনে থাকো তো আমায় বলো, যাতে করে ওপারে গিয়ে আমি যেন ওকে আর বুকে জড়িয়ে না ধরি। তুমি অবশ্যই আমাকে বলবে। তাহলে ওকে আমি ত্যাজ্য করবো।"

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে বসে রইলো।

ঘড়ির ঘণ্টা বাজল। বৃদ্ধা অনড় হয়ে বসে রইলো।

"না, আমি হলফ করে বলতে পারি দেশদ্রোহীকে আমি পেটে ধরিনি।"

এখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিলো হলুদ রঙের চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতায়।

"তোমার কোনো নাতিনাতনি আছে না কি? আরচিল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো।

"হুঁ!" বৃদ্ধা তিক্তভাবে হাসলো। "তা যদি থাকতো তাহলে আমি একজন আধা-মা হতাম না আর তোমার কাছে এখানে আসতামও না।"

"পুত্রবধূ?"

বৃদ্ধা ইতস্তত করলো তার মুখ রক্তিম হয়ে গেলো। কম্পিত হাতে সে তার মাথায়

বাঁধা রুমালটা খুললো, ওটা দিয়ে নিজেকে বাতাস করতে করতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বললো, "তুমি ঠিকই ধরেছো।"

"ঐটাই .হলো সব থেকে খারাপ জিনিস।" তার ছেলের কথা যখন বলছিলো তখনকার থেকে কথা বলাটা মনে হলো যেন আরও বেশি কঠিন ও কষ্টকর হয়ে গেছে।

"সে তোমাকে বাড়ির কাজে সাহায্য করে, তাই না?"

"ও আসার আগে, আমাদের এমন মদ তৈরি হতো না যা বড় বড় জালায় রাখতে পারি। এ বছর দশটা বড় বড় জালা ভর্তি করেছি।"

"তাহলে সে তো মেয়ের মতো মেয়ে, বলো।"

"কিন্তু সে তো আমার ছেলের জায়গা নিতে পারে না, আর আমিও তার কোনো কাজে লাগবো না। আমার এক জ্বালা আর তার অন্য এক জ্বালা।"

"পাঁচ বছর," আরচিল ভাবছিল।

হঠাৎ তার মনে হলো সে যেন সূত্রটা পেয়ে গেছে যা দিয়ে তার সামনেই এই রহস্যের জট ছাড়াতে পারে। শুধু মৃদু একটা টান আর তা হলেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

"কিন্তু তোমার নিজেরও তো অনেক সমস্যা রয়েছে আমি আবার তার সঙ্গে আমারটাও জুড়ে দিচ্ছি," মহিলা বললো।

এই কথাগুলো কানে যেতেই কেতিনার মুখখানা আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, তার পাণ্ডুর ঠোঁট দুটি ফিস ফিস করে ডাকছে, "বাবা"।

"আমাকে যেতেই হবে। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। ভগবান জানে, এখন সে কেমন আছে," সে ভাবছিলো।

উঠে সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো। ভুলে গেলো সে বৃদ্ধার কথা, তার বড় বড় জলভরা চোখ দুটো, তার রোদে পোড়া বাদামী গালগুলো।

"আমাকে ক্ষমা করো, আমার কিন্তু তাড়া আছে। সময়ে সুরাহা হয়ে যাবে হয়তো," বৃদ্ধার সামনে থমকে থেমে, নিজের ঘড়ির দিকে আবার তাকিয়ে সে বললো।

মহিলা উঠে দাঁড়ালো, চিবুকের নিচে রুমালের খুঁটদুটো বেঁধে উদ্ধতভাবে বললো :

"তুমি বোধহয় ভাবছো একমাত্র তুমিই আমাকে আমার এই অনুসন্ধানে সাহায্য করতে পারবে?"

আরচিল অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। অভাগিনী মাকে বলার মতো সান্ত্বনার ভাষা সে খোঁজবার চেষ্টা করছিলো কিন্তু পারছিলো না।

"ও নিয়ে অত অস্থির হয়ো না।"

"কি নিয়ে অত অস্থির হবো না?"

আরচিল নিজের ঠোঁট কামড়ালো।

"শোনো আমি আমার ছেলেকে হারিয়েছি, খুব ভালো ছেলে সে। অস্থির না হয়ে

কি করে আমি চুপ করে বসে থাকবো। সে হলো আমার পরিবারের শেষ সন্তান। আমি নিজেই যাবো তাকে খুঁজে বার করতে।"

"একটু শোনো।"

কিন্তু বৃদ্ধা শোনবার জন্য আর অপেক্ষা করলো না। ঘরের কোণা থেকে তার চাবুক আর স্যাডল ব্যাগ টেনে তুলে নিয়ে, সশব্দে দরজা বন্ধ করে চলে গেলো।

আরচিল জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলো। ছোট্ট একটা বাদামী ঘোড়ায় চড়ে সে রাস্তার মোড়ে চলে গেলো।

আধঘণ্টা বাদে আরচিল তার অফিস থেকে বেরিয়ে তার অপেক্ষমান গাড়িতে উঠলো।

"সোজা তিবলিসি যাবো, না কি পথে আপনার বাসা হয়ে যাবো? ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলো।

"আগে আমাদের খেভিসুবানি যেতে হবে। সেখানে কাজ আছে।"

ড্রাইভার ঘুরে বিস্মিতভাবে আরচিল-এর দিকে তাকালো, কিন্তু তার পাথরের মতো কঠিন মুখ আর চিন্তাক্লিষ্ট চোখ দুটো দেখে, বিলম্ব না করে গাড়ি চালাতে শুরু করে দিলো।

জেলাকেন্দ্র ছাড়ামাত্রই তারা এবড়ো খেবড়ো অসমতল একটা রাস্তায় গিয়ে পড়লো, তার ওপর দিয়ে গাড়ি চললো ঝাঁকুনি খেতে খেতে।

আমার নিজের চিন্তাভাবনা নিয়ে বড় বেশি মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। অদ্ভুত ঐ বৃদ্ধাব সঙ্গে অন্যরকমভাবে ব্যবহার কথা উচিত ছিলো। অন্য আরও কিছুও বলতে চাইছিলো। আমাকে নিশ্চয়ই খুব হৃদয়হীন বলে মনে করেছে। আমার উচিত ছিলো ওকে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে দেওয়া। আমার নিজের বিপদের কথা ওকে বলা উচিত ছিলো।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে অনেকে নিজেদের সত্যিকার বিপদের কথা বলার আগে অনেক অবান্তর কথা বলে। এক্ষেত্রেও হয়তো তাই হয়েছে। বৃদ্ধার ঐ অস্থিরতা আর বিরক্তি তার ছেলের জন্যে দুঃখের থেকে হয়তো আরও তাৎক্ষণিক কিছুর থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

তার অফিসে সে আরও অনেক শোকাতুরা মা ও স্ত্রীদের দেখেছে, সাধারণত সাশ্রুনয়নে। কিন্তু সর্বদাই তার কাছে তাদের কোনো একটা বিশেষ যাঞ্চা থাকে, একটা পেনশন কি একটা অনুদান…।

কিন্তু এর আগে আর কেউ তার কাছে এমন উদ্ধতভাবে বা এমন একটা অনির্দিষ্ট অনুরোধ নিয়ে আসেনি।

"তার জন্য কতটা কি সে করতে পারে।"

অনেক সৈনিকের সন্ধান মেলেনি। ঘূর্ণাবর্তে অনেকেই তলিয়ে গেছে, গোলার আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সাঁজোয়া গাড়ির তলায় পিষ্ট হয়ে গেছে। তাদের সম্বন্ধে কিছু খুঁজে বার করে তাদের মায়েদের সে কথা জানাবার আশা কেই বা করতে পারে?

চিন্তাগুলো তাকে ঘিরে ধরলো, তার নিজের বিপদ সেখানে খাটো হয়ে গেলো, তার তন্দ্রালুভাব কেটে গেলো। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় আলোকিত পথের দিকে বিষণ্নভাবে তাকিয়ে রইলো সে।

ফটকের সামনে গাড়ি হর্ন দিতেই, একটা কুকুর চিৎকার করতে করতে গাড়িব দিকে ধেয়ে এলো।

নিচের তলার দরজা খুলে গেলো আর একটি অল্পবযসী মেযে হাঁক দিলো, "কে ওখানে?" বেরিয়ে এসে সে কুকুরটাকে ডেকে নিলো।

আরচিল গাড়ির থেকে নামলো।

"আমরা বাড়ির কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই," স্মিতমুখে আরচিল বললো।

অল্পবয়সী মেয়েটি চমকে উঠলো আর ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলো।

"ভয় নেই। কোনো বিপদ ঘটেনি। তোমার শ্বাশুড়ি আজ আমার সঙ্গে দেখা করেছিলো, আমি তার সঙ্গে আরও একটু কথা বলতে চাই," মৃদুভাবে আরচিল বললো।

"আমি তো তাঁকে যে কোনো মুহূর্তে আশা কবছি। আপনি যদি একটু অপেক্ষা করতে পারেন, তিনি শীগগিরই এসে যাবেন।"

আরচিল ভাবছিল এই দুঃসাহসী বৃদ্ধা মহিলা গেলো কোথায।

"আপনি দয়া করে ভেতরে আসবেন কি?"

আবচিল মেয়েটির পিছু পিছু গেলো।

দেওয়ালগুলোয় রঙিন ছুঁচের কাজ ঝুলছে, আলমারির ওপর বাখা সাবেকি ধরনের একটা বাতির আলোয বেশ আলোকিত। ঘরটা ছোট কিন্তু বেশ পবিচ্ছন্ন আব আরামদায়ক।

নীল কাপড়ে ঢাকা টেবিলের পাশে বসার পর আরচিল মেয়েটির দিকে ভালো করে তাকালো। তার আর চোখ সরছিলো না, মেয়েটি পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর। মেয়েটি অপ্রতিভভাবে হাসলো, অপরিচিত একজন লোকের সান্নিধ্যে অস্বস্তিবোধ করছিলো। একবার আরচিল—এর দিকে, একবার দরজার দিকে তাকিযে কি যে করবে কি যে বলবে বুঝতে পারছিলো না। শেষকালে আলমারির সামনে গিযে কি যেন খুঁজতে লাগলো।

"ব্যস্ত হোয়ো না···!" আরচিল হেসে বললো।

"আমাকে দেখে কি ভয় পেয়েছো?" সে উত্তর দিলো না দেখে আরচিল প্রশ্ন করলো।

"না, কিন্তু আমি এখানে আসা ইস্তক কোনো গাড়ি এখানে আসেনি।"

আরচিল এব মনে হলো, "ও হয়তো ভেবেছিলো ওর স্বামী ফিরে এসেছে কিংবা তার কোনো খবর এসেছে," সে বললো :

"হ্যাঁ, আসার পক্ষে রাত হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। এখান থেকে আমি সোজা তিবলিসি চলে যাবো।"

দু'জনেই নীবব হয়ে গেলো। আরচিল দেওযালের ছবিটা দেখছিলো।

"ঐ নিশ্চযই ওর স্বামী, ইউনিফর্ম পরা, ঐ হলো তার মা, আর ঐ হলো ও নিজে।"

"তোমাদের ছেলেপুলে থাকলে তোমার আর তোমার শ্বাশুড়ির, দু'জনের পক্ষেই অনেক সহজ হতো," আরচিল বললো।

মেয়েটি কোনো উত্তর দিলো না। আলমারি থেকে এক বোতল মদ, কতকগুলো ফল আর একটা গেলাস বাব করলো, তারপর অতিথির সামনে সেগুলো রেখে একটা চেযারে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পবে তিক্তভাবে সে বললো :

"সে কথা যদি জানতেন। যুদ্ধে যাবার আগে থেকেই আমাব ওপর তাব নজর ছিল, কিন্তু একটা কথাও কখনো বলেনি। ওখান থেকে ওব মার কাছে এক চিঠি লিখলো, "আমাকে যদি ফিবে পেতে চাও তবে ওকে আমার বউ করে ঘরে নিযে এসো।"

সে চুপ করলো, তার আবক্তিম মুখটা নিজের হাতের মধ্যে রাখলো।

"ওঃ" আবচিল বললো।

মেয়েটি অশ্রুগোপন কবছিলো। শূন্যকণ্ঠে সে বলে চললো :

"সেই থেকে আমি অপেক্ষা কবে আছি…।"

চোখ মুছে সে একটু মদ ঢাললো।

"আমাদের পবিবাবের সৌভাগ্য কামনা কবে ওটা পান করুন। আমার এই অবস্থা হলেও আমার এক বোনেব কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালোই হযেছে। তার মানুষটি তাব কাছে ফিরে এসেছে।"

বেদনা আর বিস্মযভাবে আরচিল মেযেটিব দিকে তাকিযে রইলো, এত দুঃখের মাঝেও এত সুন্দর সে। মেযেটি এখন কি কববে? ওর শ্বাশুড়িই বা কি করবে?

বেশ কিছুদিন হলো যুদ্ধ থেমে গেছে। যুদ্ধ শেষে যারা জীবিত ছিল তারা যে যাব বাড়িতে ফিরে এসেছে, এমন কি যাদের মৃত বলে ধরা হয়েছিলো তারাও ফিরে এসেছে। কিন্তু ও ফিরে আসেনি।

আরচিল একটি কথাও না বলে গ্লাসটা তুলে নিযে এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিলো। থালার ওপর থেকে একটা পিচফল তুলে নিলো। ঠিক তখনই তার মনে পড়লো সারাদিন কিছু খাযনি সে। মেয়েটি তার গ্লাস আবার ভরে দিলো।

করুণায় ওর মন ভরে গেলো, আরচিল উঠে দাঁড়িয়ে ওরদিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

"তোমার শ্বাশুড়ির মনে ভরসা দিও। দু'দিনের মধ্যেই আমি ফিরবো, তখন আমি নিশ্চযই আসবো।"

মেয়েটি তার হাত চেপে ধরে দু'হাত দিযে আঁকড়ে ধরলো।

উঠোন পার হবার সময় দু'জনেই কোনো কথা বললো না। ফটকের কাছে এসে আরচিল ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে বললো ঃ

"এখানে একা থাকতে তোমার ভয় করবে না তো?"

ফটকের গায়ে হেলান দিয়ে মেয়েটি করুণভাবে হাসলো।

"তা সারা জীবন তো আমাকে একাই কাটাতে হবে। তাই কোনো রকমে আজকের রাতটা কাটিয়ে দিতে পারা তো উচিত। মনে হচ্ছে আমার শ্বাশুড়ি কোথাও আটকে গেছেন।

আরচিলকে কেউ বৃদ্ধার সন্ধান দিতে পারলো না। প্রায় দু'ঘণ্টার ব্যর্থ চেষ্টার পর, সে গাড়িতে উঠে তিবিলিসির দিকে রওনা হলো।

অন্ধকার রাত্রের মধ্যে দিয়ে গাড়ি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললো।

মনশ্চক্ষে সে দেখতে পাচ্ছিলো নাটকীয়ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বৃদ্ধা আর তার ভাবী পুত্রবধূকে একা একা, লোকালয় থেকে দূরে নিঃসঙ্গ ঐ বাড়ির মধ্যে।

"প্রায় কেতিনোর বয়সী" ফটকের কাছে বুকের ওপর দুই হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা অল্পবয়সী মেয়েটার কথা চিন্তা করতে করতে মনে ভাবলো। ওর কথাগুলো আরচিল-এব মাথার মধ্যে ঘুরছিল—"সারা জীবন আমায় একলাই কাটাতে হবে।"

বৃদ্ধা কি করবে? তার কি ঐ মেয়েটিকে তার বাপমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু মেয়েটি কি ফিরে যেতে পারবে? ফিরে যেতে চাইবে কি? যদি ওর ছেলে অলৌকিকভাবে ফিরে আসে তখন বৃদ্ধা তাকে কি বলবে?

কিন্তু মেয়েটি যদি আর কাউকে স্বামী হিসাবে খুঁজে না পায়, তাহলে জীবনের পূর্ণতার জন্য ব্যাকুল মেয়েটির কষ্ট বৃদ্ধা কি করে সহ্য করবে? মেয়েটি পুরুষের স্পর্শের স্বাদ কখনো পায়নি, সত্যিকার প্রেমে তার মনটা কখনো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি। ও তো একটা বলি, সত্যিকারের বলি।

ধরো যদি লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করে বৃদ্ধা মেয়েটির বিয়ে দেয়, তাহলে তার ঘর ভেঙে যাচ্ছে, মেয়েটির অচেনা স্বামী এসে তার বাড়িতে প্রবেশ করছে, এটা কি সে সহ্য করতে পারবে?

লোকে কি বলবে? বৃদ্ধার বিবেক কি বলবে?

আর মেয়েটির মন?

আরচিল চিন্তা করেই চললো। যেন সে বৃদ্ধার কষ্ট নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে আর চিন্তায় জর্জরিত হচ্ছে।

গাড়িটার গতি হঠাৎ হ্রাস হয়ে এলো। ড্রাইভার আরচিল-এর দিকে ঘুরে তাকালো, আরচিল-এর চোখ বোঁজা যদিও সে ঘুমোয়নি।

"সামনে ঘোড়ার পিঠে একজন চলেছে। নিশ্চয় সেই বুড়িটা।"

আরচিল চোখ মেলে তাকালো। একজন মহিলা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে।

"ওকে ধরে ফেলো, ওর সামনে গিয়ে গাড়ি থামাও," সে বললো।

গাড়িটা এগিয়ে যতেই ঘোড়াটা চমকে সরে গেলো। সওয়ার রাশ ধরে তাকে সংযত করলো। গাড়ি থামলে আরচিল নেমে সওয়ারকে ডেকে বললো ঃ

"কোথায় চলেছো, মা?"

ঘুরে সন্দিগ্ধভাবে লোকটিকে দেখে রুষ্টভাবে বললো।

"আমাকে যদি তুমি চেনো, তবে আমার বিপদের কথাও তুমি জানো। আমি আমার ছেলেকে খুঁজছি।"

এই কথা বলে, বৃদ্ধা লাগামে টান দিয়ে এগিয়ে চললো, ঘোড়াটাকে চাবুকের একটা বাড়ি মেরে।

"চল্। হতচ্ছাড়া, চল।"

ভয়ত্রস্ত ঘোড়া ছুটে চলে যাবার আগে কোনো কথা বলার অবকাশ হলো না।

মুহূর্তের জন্য মহিলার চোখদুটি জ্বলে উঠলো গাড়ির হেড লাইটের আলোয়।

[গিয়োরগি শাটবেরাশভিলির 'A mother's quest' গল্পটির ছায়াবলম্বনে।]

জন্মদিনের উৎসব

রচনা : এ্যাগনেস স্মেডলি

আমরা তখন শহুরে লোক হয়ে গিয়েছিলাম। ত্রিনিদাদের লোকসংখ্যা পুরোপুরি পাঁচ হাজার হলেও দাবি করা হতো দশ হাজার বলে। ওখানে একটা গ্রেড স্কুল বাড়ি ছিল আর নদীর ওপারে পাহাড়ের ওপরের গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা হাইস্কুল বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। হাইস্কুল আর ধনদৌলত মনে হতো একই সঙ্গে চলে। সে যাই হোক, আমরা যারা রেল লাইনের ওধারে থাকতাম, তারা জানতাম আমরা কখনোই হাইস্কুলে যাবার কথা কল্পনাও করতে পারবো না।

গ্রেড স্কুলের বাড়িটা শহরেব অপর পাশে ছিল, পুরনো ঐতিহাসিক সানটা ফে ট্রেল (Santa Fe Trail) যেটা দিয়ে প্রথমে ইন্ডিয়ানরা, পরে প্রাচীন স্প্যানিয়ার্ডরা, আরও পরে মহান দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের যাত্রী শ্বেত প্রবর্তকরা পর্যটন করেছিল, ঠিকই তারই দিকে মুখ করে দাঁড়ানো এক পাহাড়ের ওপর। বাইরের দিকে প্রসারিত এক চূড়ো, যার ওপরে পশ্চিমের প্রাচীনতম প্রবর্তকদের অন্যতম শায়িত আছে তারই পায়ের কাছ দিয়ে রাস্তাটা ঘুরে গিয়েছিল। স্কুলটা ছিল আমার দেখা প্রথম গ্রেড স্কুল। প্রতিদিন আমি আমার ছোটভাই জর্জের হাত ধরে ওখানে নিয়ে যেতাম, আমরা জানতাম যে আমরা পূণ্যভূমির ওপর দিয়ে চলেছি, কেন না আমার মা ওটার সম্বন্ধে সব সময় সেই কথাই বলতো। শিক্ষিকারা ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন·আর মনে হতো যেন তাদের মসৃণভাবে ইস্ত্রি করা হয়েছে ; তারা মাপসই সব পোশাক আর সাদা ব্লাউজ পরতো, আর এমন ভাষায় কথা বলতো যা আমি প্রথম প্রথম প্রায় বুঝতেই পারতাম না। আমার মা তাদের মধ্যে একজনকে প্রথমদিনই খুলেই বলেছিল যে আমার বয়স প্রায় দশ বছর আর আমি আমার আগের স্কুলে 'তৃতীয় পাঠ' পর্যন্ত পড়েছি। শিক্ষিকাটি অনেকক্ষণ ধরে আমার মার দিকে তাকিয়েছিল, তার দৃষ্টি ঘোরাফেরা করছিল মার সুতির পোশাক, মার হাতগুলো, যেগুলো এত শিরা বার করা আর কর্ম জর্জরিত যে প্রায় কালো হয়ে গেছে আর তারপব, নীলাভ-কৃষ্ণবর্ণ চোখ দুটির দ্বারা উদ্ভাসিত তার বিষন্ন মুখের উপর। চোখ দুটি তরুণ — কিন্তু হাতগুলো পঞ্চাশ বছর বয়স্কা কোনো বাসনমাজা ঝিয়ের হতে পারতো।

'হ্যাঁ', শিক্ষিকাটি শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেছিল, 'আমি বুঝতে পেরেছি।'

সে ছিল এক মমতাময়ী অল্পবয়সী শিক্ষিকা। আমি যখন তার সামনে কাঁপা কাঁপা গলায় পড়ছিলাম তখন সে আমার আগ্রহ আর সুসজ্জিত ছেলেমেয়ে ভর্তি ঘরের কথা ভুলে যাবার চেষ্টা দেখে উৎসাহ দিয়ে হেসেছিল। তারপর আমাকে সে বোর্ডের কাছে পাঠিয়ে সংখ্যাগুলো লিখতে বলেছিল। নিচের গ্রেডে পাঠিয়ে দেবার ভয় আমাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অথচ আমি একেবারে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। সংখ্যাগুলো সব সময় আমার শত্রু ছিল। আমি যেমন তেমন করে নম্বরগুলো লিখতে লাগলাম .... এক ধরনের সহজাত বুদ্ধি আমাকে সাহায্য করলো—আমি জানতাম সে মনে করবে আমি শুধু ভুল করছি মাত্র। আর হলোও তাই।

'এমন ভুল তুমি কবছো কি করে!' সে প্রতিবাদ করছিল। আমি শূন্যভাবে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম উত্তর দিইনি। সে খড়িটা নিয়ে সহজ অঙ্কটা কষে দিলো। তার হাতটা আমি এমন একাগ্রতার সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম যে এখনও পর্যন্ত, প্রায় বিশ বছর পরেও যে সংখ্যাগুলো সে লিখেছিল আর তাব অনামিকায একটা সোনার আংটি সমেত তার লম্বাটে ফর্সা হাতটা স্পষ্ট দেখতে পাই।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সে এই পদ্ধতি চালিয়ে গেলো। সে যা বলতো আর লিখতো, তা আমি মুখস্থ করে নিতাম, কিন্তু কখনো বুঝতে পারিনি। আমার চোখের সামনে ধরা এক সারি সংখ্যা ছিল আর এখনও তাই রযে গেছে, আমার সামনে দাঁড়ানো একসার সৈন্যের মতো ওপরওয়ালার কাছ থেকে 'গুলি করো!' হুকুম পেলেই গুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে।

ঐ স্কুলে আমার খুব লজ্জা লাগতো আর নিজেকে খুব ছোট মনে হতো। ধারের দিকের সারিব প্রথম আসনে বসতো ছোট্ট একটি মেয়ে। তার ধবধবে ফর্সা রঙ, চুল ছিল ঘন আর প্রায় সাদা আর তার পোশাক, তার জুতো আর মোজা সব সময় সাদা হতো। শিক্ষিকা যখন তার বাবার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল তখন সে উত্তর দিয়েছিল, 'আমার বাবা ডাক্তার'। আর আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে তাকিয়েছিলাম। সবসময় সে খুব সোজা হয়ে তার নিজের আসনে বসে থাকতো আর শিক্ষিকা সব সময় তার কপি বই নিয়ে উঁচু করে ধরে সমস্ত ক্লাসকে দেখাতো। হাতেব লেখা তার নিজের মতোই সোজা আর পরিষ্কার ছিল ; মার্জিনগুলো বেশ চওড়া আর সোজা হতো ; একটাও ভুল থাকতো না। একদিন স্কুলের পর কৌতূহলের বশবর্তী হযে তাকে তার বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলাম ; নানা রকমের ফুলে ভরা একটা মাঠ দিয়ে ঘেরা ইটের নিচু একটা বাংলো বাড়িতে সে থাকতো। ঘাসগুলো একেবারে জানালার শার্সির কাচের মতো মসৃণ করে কাটা, সব কিছুই বেশ প্রশান্ত, ছিমছাম আর নিশ্চুপ। এমনকি বেড়া আর ফটকটা পর্যন্ত সাদা রঙ করা।

'মাদার ডে' (Mother Day)-তে সাদা মেয়েটির মা এসে শিক্ষিকার কাছে বসেছিল, অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা করেনি। আমার মা বেল্ট দেওয়া নতুন একটা সুতির পোশাক পড়েছিল আর আমি গর্বিতভাবে তার পাশে হেঁটে স্কুলে

গিয়েছিলাম। ঘরের মধ্যে, সুবেশা মহিলাদের থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল সে, তার ত্রস্ত চোখদুটি তাদের লক্ষ্য করছিল কেমন সহজভাবে তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর সে আর কখনো যায়নি। তবু তার কাছে স্কুল একটা তীর্থস্থানই রয়ে গিয়েছিল, যেখানে তার ছেলেমেয়েদের পাঠানো একটা সম্মানের কথা।

একদিন আমাদের শিক্ষিকা নেমে দাঁড়ালো আর একজন এসে আমাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে একটা বই থেকে পড়ে শোনালো। কাঁটা দিয়ে খাওয়া আর চিবানোর সময় মুখ বন্ধ করে রাখার কথা শিখলাম। তারপর সে দাঁত মাজার সম্বন্ধে কিছু বললো, কিন্তু একথা আমি আগে কখনো শুনিনি অবশ্য আমার মা মাঝে মাঝে হলুদ রঙের সাবান আঙুলে লাগিয়ে তাই দিয়ে নিজের দাঁত মাজতো। কিন্তু শুধু আমার নিজের দাঁতের জন্য একটা বুরুশ কেনার কথা তাকে বলতে আমার লজ্জাই করতো! শিক্ষিকাটি রোজ স্নান করার সম্বন্ধে পড়ে শোনালো। সেটা যে কি করে করা যাবে তা আমি কল্পনাই করতে পারলাম না। কারণ, আমার মা শুধুমাত্র সোমবার জামাকাপড় কাচতো আর আমরা ছেলেমেয়েরা, কাপড় ধোওয়ার শেষে যে পরিষ্কার জল থাকতো সেই জলে স্নান করতাম ; সব থেকে যে বড় সে আগে স্নান করতো ; আর সব থেকে যে ছোট সে একেবারে শেষে।

তারপর শিক্ষিকাটি অনিদ্রা সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছেদ পড়ে শোনালো। ঘুমোতে না পারলে, উঠে বেড়াতে যাবে ; কিংবা একটা ঘরে দুটি খাট রাখবে যাতে করে একটা থেকে আর একটাতে বদলানো যায় ; পরিষ্কার চাদর ঘুমপাড়ায়। বিছানার চাদর আমি কখনো দেখিনি। আমরা শুধু কম্বল ব্যবহার করতাম কোন বিছানা বদল করবো তাও একটা হেঁয়ালি। কেন না আমাদের মাত্র চারটি খাট ছিল আটজন লোকের জন্য। অবশ্য আমি ভালো করে ভেবে দেখলাম যে, ঐ ছোট্ট সাদা মেয়েটার মতো ধনী লোকেরা তাই করে। আমি কল্পনা করলাম, সে মাঝরাত্রে উঠে গুড়ি মেরে আর একটা বিছানায় যাচ্ছে। ধনী লোকেরা বোধহয় রাত্রে ঘুমোতে পারে না ; ঘুমোতে না পারাটা বেশ আভিজাত্যপূর্ণ। আমি ছোট্ট সাদা মেয়েটিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম, মনে হলো যা পড়ানো হচ্ছে তার সবটাই সে বুঝতে পারছে।

কিন্তু তার উৎকৃষ্টতা সত্ত্বেও সে বছর আমারই জয় হয়েছিল। সাকুল্যে বৎসরের অর্ধেকও শেষ হয়নি যখন আমি দূরে বাইরের দিকের সারির পিছনের আসনে বসেছিলাম — আর সে বসেছিল সামনের আসনে। পিছনের আসনটি ছিল সম্মানের আসন। যে ছেলে মেয়ে সেখানে বসতো সে হতো ঘরের মধ্যে সবার সেরা আর শিক্ষিকার কাছ থেকে অল্পই সাহায্যই বা সংশোধনের প্রয়োজন হতো তার। যখন আর সব ছেলেমেয়েরা উত্তর দিতে অসমর্থ হতো, শিক্ষিকা বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্মানের আসনের দিকে ফিরে তাকাতো এই কথাটি বলে —

'মারি ?'

তার মুখের ওপর থেকে একেবারেই চোখ না সরিয়ে আমি উঠতাম আর উত্তর দিতাম। সমস্ত ক্লাস একটা ভুল করার অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকতো আর শুনতো।

আমার রঙচটা জামা আর সুতোর মতো বিশ্রী চুল, এসব নিয়ে আমি, যে কখনো একটা দাঁত মাজা বুরুশ কিংবা একটা স্নানের টব দেখেনি, যে কখনো দুটো চাদরের মাঝখানে কিংবা রাতের পোশাক পরে শোয়নি, সেই আমি আমার হাত দুটো পাশে সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর একটুও দ্বিধা না করে কিংবা একটাও ভুল না করে উত্তর দিতাম। আর ঐ ছোট্ট সাদা মেয়েটি, যার বাবা ছিল একজন ডাক্তার, তাকে শুনতো হতো! এরপরই ঐ ছোট্ট সাদা মেয়েটি আমাকে তার জন্মদিনের পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছিল। উপহার হিসাবে কলা কেনার ব্যাপারে আমার মা আপত্তি করেছিল, কিন্তু আমি কান্নাকাটি করায় আর সকলে জিনিস নিয়ে যাবে বলায়, অনিচ্ছার সঙ্গে সে তিনটি কলা কিনেছিল।

'ওরা সব বড়লোক' মহার্ঘ কলাগুলোর দিকে চেয়ে সে তিক্তভাবে প্রতিবাদ করেছিল, 'ওদের আর কিছু দেবার কোনো প্রয়োজন নেই।'

ছোট্ট মেয়েটির বাড়ি পৌঁছে দেখলাম অন্য ছেলেমেয়েরা সব এনেছে বই, রুপোর জিনিসপত্র, রুমাল আর সুন্দর সুন্দর সামগ্রী, যেসব আমি কখনো চোখেও দেখিনি। রূপকথায় ঐসব জিনিসের উল্লেখ আছে কিন্তু ওগুলো সত্যিই আছে বলে কখনো ভাবিনি। ওগুলো রাখা ছিল একটা টেবিলের ওপর, সেটা সোনার টানা দেওয়া একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা দেওয়া ছিল। ওদের সকলের সামনে দিয়ে আমাকে হেঁটে যেতে হতো আর গোপনে সোনা টানা দেওযা কাপড়টা একটু স্পর্শ করে আমার কলা তিনটি ওখানে রাখলাম। তারপর দেওয়ালের ধারের একটা চেয়ারের উপরে বসলাম আমার পা দুটো লুকোবার চেষ্টা করতে করতে আর না এলেই ভালো হতো এই কথা ভাবতে ভাবতে।

অন্য ছেলেমেয়েরা বেশ স্বচ্ছন্দেই ছিল – তারা আগেও পার্টিতে এসেছে। কথা বলতে বা হাসতে তারা ভয় পাচ্ছিল না কিংবা যখন কেউ তাদের কোনো প্রশ্ন করছিল তখন তাদের কণ্ঠগুলো ফিসফিসে বা ভাঙা ভাঙা হয়ে যাচ্ছিল না। প্রতি মুহূর্তেই আমি আরও বেশি করে অসুখী হয়ে পড়ছিলাম। আমার নিজস্ব জগতে আমি পালটা উত্তর দিতে পারতাম এমন কি নেতৃত্বও দিতে পারতাম, আর রেল লাইনের ওধারে কোনো ছেলের সাহস হতো না আমার বা আমার ভাই জর্জের গাযে হাত দেবার। যদি কেউ তা করতো তবে তাকে অস্ত্র হিসাবে জিমসন আগাছা হাতে আমার মুখোমুখি হতে হতো। কিন্তু এটা ছিল এক নতুন ধরনের বেদনা। স্কুলে ছোট্ট সাদা মেয়েটির সামনে আমি এমনটি বোধ করিনি : সেখানে আমি একটা অমূল্য শিক্ষালাভ করেছিলাম — সে পরিচ্ছন্ন আর ছিমছাম, কিন্তু আমি এমন জিনিস করতে পারি আর শিখতে পারি যা সে পারে না। সেইটার জন্য আর আমার শিক্ষিকার রক্ষাকর্ত্রীর মনোভাবের জন্য লজ্জায় পড়ে আমাকে তার পার্টিতে নিমন্ত্রণ না করে পারেনি।

'অবশ্য তুমি যদি খুব ব্যস্ত থাকো, তবে মনে কোরো না যেহেতু তোমাকে আমি নিমন্ত্রণ করেছি সেহেতু তোমাকে আসতেই হবে', সে বলেছিল। তার বয়স দশ

বছরের থেকে খুব বেশি ছিল না, তবু শিক্ষা তার ভালোই হয়েছিল। আবছাভাবে আমার মনে হয়েছিল কোথায় যেন একটা গলদ রয়েছে, তবু আমি কৃতজ্ঞভাবে তার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিয়েছিলাম ঃ

'আমি আসবো। আমার অন্য কোনো কাজ নেই।'

এখন এখানে একটা চমৎকার পার্টিতে আমি রয়েছি যেখানে আমি অবাঞ্ছিত। অনেক কষ্ট স্বীকার করে আমি তিনটি কলা এনেছি শুধুমাত্র আবিষ্কার করতে যে কোনো ছেলেমেয়েই এমন একটা সস্তা উপহার আনার স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না। আমার পোশাক, বাড়ি থেকে বেরোবার আগে যেটা অত সুরুচিসম্পন্ন মনে হয়েছিল, এখানে সেটা লজ্জাজনকভাবে অপরিচ্ছন্ন লাগছিল। আমাকে আমার একাকীত্বের থেকে বিচ্ছিন্ন করলো কয়েকজন মা, তারা আমাদের আর একটা ঘরে ডেকে নিয়ে গেলো আর লম্বা একটা টেবিলের ধারে আমাদের বসালো, একটা সাদা কাপড় দিয়ে টেবিলটা ঢাকা, চমৎকার সব কেক আর ফল দেখে আমার মন দমে গেলো সেগুলোকে যখন আমার তিনটি কলার সঙ্গে তুলনা করলাম। যখন কেউ লক্ষ্য করছে না তখন বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ছুটে বাড়ি ফিরে যাওয়া থেকে বিরত করলো, শুধুমাত্র আমার মাকে এই সম্বন্ধে সব কিছু বলার ইচ্ছা আর বেদনাদায়ক হলেও পৃথিবীর সব কিছু জানার ইচ্ছা। টেবিলে একটি ছোট ছেলের পাশে আমি বসেছিলাম।

'তুমি কোন্ রাস্তায় থাক?' সৌজন্যমূলক কথাবার্তা আরম্ভ করার চেষ্টায় সে জিজ্ঞাসা করলো।' 'রেল লাইনগুলোর ওপাশে'।

সে আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালো। 'রেল লাইনগুলোর ওপাশে! সেখানে তো খালি বদ ছেলেমেয়েরা থাকে!'

কিছু একটা বলার কথা চিন্তা করতে করতে আমি তার দিকে তাকালাম, কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না। সে তখন কথা বলার অন্য পথ খুঁজতে লাগলো।

'আমার বাবা একজন আইনজীবী — তোমার বাবা কি?'

'ইট বয়ে নিয়ে যায়।'

সে আবার আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। সেটার জন্য আমার অদম্য বাসনা হচ্ছিল তাকে রেল লাইনগুলোর ওপাশে নিয়ে যাবার — সে আর তার চশমা আর দোকানে কেনা পোশাক সমেত! এই রকম মেনীমুখো ছেলেদের ওপর আমরা গুলতি ব্যবহার করে থাকতাম। ও হলো দেমাকে, সেটাই হলো আসল কথা! কিন্তু কি নিয়ে সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

'আমার বাবা ইট বয়ে নিয়ে যায় না!' চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাবার জন্যই যেন সে আমাকে জানালো। কিন্তু অপমানটা যে কোথায় তা বুঝতে পারলাম না, তবু আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে অপমান করা হয়েছে। তাই উলটে আমিও অপমান করে কথা বললাম।

'আমি বাজি রেখে বলতে পারি আমার বাবা তোমার বাবাকে পেটাতে পারে!' আমি তাকে জানালাম, ঠিক যখন হাসিখুশি আর মার্জিত এক মা হলুদ রঙের আইসক্রীমের বড় বড় প্লেট হাতে নিয়ে আমাদের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল

'বেশ, বেশ, ক্লাবেন্স, তোমরা কি নিয়ে কথা বলছো?' স্নেহভরে সে জিজ্ঞাসা কবেছিল।'

'ওর বাবা ইট বয়ে নিয়ে যায় আর ও থাকে রেল লাইনগুলোর ওপাশে আব ওব বাবা আমার বাবাকে পেটাতে পারে!' ক্লারেন্স কিচিরমিচিব করে বলেছিল।

'তাতে কিছু এসে যায না, সোনা, তাতে কিছু এসে যায় না। বেশ বেশ এখন তোমরা শুধু আইসক্রীমটা খেযে নাও।' কিন্তু দেখলাম সেই মাটির দৃষ্টি বিবাগভবে আমাব ওপর ন্যস্ত হলো আর আমি বুঝলাম তাতে এসে যায়।

ক্লারেন্স তার চামচটা নিয়ে আইসক্রীমের মধ্যে ঢুকিযে দিলো আর তারপব আমাকে অগ্রাহ্য করে চললো। আমি আমার চামচটা তুলে নিলাম, কিন্তু প্লেটেব গাযে ওটার ঠোকা লাগলো। নীল পোশাক পরা, চুলের বিনুনীতে চওড়া সাদা সিল্কের ফিতে বাঁধা, ফিটফাট ছোট্ট, একটা মেয়ে কেতাদুরস্ত আড়ষ্টভাবে আমার দিকে তাকালো। আমি চামচটায় আর হাত দিলাম না, হাত দুটো নিচেয নামিযে রেখে অন্যেরা কেমন পরম প্রশান্তির সঙ্গে আর নিঃশব্দে খাচ্ছে তাই দেখতে লাগলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ঐভাবে আমি কখনো খেতে পারবো না আর আমি খাবার গেলবার চেষ্টা করলে টেবিলশুদ্ধ সবাই শুনতে পাবে। সেই মা'টি আবার ফিরে এসে খাবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, কিন্তু আমি বললাম আইসক্রীম বা কেক আমি পছন্দ করি না।' আমাকে সে ফল দিতে চাইলো, আমি একটা ফল নিলাম। এই ভেবে যে আমি বাড়িতে সেটা খেতে পারবো। কিন্তু ছেলেমেয়েরা টেবিল ছেড়ে উঠলে দেখলাম তারা কেউ ফল নিয়ে যাচ্ছে না। আমি তাই আমারটা অমূল্য আইসক্রীম আর কেকের পাশে রেখে দিলাম।

পাশের ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একটা খেলার জন্য জুড়ি বাছাই করছিল, আর ছোট্ট সাদা মেযেটি বাস্তবিকই পিয়ানোর ধারে বসেছিল বাজাবার জন্য প্রস্তুত হযে আমার চোখদুটো তার ওপর আটকে ছিল — পিয়ানো বাজাতে পারে, এটা কি ভাবতে পারা যায়! খেলার জন্য আমাকে ছাড়া প্রত্যেককে বেছে নেওয়া হলো। কোনো ছোট্ট ছেলে আমাকে নিচু হয়ে অভিবাদন করে বললো না :

'তুমি কি দযা করে আমার জুড়ি হবে?' আমি দেখলাম তারা ইচ্ছে করেই আমাকে এড়িয়ে গেলো .....

তার মধ্যে কিছু ছিল সেই একই ছোট ছেলের দল যারা স্কুলে অত নির্বোধ।

আমার ক্ষুদে নিমন্ত্রণকারিণীর মা আমার প্রতি অনুকম্পা দেখাবার চেষ্টা করেছিল :

'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে, মারি?' সে জিজ্ঞাসা করেছিল। 'তুমি বাড়ি যেতে চাও?'

'হ্যাঁ, মা-ঠাকুরুণ, আমার গলা ভাঙা ভাঙা, ফিসফিসে।

সে আমাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে করুণাভরে হাসলো, এই বলে যে, সে আশা করে যে আমার সময়টা ভালোই কেটেছে।

'হ্যাঁ মা-ঠাকরুণ,' আমার ভাঙা গলা উত্তর দিয়েছিল।

আমার পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভেতরে খেলা শুরু হয়ে গেছে আর ছেলেমেয়েদের কণ্ঠ সব হাসিতে ফেটে পড়ছে। পাছে কেউ জানলা দিয়ে দেখে আর মনে করে আমার মনে লেগেছে, আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আর দ্রুত পায়ে চলে যেতে যেতে কঠোরভাবে রাস্তার উলটোদিকের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

(খ্যাতনামা লেখিকা Agnes Smedley (অ্যাগনেস স্মেডলি)-র উপন্যাস Daughter of Earth হতে গৃহীত একটি পরিচ্ছেদের অংশবিশেষ।)

ম্যাক—আমেরিকান

রচনা : জন রীড

ম্যাকের সঙ্গে আমার দেখা হয মেক্সিকোয়—চিহুয়াহুয়া সিটিতে—নববর্ষের পূর্ব সন্ধ্যায়। সে ছিল স্বদেশের এক ঝলক বাতাস, অমার্জিত এক আমেরিকান। আমার মনে পড়ে চী-লীতে একপাত্র টম-আব-জেরির (Tom-and Jerry—সুরাসারযুক্ত পানীয বিশেষ) জন্য হোটেল থেকে আমরা যখন হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসেছিলাম তখন প্রাচীন ক্যাথিড্রালে মধ্যরাত্রের মাস (Mass)-এর জন্য ফাটা ঘণ্টাগুলো উন্মত্তের মতো বাজছিল। আমাদের মাথার ঊর্ধ্বে তপ্ত মরুভূমিব তারার দল। সারা শহর জুড়ে কুযারটেলগুলো (Cuartels—শিবিরগুলো), যেখানে ভিলার (Villa)২ সেনাবাহিনী সন্নিবেশিত ছিল সেখান থেকে, নিরাববণ পাহাড়গুলোব ওপরের সুদূর ছাউনিগুলো থেকে রাস্তাগুলোর রক্ষীদের কাছ থেকে পরম উল্লসিত গুলির শব্দ আসছিল। প্রমত্ত এক অফিসার আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় ফিয়েস্তাকে (fiesta-উৎসব) ভুল করে চিৎকার করে উঠেছিল "খ্রীষ্ট ভূমিষ্ঠ হলো!" পরের মোড়ে একদল সৈনিক, সেরাপেতে (Serepe—মেক্সিকান কম্বল, ক্লোক হিসাবে ব্যবহৃত হয) চোখ পর্যন্ত ঢেকে সেই অন্তহীন কাব্যগীতি "ফ্রান্সিসকো ভিলার উদ্দেশ্যে প্রভাত সঙ্গীত" গাইতে গাইতে একটা আগুনের কুণ্ডের ধারে বসেছিল। প্রতিটি গায়ককে মহান ক্যাপ্টেনের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে একটা করে নতুন স্তবক রচনা করতে হচ্ছিল.....।

প্লাজার ছায়াচ্ছন্ন পথগুলোর মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল আবার রাস্তাগুলোর মুখের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, গির্জার বিরাট দরজাগুলোর সামনে, তাদের পাপ স্খালনের জন্য জড়ো হওয়া কালো পোশাক পরা মেয়েদের নীরব অশুভ মূর্তিগুলো। ক্যাথিড্রালের মধ্যে থেকে একটা বিবর্ণ লাল আলো বাইরে এসে পড়ছিল—আর অদ্ভুত ইন্ডিয়ান কণ্ঠ একটা গান গাইছিল যেটা শুধুমাত্র আমি স্পেনেই শুনেছি।

"চলো ভেতরে গিয়ে উপাসনা অনুষ্ঠানটা দেখি," আমি বলেছিলাম। "ওটা নিশ্চযই দেখার মতো হবে।"

"মোটেই না!" ঈষৎ অস্বাভাবিক কণ্ঠে ম্যাক বলে উঠেছিল। "আমি কোনো লোকের ধর্মের ব্যপারে নাক গলাতে চাই না।"

"তুমি কি ক্যাথলিক?"

"না," সে উত্তর দিয়েছিল। "আমার মনে হয় আমি কিছুই নই। বহু বছর আমি কোনো গির্জায় যাইনি।"

"সাবাস তোমাকে!" চিৎকার করে উঠেছিলাম আমি। "তুমি তাহলে কুসংস্কারাচ্ছন্নও নও!"

কতকটা বিরাগ ভরে ম্যাক আমার দিকে তাকিয়েছিল। "আমি ধার্মিক লোক নই।" উদ্দীপ্তভাবে সে বলেছিল। "কিন্তু আমি ভগবানের নিন্দা করে বেড়াই না। তাব মধ্যে অনেক বিপদ আছে।"

"বিপদটা কি?"

"কেন, যখন তুমি মরবে—বুঝেছো...।" এবার বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ হয়েছিল সে।

চী-লীতে আরও দু'জন আমেরিকানের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। তারা ছিল সেই ধরনের লোক যারা সব কিছু মন্তব্যের সূচনা করে "আমি এই দেশে সাত বছর রয়েছি, আর এই দেশের লোকদের আমি আদ্যোপান্ত চিনি।"

"মেক্সিকান মেয়েরা", একজন বলেছিল, "পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে খারাপ। আরে, ওরা বছরে দু'বারের বেশি স্নান করে না। আর সতীত্বের কথা যদি বলো—তার কোনো অস্তিত্বই নেই। ওরা বিয়ে পর্যন্ত করে না। যে কোনো লোককে মনে ধরলেই তাকে জুটিয়ে নেয়। মেক্সিকান মেয়েগুলো সব বেশ্যা, মোদ্দা কথা হলো এটাই।"

"ছোট্টখাট্টো খাসা এক ইন্ডিয়ান মেয়ে রেখেছি টরিয়নে, অন্য লোকটি আরম্ভ করেছিল। "এটা তো একটা অপরাধ। আরে, তাকে আমি বিয়ে করি না করি এমন কি তা নিয়েও সে মোটে মাথাই ঘামায় না! আমি—"

"ওদের ধরনই তাই", বাধা দিয়ে অন্যজন বলেছিল। "নষ্ট চরিত্র! ওরা হলো তাই। আমি সাত বছর এদেশে রয়েছি।"

"আর জানো তো", অন্য লোকটি আমার দিকে দৃঢ়ভাবে তার আঙুল নাড়লো। "এসব কথা তুমি কোনো মেক্সিকান গ্রীজার (Greaser) কে বলতো পারো, কিন্তু সে শুধু তোমাকে ঠাট্টা করবে! ঐ ধরনের নোংরা ছুঁচো সব ওরা!"

"ওদের কোনো আত্মসম্মানজ্ঞান নেই", হতাশভাবে বলেছিল ম্যাক।

"কল্পনা করো একবার", প্রথম দেশওয়ালী ভাই আরম্ভ করেছিল। "কল্পনা করো যে এটা যদি তুমি একজন আমেরিকানকে বলতে তাহলে কি হতো!"

ম্যাক টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মারলো। "বেঁচে থাকুক আমেরিকান মেয়ে।" সে বলেছিল। 'আমার সামনে কোনো লোক যদি আমেরিকান মেয়েদের সুনামে কলঙ্ক লেপে দিতে সাহস করে আমার মনে হয় তাহলে তাকে আমি খুন করে ফেলবো।' সে টেবিলের চারপাশে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো, আর আমাদের মধ্যে থেকে কেউই মহান রিপাবলিকের নারীত্বের ওপর কলঙ্ক লেপন না করায়, সে বলে চললো। 'তারা হলো পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা আর তাদের আমাদের তেমনই রাখতে হবে। কেউ একবার আমার সামনে একজন মেয়ের সম্বন্ধে খারাপ কথা বলে দেখুক!'

আমরা আমাদের টম-আর-জেরি নিঃশেষ করলাম গ্যালহাডদের (galhads) একটা সভার ভাবগম্ভীর ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে।

'আচ্ছা ম্যাক', দ্বিতীয় লোকটি আচমকা বলে উঠলো। 'সেই শীতে কানসাস সিটিতে তুমি আর আমি যে দুটো মেয়েকে যোগাড় করেছিলাম তাদের কথা তোমার মনে আছে?'

'মনে আবার নেই?' সে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলা। 'আরো মনে আছে কিরকম সাঙ্ঘাতিক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছো বলে তুমি মনে করেছিলে?'

'সে কথা কখনো ভুলবো আমি!'

প্রথম লোকটি কথা বলেছিল। 'ভালো', সে বলেছিল 'তুমি তোমার সুন্দরী সেনোবিটাদের যত পারো সুখ্যাতি করো। কিন্তু আমার পক্ষে, একটি ছোট্ট নিষ্পাপ আমেরিকান মেয়েই যথেষ্ট....।'

ম্যাক ছিল লম্বায় ছ'ফিটের ওপর—যৌবনের ঔদ্ধত্যে, জানোয়ারের মতো এক মানুষ! বয়স তার পঁচিশ বছর মাত্র, কিন্তু অনেক জায়গা সে দেখেছে, আর অনেক কিছু হয়েছে : রেলের ফোরম্যান. জর্জিযায আবাদের ওভারসীয়ার, মেক্সিকান এক খনির সর্দার মেকানিক, কাউপাঞ্চার আর টেক্সাসের ডেপুটি শেরিফ। আসলে সে এসেছিল ভারমন্ট থেকে! প্রায় চতুর্থ টম-আর-জেরির সঙ্গে সঙ্গে, সে তার অতীতের পর্দা তুলেছিল।

'আমি যখন বার্লিংটনে কাঠের কলে কাজ করতে আসি, তখন আমি ষোল বছরের এক ছোকরা মাত্র। আমার ভাই ইতিমধ্যেই সেখানে এক বছর কাজ করছিল, আমাকে সে নিয়ে গেলো তার সঙ্গে থাকার জন্য সেই একই বাড়িতে আমার থেকে সে চার বছরের বড়ো ছিল—বিরাট চেহারার মানুষও কিন্তু একটু নরম প্রকৃতির...আর সব সময় মারামারি আর ঐ ধরনের কাজকর্ম করা কি রকম অন্যায় তা বলে দাপিয়ে বেড়াতো। আমাকে কখনো মারতো না—এমন কি যখন সে আমার ওপর রাগও করতো তখনও না, কেন না সে বলতো আমি তার থেকে ছোট।

"ঐ বাড়িতে একটি মেয়ে থাকতো, যার সঙ্গে আমার ভাই অনেকদিন ধরে প্রেম করে যাচ্ছিল! এখন আমার স্বভাব হলো অত্যন্ত বিশ্রী," ম্যাক হেসে উঠেছিল। "সব সময়েই অমনি হতো। আমার কিছুতেই চলবে না ভাইয়ের কাছ থেকে ঐ মেয়েটাকে আমায় ভাগিয়ে আনতেই হবে। আব শিগগিরই আমি তা করে ফেলেছিলাম। আর ভদ্র মহোদয়গণ, তোমরা জানো সেই শয়তান মেয়েটা কি করেছিল? একবার যখন আমার ভাই তাকে চুমু খাচ্ছিল, তখন সে হঠাৎ বলে ওঠে, 'আরে তুমি তো ঠিক ম্যাকের মতো করে চুমু খাও।'.....

"আমার ভাই আমার খোঁজে এসেছিল। মারামারি না করার সমস্ত চিন্তা তখন তার চলে গিয়েছিল, অবশ্য সত্যিকার একজন পুরুষ মানুষের কাছে ওটার কোনো মূল্যই নেই।

"রাগে সে এমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল যে আমি তাকে প্রায় চিনতেই

পারছিলাম না—তার চোখ দুটো দিয়ে আগ্নেয়গিরির মতো আগুন বার হচ্ছিল। সে বলেছিল, 'জাহান্নামে যাও, আমার বান্ধবীর সঙ্গে তুমি কি করছিলে? বিশাল তার শরীর, এক মুহূর্তের জন্য আমার একটু ভয় হয়েছিল। কিন্তু তারপরেই আমার মনে পড়লো কত নরম সে, আর আমি প্রস্তুত। তুমি যদি তাকে রাখতে না পারো, আমি বলেছিলাম—তবে তাকে ছেড়ে দাও!'

"মারামাটিটা খুবই মারাত্মক হয়েছিল। সে আমাকে খুন করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। আমিও ওকে খুন করার চেষ্টা করেছিলাম। মস্ত একটা লাল মেঘ যেন আমার ওপর ভর করেছিল আর রাগে আমি একেবারে পাগলের মতো খেপে গিয়েছিলাম। এই কানটা দেখছো?" ম্যাক তার নির্দেশিত অঙ্গটার গোড়াটা দেখিয়েছিল। "ওটা তারই কীর্তি। অবশ্য তার একটা চোখ নিয়েছিলাম আমি, যাতে করে সে আর দেখতে পায়নি। শিগগিরই আমরা ঘুষোঘুষি বন্ধ করেছিলাম; আঁচড়া আঁচড়ি, গলা টেপাটেপি, কামড়া-কামড়ি আর লাথালাথি করেছিলাম। লোকে বলে কয়েক মুহূর্ত অন্তর অন্তর আমার ভাই ষাঁড়ের মতো গর্জন করেছিল কিন্তু আমি শুধু হাঁ করে সমানে চিৎকার করে গিয়েছিলাম....। শিগগিরই আমি একটা লাথি মেরেছিলাম যেখানে ব্যথা লাগে ঠিক সেই জায়গায়, আর সে একেবারে মরার মতো পড়ে গিয়েছিল...।" ম্যাক তার টম আব জেরি নিঃশেষ করেছিল।

কে যেন আর এক পাত্র আনার হুকুম করেছিল। ম্যাক বলে চলেছিল।

"এর কিছু পরে আমি দক্ষিণে চলে আসি, আর আমার ভাই উত্তর পশ্চিম মাউন্টেড পুলিসে যোগ দেয়। ১৯০৬ সালে ভিক্টোরিয়ায় সেই লোকটাকে খুন করে যে ইন্ডিয়ান তার কথা কি তোমাদের মনে আছে? তাকে ধরবার জন্য আমার ভাইকে পাঠানো হয় আর তার ফুসফুসে গুলি লাগে। আমি তখন আমার বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—সেই ছিল একমাত্র সময় যখন আমি ফিরে ফিরে যাই—এমন সময় আমাব ভাই মরার জন্য বাড়ি ফিরে আসে...। কিন্তু সে ভালো হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে পড়ে আমি যে দিন চলে আসবো সেদিন সবে সে বিছানা ছেড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে একটা কথা বলার জন্য মিনতি করতে করতে আমার সঙ্গে সে স্টেশন পর্যন্ত এসেছিল। আমার করমর্দন করার জন্য সে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমি শুধু তার দিকে ফিরে বলেছিলাম, "কুত্তীর বাচ্চা!" এর কিছু পরে সে চাকরিতে ফিরে যাবার সময় পথে মারা যায়...।

"বাসরে!" প্রথম লোকটি বলেছিল। "উত্তর পশ্চিম মাউন্টেড পুলিস। সেটা একটা কাজ বটে। একটা ভালো রাইফেল আর একটা ভালো ঘোড়া আর ইন্ডিয়ানদের মারার কোনো ক্লোজড সীজন (Closed Season) নেই! তাকেই তো বলবো স্পোর্ট (Sport)!"

"স্পোর্টের সম্বন্ধে বলতে গেলে", ম্যাক বলেছিল, "পৃথিবীর সব থেকে বড়ো স্পোর্ট হলো নিগারদের শিকার করা। বার্লিংটন ছাড়ার পর, তোমার মনে আছে, আমি ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণে এসেছিলাম। পৃথিবীটা ভালো করে দেখতে চাইছিলাম,

আর আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে আমি মারামারি করতে পারি। ভগবান! কি মারামারিটাই না করতাম....। হ্যাঁ, যাই হোক, জর্জিয়ার এক তুলোর আবাদে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম, ডিক্সিভিল বলে একটা জায়গার কাছে ; আর ঘটনাক্রমে তাদের একজন ওভারসীয়ারের দরকার ছিল, তাই আমি লেগে পড়লাম।

"সে রাত্রের কথা আমার ভালোভাবে মনে আছে, কারণ আমি আমার কেবিনে বসে বাড়িতে বোনের কাছে চিঠি লিখছিলাম। তারসঙ্গে আমার বরাবর বেশ বনতো, কিন্তু আমার পরিবারের বাকিদের সঙ্গে আমরা বনাতে পারতাম না। গতবছর সে এক ঢাকির সঙ্গে এক ঝামেলায় পড়ে গেছে—আর আমি যদি তাকে ধরতে পারি—হ্যাঁ যা বলছিলাম : আমি সেখানে বসে ছোট একটা তেলের লণ্ঠনের আলোয় চিঠি লিখছিলাম। চটচটে, গরম রাত ছিল সেটা, আর জানলার পর্দাটা হয়ে গিয়েছিল শুধু কিলবিলে পোকার একটা তাল। কিলবিল করে চারপাশে তাদের ঘুরে বেড়াতে দেখে আমার সারা গায় চুলকাচ্ছিল। হঠাৎ আমি খান খাড়া করলাম, আর আমার মাথার চুলগুলো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে লাগলো। ওগুলো হলো সব কুকুর ব্লাড হাউন্ড—অন্ধকারে সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে। আমি জানি না ভাই তোমরা কখনো একটা হাউন্ডের ডাক শুনেছো কি না যখন সে একজন মানুষের পিছনে ধাওয়া করে...। রাত্রে যে কোনো হাউন্ডের ডাক হলো পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে নিঃসঙ্গ, সব থেকে সর্বনাশা শব্দ। কিন্তু ওটা ছিল তার থেকেও খারাপ। ওটা শুনলে তোমার মনে হতো তুমি যেন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছো, একজন কেউ যেন তোমায় গলা টিপে মারবে তারই অপেক্ষায়—আর তুমি পালিয়ে যেতে পারছো না।

"প্রায় এক মিনিটের মতো আমি শুনলাম শুধুমাত্র কুকুরদেরই ডাক, আর তারপর কোনো মানুষ কিংবা কোনো একটা জিনিস, আমার বেড়ার ওপর দিয়ে এসে পড়লো, আর ভারি পাগুলো দৌড়ে আমার জানলার পাশ দিয়ে চলে গেলো আর নিঃশ্বাসের শব্দ। তোমরা জানো একটা একগুঁয়ে ঘোড়া কিভাবে নিঃশ্বাস ফেলে যখন ওরা তার গলায় রশি পবিয়ে তার শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে থাকে? সেইভাবে।

"একলাফে আমি আমার গাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে কুকুরগুলো আমার বেড়া টপকাচ্ছে দেখতে পেলাম। তারপর কে একজন, যাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, চিৎকার করে উঠলো এমন ভাঙা গলায় যে সে প্রায় কথাই বলতে পারছিল না, 'কোথায় গেল সে?'

"বাড়ি পেরিয়ে পিছনের দিকে!" আমি বলেছিলাম, আর দৌড়তে শুরু করে দিয়েছিলাম। আমরা প্রায় বারোজন ছিলাম। কখনো জানতেও পারিনি নিগারটা কি করেছিল, আর আমার ধারণা অন্য লোকরাও তা জানতো না। আমরা মাথাও ঘামাইনি। পাগলের মতো আমরা ছুটেছিলাম, তুলোর খেতের মধ্যে দিয়ে আর বন্যার জলে ভরা জঙ্গলগুলোর মধ্যে দিয়ে, নদী সাঁতরে, বেড়াগুলো টপকে, এমনভাবে যা সাধারণত একজন লোককে একশো গজের মধ্যেই ক্লান্ত করে দিতো। আমরা কিছু বুঝতেও পারিনি। আমার মুখ থেকে টপটপ করে লালা ঝরে পড়ছিল—আর সেটাই

ছিল একমাত্র জিনিস যা আমাকে জ্বালাচ্ছিল। সেদিন ছিল পূর্ণিমা, আর মাঝে মাঝে আমরা যখন খোলা জায়গায় পৌঁছাচ্ছিলাম তখন একজন কেউ চিৎকার করে উঠছিল, 'ঐ যাচ্ছে সে!' আর আমরা ভাবছিলাম কুকুরগুলো বোধহয় ভুল করেছে, আর একটা ছায়ার পিছু পিছু ধাওয়া করছিলাম। আগা গোড়াই কুকুরগুলো ছিল সামনে, ঘণ্টার মতো ডাকছিল। বলো তো, তোমরা কি কখনো একটা ব্লাড হাউন্ডের ডাক শুনছো যখন সে একটা মানুষের পিছনে ধাওয়া করছে? ঠিক যেন একটা বিউগলের মত! বিশটা বেড়ায় লেগে আমার পায়ের সামনের দিকটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, আর জর্জিয়ার সমস্ত গাছে আমার মাথা ঠুকে গিয়েছিল, কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারিনি......।"

ম্যাক সশব্দে তার পানীয় গলাধঃকরণ করেছিল।

"অবশ্য", সে বলেছিল "আমরা যখন তার কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলাম, ততক্ষণে কুকুরগুলো তাকে প্রায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল।"

উজ্জ্বল স্মৃতিতে সে মাথা নেড়েছিল।

"তোমার বোনের চিঠিটা কি শেষ করেছিলে?" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

"নিশ্চয়", ম্যাক সংক্ষেপে বলেছিল....।

"এখানে, মেক্সিকোতে আমি থাকতে চাইবো না", ম্যাক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেছিল! "এখানের লোকেদের মন বলে কিছু নেই। আমি চাই লোকে মিশুকে হোক, আমেরিকানদের মতো।

১৯১৪।

১। Mass—খ্রীষ্টের নৈশ ভোজোৎসব পর্বোপলক্ষে গির্জায় ভজনা।

২। Villa-Francisco (ফ্রানসিসকো ভিলা) ১৮৭৭-১৯২৩ মেক্সিকোর বিপ্লবী নেতা।

৩। Closed Season—(ক্লোজড সীজন) বৎসরের যে সময়ে কোনো পশুপক্ষী মৎস্য প্রভৃতি শিকার করা বেআইনী।

পুত্র

আন দাক

বা আর তার স্ত্রী অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে রযেছে। বা র বয়স প্রায় চল্লিশ, তার স্ত্রী তার থেকে বছর দুই তিনেক ছোট হবে। একটা খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়ে মাদুরের ওপর পা ছড়িয়ে বসে ছিল সে। অনেকক্ষণ তারা চুপচাপই ছিল হঠাৎ মুঠি পাকিয়ে মাটিতে সজোরে একটা ঘুষি মারলো সে।

"আমি এটাই ঠিক করেছি।"

ওর স্ত্রী কিছু বললো না কিন্তু চোখ দুটো তার জলে ভরে গেলো। মুখটা তার করুণ লাগছিল। মাঝে মাঝে পাহারা দেবার উঁচু বুরুজ থেকে ছোঁড়া রাইফেলের এক আধটা গুলির আওয়াজ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছিল। "যুদ্ধ পরিচালনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছোট একটা গ্রামে" এতো নিত্যকার ঘটনা। দুজনের কেউ ওটাতে কান দিচ্ছিল না। গুলির আওয়াজ থেমে গেলেই, শোনা যাচ্ছিল চাঁচাড়ির বিছানায় শোয়া বছর ষোল কি ওরই কাছাকাছি বয়সের অল্প বয়সী একটি ছেলের নাকের ডাক।

পা দুটো মুড়ে বা উঠে দাঁড়ালো, তারপর আড়মোড়া ভেঙে তক্তপোষের দিকে এগিয়ে গেলো। ওর স্ত্রীও উঠে পড়ে ওর দিকে গেলো।

"ওকে যেতে হবে কখন?" ফিসফিস করে সে জিজ্ঞাসা করলো।

"তা এখনও জানি না তবে মনে হয় খুব শীগিগরই। সৈনিক তুর সঙ্গে দেখা করে আগে কথা বলি। তু পাহারা দিতে এলেই ও চলে যাবে।"

" ভগবান!" ওর স্ত্রী আর্তনাদ করে উঠলো। "তোমার হলো কি গিন্নী? তোমরা মেয়েরা অতি সহজেই কাঁদো। ক্রং কে যদি ওরা জোর করে ওদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে তাহলে কি তুমি খুশি হও?"

ওর স্ত্রী চোখ মুছতে মুছতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে জানে স্বামী তার এক কথার মানুষ : কোনো বিষয়ে একবার মনস্থির করলে, তার আর নড়চড় হবে না কখনও। তাদের ছেলে ক্রং সম্বন্ধে আজ প্রায় দু' সপ্তাহ ধরে সে তার সঙ্গে কথা বলেছে। সে বলেছে, "যুদ্ধ পরিচালনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রামে" তাদের ছেলেকে সে কিছুতেই থাকতে দেবে না। ক্রং এর মা যেন ছেলের জিনিসপত্র সব

গুছিয়ে ঠিক করে রাখে, ছেলেকে ওখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা সে করবে। "কোথায় ?" ওর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিল। "মুক্তি ফৌজের সঙ্গে" ওর কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিল বা। আরও বলেছিল : "এ নিয়ে অন্য কারও সঙ্গে কথা বলো না, এমন কি ক্রং এর সঙ্গেও না। ওর জামা কাপড় মেরামত করে দাও, জিনিসপত্র গুছিয়ে দাও। আর ঐ যে দুশো পিঅ্যাসতাব (মুদ্রা বিশেষ) আমরা জমিয়েছি সেটাতে হাত দিও না, ওটা আমরা ছেলেকে দেবো ও যখন যাবে। ও যে আমাদের একমাত্র সন্তান তা আমি জানি, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি বেশ ভালো করে ভেবে দেখেছি। ও বেশ শক্ত সমর্থ. আর বয়সটাও বাধ্যতামূলক ভাবে সেনা বাহিনীতে ভর্তির বয়সের কাছাকাছি। জোর করে ধরে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার জন্য যে ভাড়া করা দল আছে তাদের খপ্পরে পড়বার শিকার হিসাবে একেবারে তৈরি হয়ে আছে যেন। এ বিষয়ে আমাদের তাড়াতাড়ি মন স্থির করা ভালো, ঐ মুক্তি ফৌজের লোকেদের সঙ্গে যাক, ওকে ওরা মানুষ করে দেবে। ঠিকই, ওরা ওর হাতে রাইফেল দেবে আর সে রাইফেলও দেশদ্রোহীদের মারবার কাজে ব্যবহার করবে। লড়াই করতে করতে ও যদি মারাও যায়, তাহলেও আমি সুখ পাবো।"

প্রথমে যখন ওর স্বামী এ সম্বন্ধে ওর সঙ্গে কথা বলে তখন ও খুবই ভয় পেয়েছিল। যত গুণ্ডাবদমায়েসে ভরা "যুদ্ধ পরিচালনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামের" মত জায়গায় বাস করে ভয় না পেয়ে করবে কি ? সত্যি বলতে কি, ও ভয়ে একেবারে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু তারপর এটা নিয়ে সে অনেক চিন্তা করেছে, বুঝেছে বা ঠিকই বলেছে। ক্রং তাদেব একমাত্র ছেলে। শীগিগরই ওর বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার বয়স হবে, পুতুল সরকার ওকে ঠিক টেনে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, বা ঠিকই বলেছে : সেই দিনের অপেক্ষায় তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারে না। স্বামী তার সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটা জেনেও তার মানসিক যন্ত্রণা কিছু কমেনি। আজকাল ঘুম প্রায় তার হয়ই না, থেকে থেকে তার মনে পড়ে ষোলো বছর আগে কি অবস্থার মধ্যে সে তার ছেলেকে জন্ম দিয়েছিল। সে রাতে 'ভে কোক দোয়ান" এর এক ধাত্রী তাকে সাহায্য করেছিল, আর দূরে নতুন করে খোলা এক ফরাসী সামরিক ঘাঁটি থেকে গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ভে কোক দোয়ানই বাচ্চার কাঁথাকানির কাপড় যুগিয়েছিল। গরিব ক্ষেতমজুর তখন ওরা, ওদের নিজেদের জামাকাপড় বানাতো পুরোনো চটের থলের টুকরো দিয়ে। পরের বছর বিপ্লবী সরকার ওদের দুই হেকটার (প্রায আঠারো থেকে কুড়ি বিঘা) জমি দিয়েছিল, তারই রোজগার থেকে ভাল ভাবে খেয়ে পরে ছেলেকে মানুষ করতে পেরেছে। কিন্তু তিন মাস আগে দিয়েম সরকারের সৈনিকরা এসে তাদের বাড়ি আর জমির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সৈনিকদের মধ্যে একজন তাদের বাড়ির চালে উঠে চালটা নামিয়ে ফেলতে যাচ্ছিল — বা তাকে বাধা দেয় : সৈনিকটির পা ধরে টান দিতে সে মাটিতে পড়ে যায়। ওরা তখন রাইফেলের কুঁদো দিয়ে মারতে মারতে বাকে অজ্ঞান করে ফেলে, তারপর ওর ছেলে বউয়ের সঙ্গে টানতে টানতে নিয়ে যায়। এখন "যুদ্ধ

পরিচালনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রামে" তাদের আটকে রাখা হয়েছে, এ যেন সত্যিই এক কারাগার। এখানে তাদের খুবই কষ্টে জীবন কাটছে সদা সর্বদাই চলেছে পীড়ন আর ভীতি প্রদর্শন। এখন তাদের ছেলেকে বাধ্যতামূলকভাবে জোর করে সেনা বাহিনীতে ভর্তি করার মতো ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে চলেছে। এর থেকে মন্দ আর কিছু কখনও ঘটেনি তাদের। "বিপ্লব আমাদের জমি দিয়েছে", বা প্রায়ই তার স্ত্রীকে বলতো, "তারই দৌলতে আমরা আমাদের ছেলেকে মানুষ করতে পেরেছি। এখন ক্রংকে ওরা জোর করে দিয়েম এর সেনাবাহিনীতে ভর্তি করবে। সেটা কি আমরা হতে দেবো? তাকে কি আমরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়াতে দেবো? এই ভাবে কি আমরা আমাদের ঋণ শোধ করবো?"

সত্যি বলতে কি, বা'র স্ত্রী তার স্বামীর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কখনওই ভিন্ন মত পোষণ করেনি। আজ প্রায় এক সপ্তাহ ধরে, গোপনে সে তার ছেলের যাত্রার আযোজন করছে। কিন্তু কি কষ্টই সে পাচ্ছে : এমন কোন মা আছে যে তার ছেলেকে বিদায় দিতে কষ্ট পায় না, বিশেষ করে সে বিদায় যদি চিরস্থায়ী হবার সম্ভাবনা থাকে?

বিছানায় শুয়ে বা নাক ডাকাতে শুরু করে দিয়েছিল ওর স্ত্রী কিন্তু কিছুতেই ঘুমোতে পারছিল না। উঠে বসে সে কেরোসিনের ছোট্ট কুপির আলোয় ছেলেকে দেখতে লাগলো। ভয়ানক গরম। ক্রং তার সার্ট খুলেই ঘুমোচ্ছিল। নরমভাবেই ছেলের হাতের ওপর হাত রাখলো। বেশ বলিষ্ঠ। কঠিন সে হাত। তার সেই একরত্তি ছেলে আজ বলিষ্ঠ যুবা। হাতড়ে সে তার সেলাইয়ের সরঞ্জাম বার করলো, তার পর কুপিটা কাছে সরিয়ে এনে ওর সার্টটা মেরামত করতে বসলো। ছুঁচে সুতো পরাতে পরাতে ওর চোখ দুটো আবার জলে ঝাপসা হয়ে গেলো। থেকে থেকে রাইফেলের গুলির শব্দ আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে দিচ্ছিল। বেশ ক'জনের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল : নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা টহল দিতে বেরিয়েছে। এই শব্দ ছাড়া, ছোট্ট গ্রামটি একেবারে নিস্তব্ধ, অশুভরকমভাবে নিস্তব্ধ। বেড়ার চারকোণে পাহাড়া দেবার বুরুজগুলোয় শয়তানের চোখের মতো বাতি জ্বলছিল। পরিখার জলে কাঁটাতারের জটিল বেড়ার ছায়া পড়ছিল।

"এখন এই কথাটাই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম। তুমি কি যাবে?" বা ওর ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলো। ক্রং কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো, তারপর তার বাপের দিকে তাকালো। বা তার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলো : "তুমি কি যাবে? তোমার ভয় করছে কি'?

ক্রং তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। বাপের দিকে না তাকিয়েই সে বললো, "ভয় করবে কেন? তুমি এক্ষুণি আমায় যা বললে, সে সম্বন্ধে আমি বহুবার ভেবেছি। আমি এখনি যেতে প্রস্তুত। রাত্রে যাবো কেন? দিন দুপুরেই যাবো।"

"না, বাবা, কেউ দেখতে না পেলেই ভালো। রাত্রে যাওযাই অনেক সহজ হবে। সৈনিক তুর সঙ্গে কথা বলছি। পাহারা দেবার প্রধান বুরুজটাতে ও শীগগিরই পাহারা দিতে যাবে। ও তোমাকে যেতে দেবে, তারপর একটু বাদে বিপদ সঙ্কেত দেবার জন্য একটা গুলি ছুঁড়বে। আমি ভাব দেখাবো তুমি যেন সদ্য সদ্য পালিয়ে গেছো।

বৃদ্ধ ঠিকই বলেছে, ক্রুং ভাবছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললো :

"আমি চলে গেলে ওরা তোমার ওপর খুবই অত্যাচার করবে?"

"সে নিয়ে চিন্তা কোরো না। তোমার পালিয়ে যেতে পারাটাই হচ্ছে আসল। ওরা যদি আমাকে বাইফেলের কুঁদো দিয়ে দু একটা বাড়ি দেয তাতে আমার কিছু সে যাবে না। ছেলেটা স্থির হয়ে বসে রইলো। বসে বসে সে ভাবছিল। ভাবছিল, সে চলে গেলে কি হবে : মাকে কাঠ এনে দেবে কে? ওর জন্য ভেবে ভেবে মা একেবারে কেঁদে সারা হয়ে যাবে। ওর মনের মধ্যে সুখ দুঃখ এক সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। তারপর ভাবছিল সেই দিনটির কথা, সহ-সৈনিকদের সাথে ফিরে এসে যখন ওর বাবা মা, ওর খুড়ী তাম, খুড়ো নাম আর খুড়তুতো বোন লান আর কে মুক্ত করবে সে। এখানে যত রক্ষী আর স্থানীয বাহিনীর লোক আছে তাদের একেবারে সঙ্গে সঙ্গে দূর করে দেবে। যত খুঁটি আর বেড়া আছে সব উপড়ে ফেলে দেবে। সৈনিক তু আর চিন কোর মতো লোক, যারা আমাদেব পক্ষে রয়েছে তাদের তাদের কিছু করা হবে না, কিন্তু বাকীদের সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দেবে। মনশ্চক্ষে সে দেখতে পাচ্ছিল যুদ্ধের উত্তেজনায ভরা সেই সব দৃশ্য। "একবার তুমি মুক্ত অঞ্চলে গিয়ে পৌছলে" ওরা বলতে লাগলো, "তোমাকে খুবই পরিশ্রমী আর সক্রিয় হতে হবে, বুঝেছো? সব রকমের কষ্টকে জয় করবে। যদি ওরা তোমাকে মুক্তি ফৌজে নেয়, তা হলে তো কোনো কথাই নেই, কিন্তু যদি তোমাকে সামান্য একজন সংবাদ বাহকের কাজও দেয় তাহলেও তুমি আপত্তি করবে না। তোমাকে যে কাজই দিক তুমি সেটা গ্রহণ করবে, বুঝেছো?"

শেষ কথাটার ওপর তার বাবা বেশি জোর দিল। একই কথার এই রকম পুনরাবৃত্তিতে ক্রুং যেন একটু বিরক্তই হলো। বিপ্লবের শামিল হলে কষ্ট তো পেতেই হবে। সেসব সে ভয় করে না। সে তো কতবার সাঁতরে নদী পার হয়েছে, কতবার ধান ক্ষেতে আর জলার কাদা ভেঙে যাতায়াত করেছে, একসাথে দু'তিনদিন অনাহারে কাটিয়েছে। অবশ্য খিদে জিনিসটা খুবই কষ্টকর, কিন্তু সে তো নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করছে কিছুতেই দমবে না সে। যা যা কষ্ট তার কমরেডরা সহ্য করেছে — সেও সেগুলো সহ্য করবে। ক্রুং বাইরের দিকে তাকালো কাঁটা তারের বেড়ার ওধারে অর্ধনির্মিত বাঁধ, নদী, বিস্তৃত মাঠ, তারপর সবুজ বেড়া ঝোপ, ঐখানে তো ছিল মাই হিপের গ্রাম, তারপরেই ওর নিজের গ্রাম, তান হিয়েপ। নদী সে সাঁতরেই পার হবে — সেটা বেশ সহজ, ওই নদী তো সে বার বার এপার ওপার [illegible] পারে। তারপর সে দৌড় লাগাবে, বিস্তৃত ঐ মাঠ সে চট করে পার হয়ে [illegible]। না, সে দিক থেকে তার কোনো অসুবিধা হবে না .....।

"আসল কথা হচ্ছে ...." ওর বাবার গলা আবার চড়তে লাগলো।

"আবার সেই বিরক্তিকর আসল কথা ...." একটু অশ্রদ্ধাভরেই ভাবছিল ক্রুং।

"আসল কথা হচ্ছে তোমার সাহসের খুবই প্রয়োজন। মাই দিয়েম সেনাবাহিনীদের আমরা হারিয়ে দিতে পারি তার কারণ হচ্ছে আমাদের মনোবল ওদের থেকে অনেক বেশি। ওরা যে কোনো সুযোগেই পালাবার জন্য প্রস্তুত, আর আমাদের লোকেরা হুকুম পাবার আগেই আক্রমণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

ক্রুং বাপের দিকে একবার তাকালো, মনে মনে সে ভাবছিল, "ভগবান, হুকুম দেবার আগেই আক্রমণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে একজন সৈনিক!" এই ধারণাটা যেন হাস্যকর মনে হলো তার, কিন্তু এই কথাটাতেই সে যে কৌতুক বোধ করছে এটা দেখাতে কিংবা বাপের কথার প্রতিবাদ করতে তার সাহস হলো না। মানুষটা একটু রগচটা, চটে যদি যায় তাহলে ওকে একচোট নেবে। কিন্তু ক্রুং জানে কি গভীর ভাবেই না ওর বাবা ওকে আর ওর মাকে ভালোবাসে ; তার মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করাটাই শুধু সে অপছন্দ করে। আর তার মা, তার মনটা খুবই নরম, ছেলে অন্ত প্রাণ তার : সে চলে গেলে মা নিশ্চয় কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবে। সে যে তার মার একমাত্র সন্তান, সেইতো মুস্কিল, তার যদি একটা ছোট বোন থাকতো, তার খুড়তুতো, বোন কের মত, তাহলে মার একটু সান্ত্বনা মিলতো। এখন সে রান্না ঘরে ব্যস্ত। খাসা গন্ধ আসছে সেখান থেকে। কি তৈরি করছে মা? হয় তো তার প্রিয় সেই নুডল আর চিংড়িমাছ। অনেক দিন ওটা খায়নি সে। কারণ হচ্ছে, "যুদ্ধ পরিচালনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামে" চিংড়ি সহজে মেলে না। খুঁটি আর তার দিয়ে তাদের ঘিরে দেবার আগে তান হিয়েপ এর কাছাকাছি যে খাল আছে, সেখান থেকে সে চিংড়ি ধরে আনতো। খালের অগভীর জলে কয়েক মিনিট হাঁটলেই প্রচুর চিংড়ি ধরা যেতো। কিন্তু এখানে চিংড়ি ছাড়াই চালিয়ে নিতে হবে। আজ সকালে ওর মাকে নিরাপত্তা বাহিনীর হাই এর কাছ থেকে বাজারে যাবার জন্য বিশেষ ছাড়পত্র চেয়ে নিতে হয়েছে, সেখান থেকে মা ক'টা চিংড়ি এনেছে, এ ক'টা মাছের প্রচুর দাম নিয়েছে, ৮টার জন্য ১৫পিঅ্যাসতার!

খাবার দেবার আগে ওর মা বাটি ও চপস্টিক (খাবার খাওয়ার কাঠি) গুছিয়ে রাখছে এমন সময় কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল : হাই এসে হাজির। নয়া কায়দায় বানানো তার "ডেক্রন" পাৎলুনের দুই পকেটের মধ্যে দুই হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলো :

" ওহে আজ সন্ধ্যায় রাজনৈতিক অধ্যয়ন হবে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : সরকারের সাদর অভ্যর্থনা নীতি"।

কোনো উত্তর না পেয়ে সে ষাঁড়ের মতো চীৎকার করে উঠলো : কি হলো, সব মরে গেলো না কি? বাড়িতে কি কেউ নেই?" বাইরে না বেরিয়ে বাড়ির ভিতর থেকেই বা বললে।

"আমি এখানে!"

"তোমার হাঁড়িপানা মুখটা এমনি করে চেপে বন্ধ করে রেখেছে কেন? নিরাপত্তা বাহিনীর লোকটা বললো। শোনো আজ সন্ধ্যায় মিটিং ঘরে যাবে, প্রেসিডেন্ট নো দিন দিয়েম এর সাদর অভ্যর্থনা" নীতি অধ্যযনের বৈঠক বসবে। যদি তোমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ভিয়েতকংদের অনুগামী কেউ থেকে থাকে তবে তাদের বোঝাবার চেষ্টা কর যাতে তারা ফিরে যায় .... হুম .... কি চমৎকার গন্ধ! কি রাঁধছো?

"চালের বদলে নুডল? তোমরা খুব বড়লোক বলতে হবে! যদিও, তোমাদেব এখানে আনা কি কষ্টের বলো?"

"তা আমরা হয়তো বড়লোক, কিন্তু ....।"

"থামো ....। আমি জানি কি নিয়ে তুমি অনুযোগ করতে যাচ্ছিলে...। দাম বাড়ছে.... সব কিছুই দুষ্প্রাপ্য .... এই সব আর কি?"

নিরাপত্তা বাহিনীর লোকটা চলে গেলে আপন মনে বিড় বিড় করে বলল : "সাদর অভ্যর্থনা নীতি? কাল আমি আমার ছেলেকে ভিয়েতকংদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

দুপুরের খাবারের পর, বা তার ছেলেকে বললো দোয়াত কলম আনতে। স্থানিক বাহিনীর কোনো লোক যদি হঠাৎ এসে পড়ে তাই ছেলেকে বললো দরজায় পাহারা দিতে। তার নিজের কোনো রকম সুপারিশ ছাড়া ছেলেকে সে বিপ্লবে অংশ নিতে দেবে না। কাগজ কলম ঠেকাতে গিয়ে তার মনটা কেমন একটা পবিত্রভাবে পূর্ণ হয়ে উঠলো। মনে হলো ও যেন কোনো এক অনুষ্ঠানে বিপ্লবী পতাকাকে অভিবাদন জানাচ্ছে কিংবা যেন শহীদদের সমাধির সামনে মাথা নত করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। চোখ দুটো ওর সজল হয়ে উঠলো, হাত কাঁপতে লাগলো। অনেকক্ষণ বাদে তবে সে কিছু লিখতে পারলো। আসলে চিঠিপত্র সে বিশেষ লেখেনি। কিভাবে আরম্ভ করবে ঠিক বুঝতে পারছিল না। প্রথমে সে ভেবেছিল লিখবে : "আমার গিন্নির আর আমার একটা মাত্র ব্যাটা।" কিন্তু খানিকক্ষণ চিন্তা করে সে লিখলো : "আমার স্ত্রী ও আমার একটি পুত্র।" এটা অনেক ভালো শোনালো।

বিছানার ওপর কুঁজো হয়ে বসে, প্রত্যেকটি অক্ষর খুব সাবধানে লিখতে লাগলো। ক্রং এর কাশির আওযাজ পেলেই কাগজটা তাড়াতাড়ি মাদুরের তলায় লুকিযে ফেলছিল। আবার একটা সঙ্কেত পেলেই, ওটা বার করে আবার লিখতে শুরু করেছিল।

চিঠিটা লিখতে তার প্রায় সকালটাই কেটে গেলো।

অন্য দিনের তুলনায় অনেক আগেই তারা তাদের রাতের খাওয়া সেরে নিলো। বার স্ত্রীর খাবারে কোনো স্পৃহাই ছিল না। মুখের কাছ পর্যন্ত বাটিটি তুলেই আবার নামিয়ে রাখলো। ক্রং এর ও বিশেষ খিদে ছিল না। ওদের পরিবারের মধ্যে ওর

বাপই একমাত্র নিশ্চিতভাবে খেয়ে গেলো, বরাবরের মতো। বেশ একটু স্নেহমাখা স্বরে সে তার ছেলেকে বললে :

"খেয়ে নাও বাবা, যতটা পারো। তোমার মা বোধহয় তোমার জন্য এই শেষবারই রাঁধলো।"

ওর স্ত্রী উঠে পড়লো তারপর চাটাইয়ের বিছানার ওপর বসে পড়ে কাঁদতে লাগলো। ক্রং তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লো। আপাত দৃঢ় গলায় সে বললে :

"তুমি কেঁদো না, মা, তোমার তো খুশি হবার কথা। শীঘ্রই বেশ অন্ধকার হয়ে যাবে। আমার পুঁটলিটা কই?"

"এই যে এখানে।"

ওর মা ওর হাতে ছোট্ট একটা পুঁটলি তুলে দিল :

ওর মার একটা স্কার্ফ-এ বাঁধা কয়েকটি জামা কাপড়। ক্রং পুঁটলিটা নিয়ে মাটিতে বসলো। স্কার্ফটা থেকে ঘামের তীব্র গন্ধ আসছিল।

ওর চোখ দুটো জলে ভরে গেলো। মাথাটাও ঘুরিয়ে নিলো, ওর মাকেও দেখতে দিতে চাইছিল না। তার মনে হচ্ছিল, মুক্তিফৌজের সঙ্গে যেখানেই থাক না কেন এই অমূল্য স্কার্ফটা সে সব সময় সঙ্গে রাখবে। মনে হবে ওর মা যেন ওর পাশেই রয়েছে। ঠিক এই সময় ওর মা এসে ওর পাশে বসে পড়ে ছোট একটা মোড়ক ওর হাতে গুঁজে দিলো :

"এর মধ্যে তোর জন্য ক'টা টাকা পয়সা আছে", সে বলল।

ক্রং মোড়কটা খুলে ফেললো : ওর ভেতর দেখে ৪টে ৫০ পিঅ্যাসতার নোট রয়েছে। একটা নোট নিয়ে বাকী গুলো ফেরত দিলো :

"একজন সৈনিকের এত টাকা লাগে না, সে বললে। কিন্তু ওর মা পীড়াপীড়ি করতে থাকায় শেষ পর্যন্ত আরও একটা নোট সে নিলো।

ইতিমধ্যে, বা বেরিয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে ফিরে এলো।

"তুর সঙ্গে দেখা হয়েছে", সে বললে, "সব ঠিক আছে।"

"আমি কি এক্ষণি বেরিয়ে পড়বো, বাবা?" ক্রং জিজ্ঞাসা করলো।

"না এখনই নয়, একটু অপেক্ষা করো রাত আরও বেশি হোক, তারপরে। এই নাও, এটা রাখো····"।

তার লেখা চিঠিটা সে ছেলের হাতে দিলো :

"এটা সাবধানে রাখবে। মাই হিয়েপ গ্রামের পার্টি শাখার সেক্রেটারি বিন তাম খুড়োকে দেবে। যদি তার দেখা না পাও তাহলে এটা মুক্তিফৌজের যে কোন সৈনিক বা গেরিলাবাহিনীর যে কোন লোকের দেখা পাবে, তাকে দেবে। শোনো : অল্পক্ষণের মধ্যেই তোমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। তুমি যাবে প্রধান ফটকটা দিয়ে সেখানে তু রয়েছে পাহারায়। ও তোমাকে যেতে দেবে। নদী পার হবার পর হয়তো তুমি একটা গুলির শব্দ শুনতে পাবে। ভয় পেয়ো না : গুলিটা তু-ই ছুঁড়বে। রাস্তায় পৌছে, রাস্তা দিয়ে যাবে না, সেখানে পদে পদে বিপদ। খালের মধ্যে দিয়ে যাবে।"

ক্রুং বললে, "ঠিক আছে।" কিন্তু ওর মাকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছিলো।

প্রায় ঘন্টা খানেক বাদে, আশে পাশে কেউ কোথাও আছে কিনা তার বাপ সেটা ভালো করে দেখে নেবার পর, ক্রুং বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। কিছুটা দূর গিয়ে পিছন ফিরে দেখে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা তার মাকে কালি লেপে আঁকা ছবির মতো দেখা যাচ্ছে। বুঝতে পারলো মা কাঁদছে।

এবার ক্রুং "যুদ্ধ পরিচালনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামের" প্রধান ফটকের সামনে হাজির হলো। ফটকটা খোলাই ছিল। একটু ঠেলা দিয়ে ফটকের ফাঁক দিয়ে আস্তে করে গলে বেরিয়ে এলো। একেবারে শেষের তারের বেড়াটা পার হয়ে মাঠের ধারে পৌঁছেই সে পিঠে পুঁটলি ঝুলিয়ে নিয়ে দৌড় লাগালো। এলোমেলো বাতাস দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে, দম নেবার জন্য থামলো সে। বেশ বুঝতে পারছিল ওখানের বাতাস গ্রামের ভেতরের বাতাসের থেকে অন্য রকমের। নদীর ধারে সে জামা কাপড় খুলে স্কার্ফে জড়িয়ে নিলো। একহাতে পুঁটলিটাকে মাথায় ওপর উঁচু করে ধরে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলো। সে নদীর অপর পারে পৌঁছেছে তখন তার বাপের ভবিষ্যদ্বাণী মত রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনতে পেলো। ঠাণ্ডা মাথার তীরে উঠে জামা-কাপড় পরে গ্রামের দিকে ফিরে তাকালো। দেখলো পাহারা দেবার বুরুজগুলোর বাতি, আর মাঝে মাঝে টর্চের আলোয় চমক।

"ওরা তল্লাশি চালাচ্ছে" ও ভাবছিল।

একটা ফলের বাগানের কাছে এসে যখন পৌঁছলো বেশ রাত হয়ে গেছে। তার বাপের নির্দেশমতো আবার জামাকাপড় খুলে খালের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। মাত্র বুক পর্যন্ত জল। কিছুটা পথ এইভাবে যাবার পর পাড় থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেলো।

"কে ওখানে?"

"আমি" ও উত্তর দিলো।

"আমি কে?"

"আমি .... আমি" "যুদ্ধ পরিচালনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম" থেকে আসছি। আমাকে পাড়ে উঠতে দাও...।"

খালের পাড়ে একটা ছায়ামূর্তি দেখা দিলো, তারপর, আর একটা! তার দিকে রাইফেল তাগ করে ধরা, টর্চের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। শুনলো একজন বলছে :

'একজন মাত্র দেখছি .... একটা বাচ্চা ছেলে ...." তখন সেই কণ্ঠস্বর তাকে জিজ্ঞাসা করলো :

"তুমি তাহলে "যুদ্ধ পরিচালনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম থেকে আসছ। তাই না? আর কেউ আছে তোমার সঙ্গে?"

"না, আমি একা।"

ক্রুং খালের পাড়ে উঠে পড়লো। জামাকাপড় পরে নিয়ে সে বিন তাম খুড়োর

সঙ্গে দেখা করতে চাইলো। ওরা তাকে বললো সে ওখানে নেই। ওদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো :

"আমাদের তুমি কিছু বলতে চাও কি ?"

ক্রং একটু ভেবে বললো :

"হ্যাঁ"।

"ঠিক আছে। এসো আমার সঙ্গে।"

ক্রং লোকটির পিছু পিছু চললো, পায়ে চলা পথ দিয়ে সে তাকে একটা বাড়িতে নিয়ে গেলো। একটা বাতি জ্বেলে সে ওর আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিলো, তারপর আর একজন লোককে ডাকলো। লোকটি উঠে বসে চোখ মুছতে লাগলো ;

"কি ব্যাপার ?"

"একটা বাচ্চা ছেলে এসেছে "যুদ্ধ পরিচালনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম" থেকে ; তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে ?"

'কোথায় সে ?"

ক্রং সাহস করে বললে "এই যে আমি।"

তারপর সে তার বাপের চিঠিটা বার করে লোকটির হাতে দিলো।

"আমার বাবা আমাকে বলেছে বিন তাম খুড়োর হাতে এটা দিতে", সে বললো, "আর যদি তার সঙ্গে দেখা না হয় তবে মুক্তি ফৌজের বা গেরিলা বাহিনীর যার সঙ্গে দেখা হবে তাকে দিতে।"

গেরিলাবাহিনীর কমাণ্ডার (সেনাপতি) তার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে বাতির কাছে গেলো। পড়া শুরু করতেই তার ঝাঁকড়া ভুরু কুঁচকে গেলো। হাতের লেখা গোটা গোটা, ব্যাঁকা ট্যারা :

"বিপ্লবী মুক্তি ফৌজের ভাইসব,

আমার স্ত্রীও আমার একটি মাত্র পুত্র। এখন আমরা "যুদ্ধ পরিচালনার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামে" আটকা পড়ে গেছি। অতীতে, বিপ্লবের দৌলতে জমি পাওয়ায় আমাদের দিন ভালোই কাটছিল। বিপ্লব ও পার্টির কাছে আমরা খুবই ঋণী। আমার পুত্র (বর্তমান পত্রের বাহক) এখন বড় হয়ে গেছে। বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য তাহাকে মাই দিয়েম এর সেনা বাহিনীতে জবরদস্তি করে ভর্তি করা আমি চাই না। তাই বিপ্লবের প্রতি আমার উপহার হিসাবে তাকে আমরা তোমাদের নিকট পাঠাচ্ছি। তাকে মানুষ করে তুলো। তা হলেই আমরা তোমাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

গরিব চাষী নুয়েন ভান বা সইয়ের নিচের নারকেল তেল ও ভুষো কালি মিশিয়ে তাতে বুড়ো আঙুলের তর্জমা ডুবিয়ে টিপসই দেওয়া রয়েছে। গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার ক্রং এর কাছে এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখলো।

"তুমিই সেই ছেলে, "সে বললো, যেন সে ছেলেটিকে এই প্রথম দেখলো।" তোমার বাবা তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে, তাই না ?"

ক্রং হেসে ঘাড় নাড়লো। কমান্ডার আরও বললো ঃ

"তোমার বিন তাম খুড়ো তোমার কথা বলেছে। বেশ, তুমি এখানে থাকতে পারো। হয়তো তুমি আমাদের সঙ্গে যাবেও। কিন্তু এখন রাত হয়ে গেছে। শুয়ে পড়ো। কালকে সব কিছু খুঁটিয়ে আলোচনা করা যাবে। আমার মশারীটা বেশ বড়। ভেতরে চলো এসো।"

শ্রী হরিশ চণ্ডোলার সৌজন্যে প্রাপ্ত ভিয়েতনামের আন দাম লিখিত সন গল্পটির অনুবাদ।

দুর্বার দক্ষিণের বাতাস

রচনা : আমা আতা আইদুর

আসানা আম্মা কোলা-বাদামের অকিঞ্চিৎকর স্তূপের দিকে তাকিয়ে থুথু ফেললো, আর টুকরিটা তুলে নিলো। তারপর টুকরিটা নামিয়ে একটা বাদাম তুলে নিয়ে সেটায় একটা কামড় দিয়ে সেটা ছুঁড়ে স্তূপের মধ্যে ফেলে আবার থুথু ফেলে উঠে দাঁড়ালো। তীব্র ক্ষণস্থায়ী একটা ব্যথা তার বাঁ কানের নিচে কোথায় যেন চাগিয়ে উঠলো। চোখদুটো তার ঝাপসা হয়ে এলো।

'জ্বালানি কাঠগুলো একবার দেখতে হবে', সে ভাবছিল চোখ ঝাপসা হয়ে আসাটা যে বাতাসের ঠাণ্ডা আমেজের জন্য এই কথা চিন্তা করতে করতে। বাদামের ঝোপগুলোর ওপর হেঁটে হলো সে।

'এই ঘেসো জমির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এই ধুলোর ওপর কার কুদৃষ্টি পড়বে জানি না, আমি বরং তাড়াতাড়ি ওগুলো তুলে ফেলি।'

ক্রাল-এ (Kraal)১ ফিরে যাবার সময় তার চোখ পড়লো বিশেষ করে এবড়ো খেবড়ো গোলাকার জায়গাগুলোর ওপর, আগেকার দিনে ছিল খনির মুখগুলো। আগেকার দিনে, এই সময় জায়গাগুলো প্রায় ফেটে পড়ার মতো হতো আর বিদায়ী মরসুমের অবশিষ্ট অংশগুলো খুঁড়ে ফেলতে ফেলতে ঐ খনি-মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা প্রায় যৌন আনন্দের শিহরণ অনুভব করা যেতো, ঠিক যেমন কল্পনা করা যায় নয় মাসের গর্ভবতী স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একজন পুরুষের অনুভূতি হতে পারে, সেই রকম।

গর্ভধারণ আর জন্ম আর মৃত্যু আর যন্ত্রণা ; আর আবার মৃত্যু ... যখন আর কোনো জন্ম নেই আর তাই, কোনো মৃত্যুও নেই।

একটা নতুন মৃতদেহ দেখাও, বোন, যাতে করে আমি আমার পুরোনো কান্না কাঁদতে পারি।

তার পেটের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো, নড়ে উঠলো কি যেন জঠরের মধ্যে, দরজাটা ভর করে তাকে দাঁড়াতে হলো। বিশ বছরে একমাত্র গর্ভধারণ হলো ফুসেনিই। বিশ বছর, আর প্রথম সন্তান জন্মালো আর তাও এক পুত্র সন্তান! আগেকার দিনে বড় বড় হরিণ মারা হতো আর গর্ভবতী মেয়েকে ছোট হরিণ দিলে

ভর্ৎসনা শুনতে হতো। কিন্তু এখন সরকারী অভয়ারণ্যের ঘৃণ্য চোরা শিকারীর দল তাদের ছোট ছোট নিকৃষ্ট হরিণগুলো চুপিসাড়ে পাচার করে নিয়ে যায়, এমনই নিকৃষ্ট মাদী হরিণ সব! হ্যাঁ তারা এমনকি ছোট ছোট হরিণগুলো পর্যন্ত লুকিয়ে নিয়ে যায় দক্ষিণের ঐসব লোভী লোকগুলোর বাড়িতে বাড়িতে।

আগেকার দিনে, সময় কি ভাবে কেটে যায়, কত তাড়াতাড়ি বয়স বেড়ে যায়। কিন্তু নাতি নাতনী হতে আরম্ভ করলে তখন কি মানুষ আশা করে যে তার বয়স কমে যাবে? একটা নাতি দেওয়ার জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ।

যখন সে ঘরে ফিরে এলো তখনও আগুন বেশ ভালোভাবেই জ্বলছিল। আসানা আম্মা বাদামগুলো নামিয়ে রাখলো। গলা বাড়িয়ে কোনার দিকে দেখলো সে। জ্বালানি চ্যালা কাঠগুলোয় তাদের অন্তত পরের সপ্তাহটা চলে যাবে। বাকি সন্ধ্যাটা বসে সে আগামীকাল সকালের হাটের প্রস্তুতি করলো।

সন্ধ্যার প্রার্থনা সমাপ্ত হলো। টাকাটা থলের ভিতর। মাঠঘাট নিস্তব্ধ। হাওয়া ঘুমোচ্ছিল আর ফুসেনিও। আম্মা সদর দরজার কাছে বেরিয়ে এলো, প্রথমত সব কিছু ঠিক আছে কি না দেখতে তারপর দরজাটা বন্ধ করতে। কাউকে দেখে নয় বরং হালকা পা যা আরও হালকাভাবে চলার চেষ্টা করছে তারই খসখস শব্দ তার মনোযোগ আকৃষ্ট করলো।

'আমার স্বামী যদি আসতো'

কিন্তু অবশ্যই স্বামী তার আসেনি!

'কে ওখানে?'

'আমি আম্মা।'

'কে ইসা, আমার বাছা?'

'হ্যাঁ, আম্মা।'

'ওরা ঘুমোচ্ছে।'

'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম। আর সেই জন্য আমি এখন এসেছি।'

কথাবার্তার মাঝখানে দীর্ঘ একটা বিরতি পড়লো, দুজনেই ইতঃস্তত করছিল জামাই হাওয়া আর বাচ্চাকে দেখতে যাবে কি না! এই দোটানা সম্বন্ধে কিছুই বলা হলো না তাছাড়া সব কিছু তো আর বলা যায় না।

আসানা আম্মা দেখতে পেলো না বটে তবে বুঝতে পারলো যে ইসারই জয় হলো। সদর দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে আসানা আম্মা বাইরে বেরিয়ে এসে পিছনের আগলটা টেনে দিলো। ক্রালের দেওয়ালে লাগানো দুটো খাম্বার মাঝখানের জায়গাটাতে গিয়ে তারা ঢুকলো। এই রকমটিই হওয়া উচিত ছিল, ইসার মেরুদণ্ডের জন্যই প্রয়োজন ছিল ওখানকার সান্ত্বনাদায়ক শীতলতা।

'আম্মা, ফুসেনি ভালো আছে তো?'

'হ্যা।'

'আম্মা, হাওয়া ভালো আছে তো?'

‘হ্যাঁ।’

‘আম্মা, আমাকে সত্যি করে বলো, ফুসেনি কি খুব ভালো আছে?’

‘ওরে, বাছা। এত চিন্তা কিসের? ফুসেনি সদ্যোজাত শিশুমাত্র, দশদিন হয়নি তার জন্ম হয়েছে। কি করে তোমায় বলি যে খুব ভালো আছে? একজন প্রাপ্তবয়সের লোক যখন অন্য গ্রামে বাস কবতে যায় ...’

‘আম্মা?’

‘আবার কি হলো?’

‘না, না কিছু নয়।’

‘বাছা, আজ সন্ধ্যায় তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ... হ্যাঁ, যদি তুমি, একজন প্রাপ্তবয়সের লোক, অন্য এক গ্রামে বসবাস করতে যাও, গোড়ার ক'টা দিন বাদেই কি তুমি বলবে যে তুমি সম্পূর্ণ ভালো আছো?’

‘না।’

‘তোমাকে কি তাদের খাবারে অভ্যস্ত হতে হবে না? তোমাকে কি প্রথমে তোমার নিজের আর তোমার ভেড়ার পালের জন্য জল কোথায় পাবে তা খুঁজে বার করতে হবে না?’

‘হ্যাঁ, আম্মা।’

‘তাহলে এটা কি করে হয় যে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছো ফুসেনি খুব ভালো আছে কি না? নাড়ি খুবই তাড়াতাড়ি শুকিয়ে আসছে ... আর আসবে নাই বা কেন? যত নাড়ি কেটেছি তার মধ্যে একটাও বিষিয়ে যায়নি। এখন কি নিজের নাতিব নাড়ি কেটে বসে বসে দেখবো সেটা বিষিয়ে যাচ্ছে? কিন্তু ওর পুরুষাঙ্গ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারছি না। মাল্লাম তো সেটা বেশ পরিষ্কারভাবে আর ঠিক মতোই করেছে, সেটার তো ঠিকই থাকার কথা। তোমাদের বংশে পুরুষাঙ্গ পচনের বদনাম আছে কি?’

‘না, আম্মা।’

‘তাহলে মনটাকে ঠাণ্ডা করো। ফুসেনি ভালো আছে তবে আমরা এখনও বলতে পারছি না কতটা ভালো আছে।’

‘তোমার কথা শুনলাম, আম্মা। আম্মা?’

‘হ্যাঁ বাছা।’

‘আম্মা, আমি দক্ষিণে যাচ্ছি।’

‘কোথায় বললে?’

‘দক্ষিণে।’

‘কতদূরে?’

‘সমুদ্রের ধার পর্যন্ত। আম্মা, আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝতে পারবে।’

‘এখনও পর্যন্ত আমি কি কিছু বলেছি?’

‘না, তা বলোনি।’

'তাহলে, ও কথা বলা তোমার ঠিক হয়নি।
'সেখানে তুমি কি করতে যাচ্ছে?'
'যে কোনো একটা কাজের খোঁজে।'
'কি কাজ?'
'জানি না।'
'হ্যাঁ, তুমি তা জানো, সেখানে তুমি ঘাস কাটতে যাচ্ছো।'
'হয়তো তাই।'
'কিন্তু বাছা, শুধু ঘাস কাটতে তুমি অতদূরে যাবে কেন? এখানে চারপাশে কি যথেষ্ট ঘাস নেই? এই ক্রালের চারধারে তোমার বাবার আর গ্রামের অন্যান্যদের? সে সব কাটো না কেন?'
'আম্মা, তুমি জানো সেটা ঠিক জিনিস নয়। সেটা যদি আমি এখানে করি লোকে আমাকে পাগল বলবে। কিন্তু ওখানে শুনেছি তারা যে সেটা শুধু পছন্দ করে তাই নয় সরকারও সে কাজ করার জন্য তোমাকে পয়সা দেয়।'
'তাহলেও আমাদের পুরুষ মানুষরা ঘাস কাটতে ওখানে যায়না। এ কাজ হলো আরও উত্তরাঞ্চলে যারা থাকে তাদের জন্য। তারা, যারা থাকে জঙ্গলে, তারাই যায় ঘাস কাটতে। আমাদের পুরুষ মানুষদের জন্য ও কাজ নয়।'
'দোহাই, আম্মা, সময় চলে যাচ্ছে, হাওয়া এখন নতুন মা হয়েছে আর ফুসেনি আমার প্রথম সন্তান।'
'আর তা সত্ত্বেও দক্ষিণে গিয়ে ঘাষ কাটার জন্য তুমি তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছো।'
'কিন্তু আম্মা, আমার এখানে থেকে তাদের উপোস করতে দেখে কি লাভ হবে? তুমি নিজেই জানো সমস্ত কোলা বাদাম নষ্ট হয়ে গেছে, আর যদি তা নাও হতো, ব্যবসাপত্রের যা অবস্থা, সেগুলো থেকে কত পয়সাই বা আমি করতে পারতাম? আর সেই জন্যই আমি চলে যাচ্ছি। ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে; আর কবে যে সব ঠিক হবে সেটা যেহেতু আমরা জানিনা সেহেতু আমার মনে হয় আমার পক্ষে চলে যাওয়াই মঙ্গল।'
'হাওয়া কি জানে?'
'না ও জানে না।'
'এতরাতে তুমি কি তাকে ডেকে তুলে এইকথা বলতে এসেছো?'
'না।'
'তুমি বুদ্ধিমান।'
'আম্মা, আমি সব কিছু আমাদুর হাতে দিয়ে গেছি। সে কাল এসে, হাওয়ার সঙ্গে দেখা করবে।'
'ভালো কথা।'
'তোমাকে কবে আবার আমরা আশা করতে পারি?'
'ইসা।'

'আম্মা।'

'তোমাকে আবার কবে আশা করতে পারি?'

'আম্মা, আমি জানিনা? হয় তো পরের রামাদানে।'

'ভালো।'

'তাহলে আমি যাচ্ছি।'

'আল্লা, তোমার সহায় হোন।'

'আর তাঁর পয়গম্বর যেন তোমাদের সকলকে দেখাশোনা করেন।'

আসানা আম্মা সোজা বিছানায় চলে গেলো, কিন্তু ঘুমোতে নয়। আর কি করেই বা সে ঘুমোতে পারে? ভোরবেলাতেও তার চোখদুটো পুরোই খোলা ছিল।

'ওর বংশে কি পুরুষাঙ্গ পচে যাওয়ার কুখ্যাতি আছে? না, একেবারেই না। না, আমাদের বংশই বরং মেয়েদের মন্দভাগ্যের জন্য কুখ্যাত। তাদের নিশ্চয়ই কোথাও গলদ আছে ....। তা না হলে আমরা কেন আমাদের পুরুষদের ধরে রাখতে পারি না? আল্লা, কেন এমন হয়?'

'বিশ বছর আগে। বিশ বছর, হয়তো বা বিশ বছরেরও বেশি, আল্লা, হাওয়াকে এ কথা বলার শক্তি আমাকে দাও।

'এখনই আমি বাজারে চলে যাই তারপর যখন ফিরে আসবো তখন না হয় তাকে বলবো? না, হাওয়া, হাওয়া, দেখ একবার কেমন করে তুমি একটা গাছের গুঁড়ির মতো লম্বা হয়ে পড়ে আছো। এক মা কি এমন করে ঘুমোয়? হাওয়া, হ-আ-আ-ও-আ! ও হো, আমি তোমাকে একা ফেলে যাবো না...আর তুমি মড়ার মতো ঘুমোলে রাতে কি করে তোমার বাচ্চার কান্না শুনতে পাবে?

'শোনো সে আমাকে প্রশ্ন করছে। হ্যাঁ এখন ফটফটে আলো হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি সত্যিই মরে গেছো। ঠাণ্ডা লাগলে কম্বলটা জড়িয়ে নাও আর আমার কথাগুলো শোনো, তোমাকে কিছু বলার আছে।

'হাওয়া, ইসা দক্ষিণে চলে গেছে।

'অমন চকচকে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন? আমি তোমাকে বলছি ইসা দক্ষিণে চলে গেছে।

'তোমার কোলে যখন এক শিশু থাকে যার নাভি পর্যন্ত শুকায়নি তখন কি প্রশ্ন তুমি করতে পারো?

'গতকাল রাতে সে চলে গেছে।

'কেন সে এসে তোমাকে ডেকে তুললো না সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। তোমাকে কেন আমি ডেকে তুললাম? শোনো, ইসা বলেছে সে শুধুমাত্র এখানে উপস্থিত থেকে তোমার আর ফুসেনির উপোস করা দেখতে পারতো না।

'কাজের খোঁজে সে দক্ষিণে যাচ্ছে আর ... হাওয়া, তুমি উঠছো কেন কি করবে ভাবছো? ইসা তোমার অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে নেই। এখনও পাড়া প্রতিবেশীরা জেগে ওঠেনি তাই আমাকে যেন চিৎকার করতে না হয়... তুমি একটা বাচ্চার মতো

করছো কেন? তুমি এখন মা হয়েছো, এবার তোমায় বড় হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নিতে হবে.... কোথায় যাবে বলে উঠে দাঁড়াচ্ছো? যা বলছি শোনো। ইসা চলে গেছে। সে কাল রাতেই চলে গেলো কারণ সরকারী বাস ধরতে চাইছিল সে, সেটা টামেল (Tamale) ছাড়ে খুব সকালে। তাই ....

'হাওয়া, আহ্-আহ্, তুমি কি কাঁদছো? কেন কাঁদছো তুমি? তোমার স্বামী কাজ করতে যাবে বলে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে, সেই জন্য? কাঁদো, কারণ সে তো তোমাকে নয় আমাকে দেখাশোনা করার জন্য টাকা আনবে ...

'তুমি বলছো, আমি বুঝতে পারছি না? হয় তো পারছি না...। দেখ এবার ফুসেনিকে তুমি উঠিয়ে দিয়েছো। বসে পড়ো আর ফুসেনিকে খাওয়াও আর আমার কথা শোনো।

'আমার কথা শোনো, তোমায় আমি আর একজন মানুষের কথা বলবো, যে তার নবজাত শিশুকে ফেলে চলে গিয়েছিল।

'সে কি ফিরে এসেছিল? না, সে ফিরে আসেনি। কিন্তু আমাকে আর প্রশ্ন কোরো না কারণ তোমাকে সব কথা আমি বলবো।

'সে যেতো আর আসতো, তারপর একদিন সে চলে গেলো আর ফিরে এলো না। বাকি সকলের মতো তাকে যে যেতেই হতো তা নয় ....

'ওরা ছিল সব সৈনিক। এক সৈনিকের কথা বলছি আমি। সৈনিক হবার জন্য তার যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কারণ এই অঞ্চলের সব থেকে ধনী লোক ছিল তার বাবা। বাড়ির বড় ছেলে সে ছিল না সেটাও ঠিক, কিন্তু তবু তার নিজের আর বিয়ে করলে পর তার স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য অনেক কিছুই সে করতে পারতো। কিন্তু কারো কথা শুনলো না সে। কি করে সে বসে থাকবে আর দেখবে অন্য ছেলেরা বাবুয়ানায় তাকে টেক্কা দিচ্ছে?

তাদের পোশাকপরিচ্ছদ ইস্ত্রি করে করে একেবারে চকচকে করে রাখতো....তাদের যে কোনোটার দিকে তাকিয়ে তুমি চোখে সুর্মা লাগাতে পারতে। আর তাদের জুতোগুলো, কি রকম মশ্‌মশ আওয়াজ করতো। সৈনিকদের তুমি নিজেই তো জানো। দক্ষিণ থেকে তারা যখন এলো তখন কি রকম সাড়া পড়ে গিয়েছিল। মায়েরা তাদের মেয়েদের কাছে বহুক্ষণ ধরে আর বেশ কড়াভাবে প্রথাগত বিয়ের চমৎকারিত্বের কথা বলেছিল, অন্যদিকে বাপেরা তাড়াতাড়ি করে বিয়ের ব্যাপারে পাকা কথা দিচ্ছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশই মেমুনাতের ব্যাপারের মতো ঘটনা ঘটার আশঙ্কা করছিল। মেমুনাতের বাপ গরু-বাছুর আর আরো সব জিনিষপত্র নেবার পর মেমুনাত গিয়ে এক সৈনিকের সঙ্গে রংতামাসা করতে লেগেছিল। কি কেলেঙ্কারিই না সে করেছিল।

এই মেমুনাত কে? না, তোমার বন্ধুর মা নয়। না, এই মেমুনাত শেষ পর্যন্ত নিজেই দক্ষিণে পালিয়ে যায়। শুনেছি সে সহরে গিয়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আর অনেক পয়সা করেছিল।

'না, এখন আর তার কথা আমাদের কানে আসে না। সে মরেও যায়নি, এইসব মেয়েছেলেরা মরার সময় শুনি সাধারণত নিজেদের ডেরায় ফিরে যায়, সে এখনও পর্যন্ত এখানে ফিরে আসেনি।

'কিন্তু আমরা, আমাদের কথা আলাদা ; আমি বাকদত্তা হইনি।

'তুমি প্রশ্ন করছো কি কেন আমি "আমরা" বলছি? তার কারণ হলো এই যে ঐ লোকটি ছিল তোমার বাবা। আহ-আহ এখন তোমার মুখ হাঁ হয়ে যাচ্ছে, চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, বাছা আমি তোমার বাবার কথাই বলছি।

'না, আমি যখন তোমায় বলেছি যে সে মরে গেছে তখন মিথ্যা বলিনি। কিন্তু চুপ করো আর শোনো। সে দক্ষিণে যাচ্ছিল বিবাহিত সৈনিকদের জন্য বরাদ্দ বাড়ির একটা নিজের জন্য আদায় করতে।

'না সেইবার সে ফিরে আসে নি তা নয়। এখানে সে ফিরে এসেছিল, কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে নয়।

'আমাদের সে জিজ্ঞাসা করেছিল যুদ্ধের কথা আমরা কিছু শুনেছি কি না।

"যুদ্ধের কথা আবার শুনিনি আমরা? টিনের মাছ, কেরোসিন আর কাপড় কি দুস্প্রাপ্য হয়ে ওঠেনি?

'হ্যাঁ, আমরা বলেছিলাম, কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম সেটা বোধহয় শুধুমাত্র ব্যবসায়ীরা জিনিসগুলো আনছে না বলে।

'হ্যাঁ, ঠিকই, সে বলেছিল, কিন্তু ব্যবসায়ীরা দক্ষিণেও সেগুলো পাচ্ছে না।

'কিন্তু কেন, আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

'তোমরা সব কি, তোমরা কি জার্মান লোকেদের কথা শোনোনি? আমাদের নিয়ে সে তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণের ওরা ওদের নামে খিস্তির গান গাইছে, সে আমাদের বলেছিল।

'কিন্তু আমরা কবে যাচ্ছি, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

"আমাকে সে যা বলেছিল তা হলো এই, যে সেই কারণেই সে এসেছে। আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছে না সে। আমরা হলাম আংলিশ লোকেদের অধীনে, বুঝেছো তো, আর তারা জার্মান লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

'প্রশ্ন করো বাছা, আমিও ঠিক সেই প্রশ্নই করেছিলাম তাকে। আমার আর তোমার ব্যাপারের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? তোমার সঙ্গে কেন আমি দক্ষিণে যেতে পারবো না?

'কারণ আমাকে সমুদ্র পার হতে হবে আর যুদ্ধ করতে যেতে হবে।

'অন্য লোকেদের যুদ্ধে? বাছা আমার, আমি তাকে জিজ্ঞসা করেছিলাম এটা হলো যেন তুমি সেখানেই থাকো।

'সেটা কিন্তু ঠিক এত সহজ নয়, সে বলেছিল।

'আমরা তার কথা বুঝতে পারিনি। তার বাবা বলেছিল তুমি যাবে না। তুমি যাবে না, এমন তো নয় যে আমরা গ্রনসি কিংবা গঞ্জাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি।

'আমি আংলিশ—লোকেদের কথা জানি কিন্তু কোনো জার্মান—লোকেদের কথা জানি না, আর তাছাড়া তারা তো তাদের দেশে রয়েছে।

'অবশ্যই তার বাবা অভিনয় করছিল আর আমিও।

'একজন সৈনিককে সব সময় হুকুম মানতে হয় ; সে বলেছিল।

'আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য অনেক কিছু দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে বলেছিল সঙ্গে সে শুধুমাত্র কোলা নেবে।

'তারপর খবর এলো। খবরটা আমার মাথায় ঢুকলো না, মাথার মধ্যেটা আমার একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। সব কিছু চলে গিয়েছিল আমার গর্ভের ভেতর। তখন তুমি তিনদিনের।

'খবরটা ছিল আগুনের মতো, সেটা ঠাঁই নিয়েছিল আমার জঠরের মধ্যে। মাঝে মাঝে তার কিছুটা আমার ভেতরের সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে দিতে উঠতে থাকতো ওপরের দিকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা গিয়ে পৌঁছাতো আমার মাথার মধ্যে তখন আমি পাগল হয়ে যেতাম আর চিৎকার করতে থাকতাম।

তুমি যখন হলে তখন আমি নিজেকে বলেছিলাম তুমি যে মেয়ে তার জন্য কিছু এসে যায় না। আল্লার দেওয়া সবদানই তো ভালো আর সে তো ফিরে আসবে আর আমাদের অনেক সন্তান হবে, অনেক অনেক ছেলে হবে।

'কিন্তু হাওয়া, তোমার অনেক শক্তি ছিল, তা না হলে কি করে যে তুমি বেঁচে রইলে তা জানিনা। তিনদিনের মাত্র ছিলে তুমি, অকাল হারমাটানে (Harmattnan) ২ একটা শাখা নদী যেমন শুকিয়ে যায় আমার বুকের দুধও তেমন হঠাৎ শুকিয়ে গিয়েছিল। হাওয়া তুমি অনেক শক্তি ধরো।

'পরে, ওরা আমাকে বলেছিল আমি যদি দক্ষিণে যাই আর সরকারের লোকেদের কাছে প্রমাণপত্র দিতে পারি যে আমি তার স্ত্রী তাহলে অনেক টাকা পাবো।

'কিন্তু আমি যাইনি। আমি তাকেই চাইছিলাম তার দেহটাকে সোনায় পরিবর্তিত করে নয়।

'আমি দক্ষিণে কখনো যাইনি।

'তুমি কি "ওঃ" বললে ? বাছা আমার, তোমাকে তোমাকে আমি সব সময় বলছি যে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল বহুদিন আগে আর লোকে তার বুড়ো বয়সটাই দেখছে যুবা বয়স নয়। তাই "ওঃ" বোলো না।

'ঐ লোকগুলো, সরকারের লোকগুলো, যারা আসা যাওয়া করে, আমাদের বলে ব্যবসাপত্রের অবস্থা এখন মন্দ, আবার কোনো টিনের মাছ নেই, কাপড় নেই। কিন্তু তারা বলে এইবার এসব হওয়ার কারণ আমাদের ছেলে-মেয়েরা যাতে একদিন অপর্যাপ্ত পরিমাণে সেগুলো পায় তাই।

'ইসা দক্ষিণে গেছে কারণ সে তার স্ত্রীর গর্ভবতী অবস্থায় তাকে নিদেন পক্ষে ছাগলের মাংসও খেতে দিতে পারে না। এটা হতেই হবে, যাতে করে ফুসেনি তার স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে পারে আর স্ত্রীর সঙ্গে বসে উৎকৃষ্ট মাংস খেতে পারে। হুম। আর

সে জীবিত ফিরে আসবে .... হয়তো পরের রামাদানে নয় কিন্তু তার পরের রামাদানে। এখন মা আমার, তুমি আর একজন মানুষের কথা জানো যে অন্য লোকের যুদ্ধ লড়তে গিয়ে আর কখনো ফিরে আসেনি।

'আমি এখন হাটে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি ওঠো, ফুসেনিকে স্নান করাও। ঐ ওঁছা কোলাগুলোর জন্য অন্তত কিছু পয়সা পাবো বলে আশা করছি। দুজনের জন্য যথেষ্ট চাল রয়েছে, তাই না?

'ভালো, যে পয়সা আজ পাবো বলে আশা করছি তার যদি সবটাও লাগে তবু যতটা বড় পাই একটা শুঁটকি মাছ নিয়ে আসবো, তাই দিয়ে নিজেদের জন্য ভালো করে ঝোল বানাবো।

হভেস্কা—ডাক্তারের চৌকিদার

ভ্যালেনটিনা আইয়োভোভনা ডিমিট্রিয়েভা

[ভ্যালেনটিনা আইযোভোভনা ডিমিট্রিয়েভা (১৮৫৯-১৯৪৭) সারাটোভ গুবেবিযায জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন ভূমিদাসের কন্যা। গ্রামাব স্কুলে শিক্ষালাভ করে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য ১৮৮৬ সালে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে যান। গ্রামেব একটি স্কুলে শিক্ষকতাকালে জনশিক্ষা ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থার সমালোচনা কবে তিনি পত্রপত্রিকায় নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর ফলে তার চাকরি যায় এবং শিক্ষকতা করার ব্যাপারে তার ওপর চিরকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এর পর বহুকাল ধরে তিনি ভোরোনেজ গুবেরনিয়ায় চিকিৎসক হিসাবেই খুবই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করেন।

বহু ঐতিহাসিক ঘটনার তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী এবং অংশগ্রহণকারী। ছাত্রদের বৈপ্লবিক মিছিলগুলিতে যোগদান করার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মাক্সিম গোর্কি, লিওনিড অ্যানড্রাইয়েভ প্রভৃতি বহু মনীষীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। মস্কো থেকে তাঁকে তভর-এ নির্বাসিত করা হয। সেখানে পুলিস প্রহরায় তিনি চার বৎসর অতিবাহিত করেন। তৎসত্ত্বেও পরে তিনি তাঁর লেখার এবং বৈপ্লবিক কাজ চালিয়ে যান। বিপ্লব পূর্ব বহু উৎকৃষ্ট মানেব পত্রপত্রিকায ৪৫ বৎসর ধরে তার লেখা প্রকাশিত হয। তাঁর রচনাগুলিতে রুশ জনগণের আধ্যাত্মিক শক্তির উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস এবং স্বৈরতান্ত্রিক রুশদেশেব সমাজ ব্যবস্থা পতনের সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবকে তিনি মণপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। সোভিয়েত যুব সমাজ এবং সোভিয়েত সংস্কৃতির জন্য সক্রিয়ভাবে বহু কাজ করেছেন।]

এক অন্ধকার নভেম্বরের সব থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে খুবই ভযাবহ এক রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজে আমি স্টেবেনকি গ্রামে পৌছে ছিলাম। সেই সময় গ্রামটিতে একজন ডাক্তারের সহকারী ছিল, জেমস্তভো অফিস* আমাকে সতর্ক করে দিযেছিল ওখানে সব কিছুই দারুণ বেবন্দোবস্ত আর অযত্নের মধ্যে রয়েছে আর প্রয়োজনবোধে আমি যদি ডাক্তারের সহকারীকে বরখাস্ত করি তবে কর্তৃপক্ষ কোনো আপত্তি করবে না। সেই জন্য ভালো কিছু দেখবো এ প্রত্যাশা আমার ছিল না, আর স্টেবেনকিতে

সব কিছু যে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দেখতে পাবো এ সম্বন্ধে আমি ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম। ওখানে রাত্রে থাকার একটা জায়গা আর এক গ্লাস চা পাবো কি না তাও জানতাম না। ঠাণ্ডায় আমি একেবারে জমে যাচ্ছিলাম, খিদেও পেয়েছিল প্রচণ্ড, উঁচুনিচু রাস্তা দিয়ে আসার দরুন শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম আর আপাদমস্তক ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গিয়েছিল। সারাটা পথ আকাশ আমার ওপর অবিরল চোখের জল ফেলেছে, যেন আমার দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করেই।

ডাক্তারের সহকারী যেখানে থাকতো আর যেখানে ডিসপেনসারী আর সার্জারি (ডাক্তারের রোগী দেখার ঘর) ও ছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বেশ বড় একটা বাড়ি মাঝখানে যাতাযাতের একটা সরু পথ বা 'লবি' দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা, একটা গাড়ি বারান্দাও ছিল সেখানে 'জেমস্তভো সার্জারি' লেখা আবছা হয়ে আসা একটা বোর্ড ঝুলছিল। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য জায়গাটা জনশূন্য, আমাকে অভ্যর্থনা করতে বারান্দায় কেউ বেরিয়েও এলো না, কিন্তু দরজাটা সম্পূর্ণভাবে খোলা ছিল বলে, বিনা বাধায় আমি লবির মধ্যে ঢুকে গেলাম, সেখানে নাক-খ্যাঁদা একটা শুয়োর খাবারের একটা পাত্রের মধ্যে ক্ষুব্ধভাবে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছিল। ডাইনে আর বাঁয়ে কয়েকটা দরজা, কিন্তু তার কোনটা দিয়ে যে ঢুকবো তা বুঝতে না পেরে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা রূপকথার বীরের মতো আমি লবির মাঝখানে দাঁড়িযে উঁচু গলায় ডাক দিলাম ঃ

'কে আছো ?'

আমার ডাক শুনে বাঁ দিকের দরজা সশব্দে খুলে গেলো আর লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো নগ্নপদ, তের চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে, পরনে তার মস্ত মস্ত লম্বা হাতাওয়ালা ছেঁড়া একটা কোট, মাথায় ময়লা কাপড়ের একটা টুকরো বাঁধা আর কোলে একটি ছোট্ট শিশু।

"আমি হলাম নতুন ডাক্তার", আমি জানালাম। "সহকারী কই ? আর চৌকিদার ? তুমি কাউকে একটু এখানে ডাকো তো।"

মেয়েটি তাব কর্ণ ফ্লাওয়ারের মতো নীল চোখদুটো দিয়ে আমার দিকে এক ঝলক তাকালো তারপর দরজার ভিতর দিয়ে ধেয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করলো ঃ

"হুজুর, এখানে একবার আসুন, হুজুর, ডাক্তার এসে গেছেন।"

তার পিছনে দরজাটা সজোরে বন্ধ হয়ে গেলো, ভিতর থেকে শঙ্কিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল, আমি আবার একলা হয়ে পড়লাম নাক-খ্যাঁদা ঐ শুয়োরটার সঙ্গে, সে স্পষ্টতই আমার উপস্থিতিতে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিল আর আমার প্রতি তার বিরূপ মনোভাব দেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল।

মেয়েটি অচিরেই ফিরে এলো, নোংরা মেঝের ওপর দিয়ে তার শতছিন্ন কোটের তলাটা লুটোতে লুটোতে আর ডানদিকের দরজার দিকে আমায় নিয়ে চললো।

"এই দিকে আসুন, হুজুর। হুজুর এই এলেন বলে।"

"তাহলে এটাই হলো সার্জারি, তাই না ?" একটা কাঠের পার্টিশান দিয়ে দু'ভাগ করা বড় একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, হুজুর। আর বাড়ির অন্য দিকটায় হুজুর থাকেন।" কুচকাওয়াজ বন্দুক কাঁধে দাঁড়ানো এক সৈনিকের মতো, শিশু কোলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটি হাসিমুখে ব্যাখ্যা করলো।

আমি চারপাশে তাকালাম। প্রথম অংশটা বোধহয় রোগীদের ওয়েটিং রুম, কারণ দেওয়াল ঘেঁষে সব বেঞ্চি পাতা, কোনায় একটা টুলের ওপর রাখা এক বালতি জল আর মরচেধরা একটা পেরেক থেকে একটা মগ ঝুলছে। অপর অংশটা, যেটা ডিসপেনসারি আর সার্জারি হিসাবে ব্যবহৃত হতো, সেটায় একটা কাউন্টারের পিছনে ছিল তাকের ওপর নানা শিশি বোতল ভর্তি একটা বড় আলমারি আর দরজার কাছে ছিল বহু ব্যবহৃত রোগীদের নাম লিপিবদ্ধ করার একটা খাতা সমেত পলকা একটা টেবিল, নড়বড়ে পায়াওয়ালা দুটো চেয়ার আর জীর্ণ একটা কৌচ। চারদিকে একেবারে দারুণ বিশৃঙ্খলা : মেঝেটা ধুলোর স্তরে ঢাকা ; দেওয়ালগুলো, বহু বছর যেগুলোয় কালি পড়েনি, হলদে হলদে ছোপ পড়া ; একটা জানলা ভাঙা। আর সেই ফুটোর মধ্যে এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া গোঁজা, কাউন্টারের ওপর রাখা আছে, শিশি বোতল, পুরনো সবুজ হয়ে যাওয়া একটা নিক্তি, আধোওয়া, ফাকুন্দার গন্ধওয়ালা একটা হামানদিস্তা আরও কত কি আবর্জনা। আমি যখন এইসব দেখেছি, মেয়েটি তখন আমার দিকে একভাবে তাকিয়েছিল, মাঝে মাঝে শুধু চোখ নামিয়ে দুটো আঙুল দিয়ে বাচ্চাটার নাক মুছিয়ে দিচ্ছিল।

"ভালো ভালো, এতো দেখছি চমৎকার অবস্থা," আমি বললাম। "এখানটা কার দেখাশোনা করার কথা? চৌকিদার কই?"

"আমিই তো সে," মেয়েটি উত্তর দিলো।

আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"তুমি? বেশ বেশ, তা চৌকিদার। কাজটা তুমি এতো খারাপ করে করছো কেন বলতো?"

আতঙ্কে মেয়েটির চোখ পিটপিট করতে লাগলো।

"আমাকে হুজুর যা বলে আমি তাই করি, হুজুর। সে নিজেই আপনাকে বলবে।"

"ঠিক আছে, বাছা, কিন্তু সেটা পরে হবে। এখন গাড়োয়ানকে বলো আমার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসতে।"

পরক্ষণেই আমার ভিজে জবজবে তল্পিতল্পাগুলো সার্জারিতে বয়ে নিয়ে আসা হলো। মেয়েটি ব্যস্তভাবে গাড়োয়ানকে সাহায্য করলো শিশুটিকে নামিয়ে না রেখেই, আগু পিছু ছুটোছুটি করতে লাগলো আর অভাগা শিশুটিকে কখনো অসম্ভবরকম ভঙ্গিতে হেলিয়ে ধরে কখনো বা আবার একেবারে প্রায় উলটো করে ধরে। আমি গাড়োয়ানকে ছেড়ে দিলাম আর কোটটা খুলে ফেললাম, কিন্তু তবুও সহকারীর দেখা নেই। তার দেখা পাবার আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছি তখন হঠাৎ দরজাটা মৃদু শব্দ করলো আর আমার সামনে এসে দাঁড়ালো বছর তিরিশের একটি লোক, বেঁটে খাটো

আর একটু মোটাসোটাই, ধূসর রঙের ছোট ছোট চোখগুলো তার নগ্ন বিদ্বেষ আর আশঙ্কায় জ্বল জ্বল করছিল। স্পষ্টতই সে তার সব থেকে ভালো পোশাকটা পরেছিল ; পরনে তার সবগুলো বোতাম আঁটা একটা ফ্রক কোট আর চুলগুলো তাব তেল চুপচুপে।

"অনুমতি করুন আমার নিজের পরিচয় দিতে। ডাক্তারের সহকারী কুদাকিন।" সে জানিয়ে দিল।

"আলাপ করে খুশি হলাম। বসুন।"

"না, ধন্যবাদ, হুজুর। আমি দাঁড়িয়েই থাকছি!" সহকারীটি তাড়াতাড়ি বললো, চোখে তার আশঙ্কা আর বিরাগের ভাব আরো বেশি প্রকট। স্পষ্টতই এই সূচনা তার কাছে বিশেষ করে অশুভ বলে মনে হচ্ছিল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সার্জারিতে একটা আলো আব একটা সামোভার (নলওয়ালা চা বানাবাব রুশ দেশীয় পাত্র বিশেষ) আনানো যেতে পারে কিনা, আর এই দুই অনুবোধে তার বদান্য সম্মতি পেযে মেযে চৌকিদারটিকে পাঠালাম জ্বালানি কাঠ আব সামোভার আনতে। এখন শুধুমাত্র আমরা দুজনই বইলাম।

"আচ্ছা, আমাকে বলুন তো, এ জাযগাটা কি সব সময এতো নোংরা আর অগোছালো থাকে?" আমি জিজ্ঞাসা কবলাম।

মিঃ কুদাকিন উদ্বিগ্নভাবে চাবিদিকে তাকালো, তাব গোঁফটা নাচতে লাগলো।

"বাড়িটা খুবই পুরনো, হুজুর।"

"তা না হয হলো, কিন্তু ধুলোর ব্যাপারটা? আপনি কি ঐ মেযেটাকে চৌকিদাব বেখেছেন?"

"হুঁ ... হ্যাঁ, হুজুব", সহকারীটি আমতা আমতা করে বললো, "একজন উপযুক্ত লোক পাওয়া খুবই কঠিন। এখানের লোকগুলো খুবই অলস, ডাক্তার হুজুর। এরা কাজ করতে ভালোবাসে না।"

"হয় তো মাইনে যথেষ্ট নয়? আপনি ওকে কত দেন?" কুদাকিন লাল হয়ে গেলো, তার চোখদুটো ইঁদুরের মতো এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগলো।

"তা ... আড়াই রুবল," যেন নিজের কথাই সে অবিশ্বাস করছে এমনিভাবে বিড়বিড় করে বললো।

"ওটা যথেষ্ট নয়। আরো বেশি হওয়া উচিত।"

এবার শিশুটিকে কোলে না নিযেই মেয়েটি সামোভারটা টেনে নিয়ে এলো আর সহকারী আমার পর্যাপ্ত বিশ্রাম কামনা করে বিদায নিলো। আমি যতক্ষণে আমার স্যুটকেশগুলো থেকে জিনিসপত্র বার করেছিলাম আর চা বানাচ্ছিলাম, ততক্ষণে আবার নগ্নপদ চৌকিদার চট করে মাথা খাটিয়ে যেন ভোজবাজি করলো। চক্ষের নিমেষে সে টেবিলেব ওপর থেকে রেজিষ্টার বই আর কালির দোয়াতটা নামিয়ে ফেলে, সহকারীর চাদর আর থালাবাটিগুলোর সঙ্গে রাখলো, স্টোভ ধরালো, ঘর ঝাঁট দিলো, আমাকে লণ্ঠনে তেল ভরতে আর জ্বালাতে সাহায্য করলো। তারপর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্বক্ষণই আমার ওপর নিবদ্ধ ছিল।

"আপনার কি ডিম লাগবে, হুজুর ?" সে জিজ্ঞাসা করেছিল।

"ডিম তুমি কোথায় পাবে ?"

"বাড়িওয়ালার কাছে। এবার আমি যাই। আপনার বোধহয় খানিকটা দুধও লাগবে ?"

"হ্যাঁ দুধও খানিকটা নিয়ে এসো।"

মেয়েটি ছুটে চলে গেলো আর ফিরে এলো ডজন খানেক ডিম আর একবাটি দুধ নিয়ে। খবরটা আগের তুলনায় অনেকটা আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল ঃ স্টোভের মধ্যে কাঠগুলো প্রফুল্লভাবে ফট্‌ফট্‌ শব্দ করছিল ; সামোভারটা সর্বশক্তি দিয়ে উল্লাসভরে টগবগিয়ে ফুটছিল। আমার শরীরটা বেশ গরম হয়ে গেলো। আর মনেও স্ফূর্তি জেগে উঠলো।

"তাহলে চৌকিদার," আমি মেয়েটির দিকে ফিরলাম। "তোমার নাম কি ?"

"হভেস্কা।"

"সেটা হলো কি থেকে — কেভোসিয়া থেকে ? বেশ, বেশ, ধন্যবাদ, বন্ধু ফেডোসিয়া। তুমি আমাকে উত্তাপ দিয়েছো, খাবার দিয়েছো, পানীয় দিয়েছো। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

"ওসব কিছুই নয়," মেয়েটি গম্ভীরভাবে বললো।

"কিছুই নয় মানে ? তোমাকে ছাড়া আমি তো একেবারে ডুবে যেতাম। এখন আমায় বলতো তুমি কি করে চৌকিদার হলে ?"

"ওঃ, সেটা। বাড়িতে আমরা পাঁচ ভাইবোন, বুঝেছেন, সকলেই ছোট ছোট। আমিই সব থেকে বড়ো। আর আমাদের মার শরীর ভালো নয় আর বাবা মদের ভক্ত। তাই বাবা একদিন বললে, "মেয়েটা যাক, সার্জারিতে গিয়ে চৌকিদারের কাজ করুক। বাড়িতে আলসেমি করার বদলে মাসে মাসে পঞ্চাশ কোপেক করে পাবে আর খাবার পাবে।"

"পঞ্চাশ কোপেক ? সহকারী যে বললো মাইনে হলো আড়াই রুবল।"

হভেস্কার চোখগুলো রাগে জ্বলে উঠলো।

'ও মিথ্যে কথা বলেছে।" সে বলে উঠলো। "আড়াই রুবল না ছাই। কখনোই অত মাইনে ছিল না। মাসে পঞ্চাশ কোপেক আর আমার খাওয়া।"

"তা, তোমার পাওনা হয়তো ওর বেশি হওয়া উচিত নয়, কারণ তোমার কাজ তো তুমি ঠিক মতো করো না। ঐ নোংরা মেঝেগুলোর দিকে তাকিয়ে একবার দেখতো !"

"কিন্তু ওরা তো আমাকে ওগুলো সাফ করতে বলেনি। প্রতিদিন তো আমি হুজুরের বাড়ির মোছার কাজ করি, আর এখানটা মুছি ক্বচিৎ কখনো, কারণ হুজুর বলেন এখানটা তো আবার নোংরা হয়ে যাবে ···।"

"তাহলে তুমি কি করো ?"

"আমি কি করি ? বলছি আপনাকে। হুজুরের বাড়ির ঘর মুছি, কাপড় কাচি,

জল তুলি, চা বানাই, গাইয়ের দুধ দুই আর ওনারা আমাকে যা করতে বলেন তাই করি …।"

তার সব কাজের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে সে হাঁফিয়ে গেলো।

"তুমি কার বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘুরছিলে?"

"ওটাও তো হুজুরের।"

"তা হলে তুমি ওর ছেলে-মেয়েদেরও দেখাশোনা করো, তাই না?"

"হ্যাঁ, বটেই তো। সেই চুক্তিই তো হয়েছিল। আমি বাচ্চাটার দেখাশোনা করবো। ওনারা আমাকে যা করতে বলেন আমি তাই করি।"

"আব রোগীদেরও দেখাশোনা করো, তাই না?" আমি পরিহাস করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম ওটা মোটেই পবিহাস নয়।

"হ্যাঁ নিশ্চয়। মাঝে মাঝে আমি রোগীদেরও দেখাশোনা করি," হভেস্কা গম্ভীরভাবে উওব দিয়েছিল। "দুপুরের খাবারের পর হুজুর যখন আরাম করেন তখন যদি কেউ আসে। আমি জানি কার কি দরকার, আমি তাকে তাই দিই। বেশি দিনের কথা নয় আন্টি লুপানডিয়ার কুইনিন দরকার ছিল, আমি তাকে তাই দিয়েছিলাম। আর গতকাল ভানকা পাখোমভ দাঁতের ব্যথায় চিৎকার কবছিল বলে, তাকে ওষুধ দিয়েছিলাম।"

"বা, বেশ, বেশ, ফেডোসিয়া!" হাসতে হাসতে আমি বললাম। "তুমি তো দেখছি সব কাজের কাজী আর এসব মাত্র পঞ্চাশ কোপেকের জন্য।"

"পঞ্চাশ কোপেক আর আমার খাওয়া, সত্যি! আড়াই রুবল আমি জন্মে কখনো চোখে দেখিনি। ভগবানের দিব্যি না হলে যেন আমার মরণ হয়।"

ঠিক করলাম চা খাবার পর আমি সোজা বিছানায় চলে যাবো আর পরের দিন ভোর সকালে উঠবো কারণ বুঝেছিলাম অনেকগুলো কাজ করতে হবে। আর সেগুলো খুবই অপ্রীতিকর। সহকারীর মুখ আর দেখা গেলো না। বাড়ির তার দিকের অংশটায় একেবারে মৃত্যুর নীরবতা বিরাজ করছিল, যুদ্ধের আগে শত্রুপক্ষের শিবিরে যেমন দেখা যায়। হভেস্কাই আমার বিছানা পাতলো। সেই রকম বিড়ালের মতো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কিছুটা খড় এনে সে স্টোভের কাছে বিছিয়ে দিলো — কৌচে শোব না ঠিকই করেছিলাম আমি। তারপর সব কিছু সে পরিষ্কার করলো, এমনকি জানলার ওপর তোয়ালেগুলো ঝোলানো পর্যন্ত, তারপর আর কিছু যখন করবার থাকলো না তখন চলে গেলো।

পরের দিন ভোর না হতেই, সতর্ক নগ্ন পায়ের আর তার পরেই কড়া বুরুশ দিয়ে ঘষা আর জল ঢালার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেলো।

"কে ওখানে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমি হুজুর। আপনি ঘুমোন", উৎফুল্লভাবে বলে উঠলো একটা উঁচু গলার স্বর। "আমি ঘর ধুচ্ছি।"

আবার ঘুম দেবার পরিবর্তে, আমি জামাকাপড় পরে নিয়ে লণ্ঠন জ্বালালাম।

ওয়েটিং রুমের মেঝেটা ইতিমধ্যেই ধোওয়া-মোছা হয়ে গিয়েছিল, আর স্টোভের মধ্যে জ্বালানি কাঠগুলো জ্বলছিল।

"এসব করার সময় পেলে কখন ?" আমি হ্ভেস্কাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"এটাকে কি আপনি বেশি ভোর বলেন ? এর মধ্যেই তো আমার দুধ দোওয়া হয়ে গেছে। সামোভারটা কি নিয়ে আসবো ?"

"ওটা কি তৈরি আছে ?"

"হ্যাঁ, কখন তৈরি হয়ে গেছে। আপনি বলেছিলেন তাড়াতাড়ি উঠবেন, তাই ওটা চড়িয়ে দিয়েছিলাম।"

"বেশ, তাহলে ওটাই নিয়েই এসো," আমি উৎফুল্লভাবে বললাম। বাচ্চা এই মেয়েটার প্রতি আমার আরো বেশি মায়া পড়ে যাচ্ছিল।

আমার চা খাবার সময় সহকারী এসে উপস্থিত হলো, ঠাণ্ডাভাবে আমাকে অভিবাদন করে আলমারী হাঁটকাতে লাগলো। ইতিমধ্যেই সে তার অবস্থার অনিশ্চয়তার কথা উপলব্ধি করতে পারছিল, কিন্তু আমাকে সে দেখাতে চেষ্টা করছিল সে কত কর্মিষ্ঠ, আর তার কাজ সে কত ভালোবাসে। তার কাছে আমি হিসাবের খাতা দেখতে চাইলাম, আর প্রথম পাতাতেই দেখলাম লেখা আছে ঃ চৌকিদারকে — পাঁচ রুবল।

"মিঃ কুদাকিন।" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। "কাল আপনি আমাকে কেন বললেন যে ফেডোসিয়াকে আপনি আড়াই রুবল করে দেন, যখন এখানে লেখা রয়েছে পাঁচ রুবলের কথা ?"

"ঠিকই লেখা আছে, পাঁচ রুবলই," কুদাকিন বিমর্ষভাবে উত্তর দিলো। 'কিন্তু কিছু কিছু কাজ, যেমন ঘর ধোওয়া শিশি-বোতল ধোওয়ার ভার আমার স্ত্রী নেওয়ায়, আমি এটা দু'ভাগে ভাগ করেছি।'

'কি অদ্ভুত রকমের ভাগাভাগি। কিন্তু আরো একটা ব্যাপার আছে। ফেডোসিয়া আমাকে বলেছে আপনি ওকে মাত্র পঞ্চাশ কোপেক দেন, আর আপনার গাই দোওয়ানো আর আপনার বাচ্চার দেখাশোনা করার কাজ করান। সেটা কি ধরনের ভাগাভাগি ?'

সহকারীটি আমাকে রীতিমতো খেঁকিয়ে উঠলো।

'আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন। আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস করার থেকে ঐ মেয়েটার কথা বিশ্বাস করেন, তবে সেটা আপনার মর্জি। আর বাচ্চার কথা বলছেন, একটুক্ষণের জন্য। আর বাচ্চাটাকে ধরা কি একটা অপরাধ ? এমন কথা আমি জন্মেও শুনিনি, সত্যি ...।'

বিড়বিড় করতে করতে সে কাউন্টারের পিছনে চলে গেলো আর একটু পরেই কাঁচভাঙার শব্দ আমাকে বুঝিয়ে দিল যে সে সত্যই বেসামাল হয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে সূর্য উঠে গেছে, আর রোগীরা ওয়েটিং রুমে জড়ো হতে শুরু করেছে। প্রথমটি এক মহিলা, প্রেসকৃপশনটা পেয়েই হঠাৎ তার জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে নীরবে একটা পাঁচকোপেক বার করে আমার সামনে রাখলো।

'ওটা কি জন্য?' আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ওষুধের জন্য যে কোনো দাম নেওয়া হয় না সেটা জানতাম বলে।

কেন, বোতলের জন্য?' মহিলাটিও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

'আপনি কি ওষুধের জন্য পয়সা নেন?' আমি সহকারীকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'বোতলের জন্য পয়সা নিই,' সে বিমর্ষভাবে উত্তর দিল, হামানদিস্তার মধ্যে প্রচণ্ডভাবে কি একটা গুঁড়ো করতে করতে।

'আপনাকে কে বলেছে ওটা করতে?'

সহকারী কোনো উত্তর দিলো না, শুধু আরো জোরে জোরে গুঁড়ো করতে লাগলো।

পরের রোগীটি আমাকে আরো অবাক করে দিলো। মহিলাটি তাঁর কি হয়েছে এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সোজা আমার কাছে এসে আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললো।

"আমাকে দশ কোপেকের মতো পট-আইডিন দিন।"

"পট-আইডিন আবার কি? তোমার কি হয়েছে?"

"আমার কিছু হয়নি, আমার স্বামীই অসুস্থ। তার সর্বাঙ্গে বেদনা, সকলে বলছে তার জন্য পট-আইডিনই ঠিক ওষুধ।"

সে একটা দশ কোপেক আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। আমি সহকারীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম, কিন্তু যেন সে দেখতেই পায়নি এমন ভান করে কান ফাটানো শব্দে পিষে চললো। হভেস্কাই আমাকে উদ্ধার করলো। চৌকিদার হিসাবে সে হাতের কাছেই ছিল, এক এক করে রোগীদের ঢোকাচ্ছিল।

"ঐ যে ওখানে যেটা রয়েছে ওটাই ও চাইছে। একটু সবুর করুন, আমি এনে দিচ্ছি।"

আলমারীর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে সে চট করে পটেশিয়াম আয়োডাইডের বোতলটা খুঁজে বার করে এনে আমার সামনে রাখলো।

এবার আমি সব বুঝতে পারলাম; কুদাকিন শুধু যে "বোতলগুলোর" জন্য পয়সা নেয় তাই নয়, জেমস্তভো ওষুধ নিয়েও ব্যবসা করে, তার নিজের স্বার্থে অবশ্যই এই দুটো জিনিস আবিষ্কার করার পর আমি কিছু জিজ্ঞাসা করাটা এড়িয়ে চললাম, সেও তার দিক থেকে ভাব করল আমি যেন ওখানে নেই।

"সৌভাগ্যক্রমে হভেস্কা আবার আমার সহায় হলো। দেখা গেলো ওষুধপত্র সম্বন্ধে কুদাকিনের থেকে সে অনেক বেশি জানে। যখন কুদাকিন থমকে যাচ্ছিল আর যে ওষুধ সে চায় সেটা খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন হভেস্কা তার কোনার থেকে লাফিয়ে উঠে বলছিল ঃ ওখানে ওটা নেই, হুজুর। ওটা ঐ 'কড়া ওষুধগুলোর' "সঙ্গে রাখা আছে।"

কিংবা ঃ

"কিছুটা খাবার লবণ দিন, হুজুর। তাহলে তাড়াতাড়ি গলে যাবে।" এই রকম কত কি।

সহকারী তার দিকে রোষ কষায়িত চোখে তাকাচ্ছিল বটে, কিন্তু হভেস্কা যা বলছিল তা মেনে নিচ্ছিল, আর হভেস্কা সবসময়ই নির্ভুল প্রতিপন্ন হচ্ছিল, ক্রমে আমিও হভেস্কাকে জিজ্ঞাসা শুরু করলাম আর সেও থতমত না খেয়ে সব কিছু করছিল, একজন সত্যিকারের কম্পাউন্ডারের মতো সঠিকভাবে পাউডারগুলো বানাচ্ছিল।

হভেস্কার সাহায্যে সবকিছু বেশ মসৃণভাবে চলে গেলো। বেলা দুটোর মধ্যে ওয়েটিং রুম ফাঁকা হয়ে গেলো। হভেস্কা আর আমিই শুধু রইলাম।

"বাঃ, বেশ বেশ, ফেডোসিয়া", আমি বলেছিলাম। "আজকে আমি তোমার ওপর খুব খুশি হয়েছি আর তোমাকেই বোধ হয় চৌকিদারে কাজে রেখে দেবো।" ফেডোসিয়ার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। "শুধু এইটা সম্বন্ধে সজাগ থাকবে সব কিছু যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। আমি পরিষ্কার জিনিস পছন্দ করি। আমার কাছে তুমি সব কিছু অন্য রকম পাবে। তোমাকে আর বাচ্চা দেখতে হবে না, কিংবা গাই দোয়াতে হবে না, কিন্তু সার্জারির সব কিছু পবিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তুমি মাসে পাঁচ রুবল করে পাবে আর খাবার পাবে। আমি কিন্তু খুব কড়া মনিব। আমি যেমনটি চাই তেমনটি যদি না কবো তাহলে তোমাকে বরখাস্ত করা হবে। এখন বুঝতে পারলে তো ; চাকরিটা তোমার, তুমি নিতে চাও তো নাও না হলে নিও না।"

হভেস্কা চোখ গোল করে আমার দিকে তাকালো, যেন তার কানকে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না, কখনো লাল হয়ে যাচ্ছিল আবার কখনো ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল। তারপর হাততালি দিয়ে সে হাসিতে ফেটে পড়লো, ছুটে প্রায় চলে যাচ্ছিল, তখন আমি তাকে থামালাম।

একটু দাঁড়াও অত চট কবে আনন্দ করো না। কাজটা আগে একটু করে দেখো। আমাদের দু'জনের বনিবনা হয় তো নাও হতে পারে।"

মেয়েটি ভাব গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লো।

"আমি আমার যথাসাধ্য কববো, হুজুর। সত্যি বলছি, আমার যথাসাধ্য করবো।"

সহকারীর সঙ্গে আমার কথাবার্তা খুবই সংক্ষিপ্ত হয়েছিল। তার যে কি হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্টতই সে বেশ প্রস্তুত ছিল আর সে যেন অন্য কোথাও একটা কাজ খুঁজে নেয় আমার এই উপদেশের উত্তরে শ্লেষের সঙ্গে "আমার বিনীত ধন্যবাদ গ্রহণ করুন," বলে চলে গিয়েছিল। এটাতে আমার কাজ আরও সহজ হয়ে গিয়েছিল, আমি একটা স্বঃস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম ঃ কাউকে প্রত্যাখ্যাত করার থেকে খারাপ কাজ আর কিছু নেই — তার থেকে নিজে প্রত্যাখ্যাত হওয়া ভালো।

তখনও বাড়ির প্রয়োজনীয় মেরামতগুলো করানোর ব্যাপারে আমার বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলা বাকি ছিল। সে আর আমি অচিরেই একটা সুষ্ঠু বোঝাপড়ায় এসে গেলাম। ঠিক হলো পরের দিন থেকেই দেওয়ালগুলো চুনকাম করা আর জানালার ফ্রেমগুলো মেরামত করা শুরু হবে, আর তার স্ত্রী আমার জন্য রাঁধবে আর আমার জামাকাপড় কাচবে।

এই কাজকর্ম চুকে যাবার পর আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল তাই কৃতজ্ঞভাবে

নড়বড়ে কৌচটার ওপর শুয়ে পড়ে আমার বরাত মতো সামোভার আসার অপেক্ষা করছিলাম। ভাবছিলাম "এইবার একটু বিশ্রাম নেওয়া যাবে।" কিন্তু আমার বিশ্রামের শক্ত জায়গাটা — যেটার মধ্যে থেকে এখানে ওখানে ভাঙা স্প্রিংগুলো বেরিয়েছিল, তার ওপর কোনো রকমে একটু আরাম করে শুয়েছি এমন সময় লবির দরজা সশব্দে বন্ধ হলো আর কর্ণভেদী তীক্ষ্ণ চিৎকার আর বহু লোকের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। দৌড়ে লবিতে চলে গেলাম, যাবার পথে সহকারীর শুয়োরটার উষ্মা জাগিয়ে তার খাবার ভর্তি পাত্রটায় ধাক্কা খেলাম আর গাড়ি বারান্দায় গিয়ে পরবর্তী চিত্রটা দেখতে পেলাম। কোনায় দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙেপড়া হভেস্কাকে দু'পাশ থেকে কুদাকিন আর তার স্ত্রী ধরে আছে আর তার কাছ থেকে কি চাইছে।

"কি হচ্ছে এখানে? ব্যাপার কি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। কুদাকিন ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো কিন্তু উত্তর দিলো তার পরিবর্তে তার স্ত্রী।

"দিনে দিনে হচ্ছে কি ডাক্তার? আমরা নিজেরাই গরিব মানুষ, মেয়েটার পরনে যা আছে সেগুলো সব আমাদের জিনিস। ও যখন আমাদের কাছে আসে তখন ওর পরার কিছু ছিল না, আমরাই ওকে জামাকাপড় দিয়েছিলাম, জুতো দিয়েছিলাম। ওর নিজের বলতে একটা সুতোও নেই। এখন আপনি ওকে অত ভালো মাইনে দিচ্ছেন, এখন তো ওর নিজের জামাকাপড় কেনার সঙ্গতি হয়েছে, কিন্তু আমরা তো গরিব মানুষ। আয়, এবার ঐ জামাকাপড়গুলো খোল, বলছি! দেরি করছিস কি জন্য?"

পথ চলতি লোকেরা কি ঘটছে দেখার জন্য থেমে পড়ছিল। হভেস্কা কেঁদেই চললো।

"আমার কথা শুনুন," আমি বললাম। "এখানে রাস্তার মধ্যে তো সব কিছু ও খুলতে পারে না। সবুর করুন যতক্ষণ পর্যন্ত না ও পরার অন্য কিছু পায়। ঐ ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের প্রয়োজন নেই?"

"অন্য কারো কাছে ওগুলো ছেঁড়া ন্যাকড়া হতে পারে, কিন্তু ওগুলো আমাদের সম্পত্তি। ওগুলো বিলিয়ে দেবার মতো অবস্থা আমাদের নেই। বড়লোক ভিখারীদের কাপড় জামা দিক। সেটা করার মতো সঙ্গতি আমাদের নেই।"

ভিড় বাড়ছিল।

"শুনুন, বন্ধুগণ," আমি দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বললাম। "আপনাদের মধ্যে কেউ কি এই মেয়েটিকে কয়েকটা কাপড়জামা দিতে পারেন না? ও পরে আপনাদের দাম দিয়ে দেবে — সেটার জন্য আমি দায়ী থাকছি।"

পুরুষরা বিড়বিড় করতে লাগলো, মেয়েরা মুখ চাওয়াচায়ি করতে করতে নড়েচড়ে দাঁড়ালো। "তোমার কাছে তো কিছু আছে, তাই না আকুলিনা? "শোনো কথা! আপনি নিজে কিছু দিন আমার নিজের মেয়েরা রয়েছে, না।"

শেষকালে তাদের মধ্যে থেকে একজন গেলো আর কিছুক্ষণ বাদে একটা পুঁটলি করে একটা ব্লাউজ আর স্কার্ট নিয়ে এলো, আমার বাড়িওয়ালা দাক্ষিণ্য দেখিয়ে পুরনো একটা ভেড়ার চামড়ার কোট আর ছেঁড়াখোঁড়া একজোড়া ফেল্টের বুট দান করলো।

"এই নাও, ফেডোসিয়া অল্প অল্পতেই সাহায্য হয়", আমি ক্রন্দনরত মেয়েটিকে বলেছিলাম। "যাও এই জামা কাপড়গুলো পড়ে এসো। কেঁদোনা আর, তোমার কাঁদার মতো কিছু হয়নি, তুমি তো কোনো পাপ করোনি। তুমি কারো ক্ষতি করোনি বা কারো গা থেকে জামাকাপড় কেড়ে নাওনি। পাপীদের আর যাদের বিবেক পরিষ্কার নয় — তাঁদের কাঁদতে দাও।"

আর একজন মহিলা গিয়ে মাথায় বাঁধার রুমাল আর একটা জ্যাকেট নিয়ে এলো। হভেস্কা জামাকাপড় বদলে এলো আর পুরনো, ছেঁড়া জামাকাপড়গুলো কুদাকিনদের দিয়ে দেওয়া হলো।

দিন পনেরো বাদে সার্জারি একেবারে চেনাই যাচ্ছিল না। দেওয়ালগুলো চুনকাম করা, জানালাগুলো মেরামত করা হয়েছে আর মেঝেগুলো একেবারে আয়নার মতো চকচক করছিল, কারণ হভেস্কা প্রতিদিন একটা ইট দিয়ে সেগুলো ঘষেছে আর তারপর সাবান দিয়ে ঘষেছে। নতুন আলমারির মধ্যে সব কিছু গোছানো-গাছানো, তার জন্যও হভেস্কার ধন্যবাদ প্রাপ্য, সে আবার সব জিনিস সঠিক জায়গায় রাখার ব্যাপারে খুবই কড়া, এমন কি আমিও ভুল জায়গায় ওষুধপত্র রাখলে সে আমাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছে। কুদাকিনরা চলে গেছে, আমি এখন তাদের দিকটাতেই থাকি বা ডাক্তারের সহকারীর পদটা পূরণ করেছে ধাত্রী মারিয়া ফ্রান্টসোভনা ; যাকে হভেস্কা "ফ্রান্টোভা" ("ফুলবাবু" কথাটার রুশ প্রতিশব্দ হলো 'ফ্রান্ট") বলে। আমাদের তিনজনের বেশ বনে, বেশ শান্তিতে মিলেমিশে আছি আমরা। হভেস্কা সম্বন্ধে ফ্রান্টসোভনা আর আমার খুবই দুর্বলতা আছে, সে তার দক্ষতা আর অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে আমাদের মোহিত করে দিতো। তার কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব ছিল না, কোনো কিছু করতে বললেই সে সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলতো, কখনোই থতমত খেয়ে যেতো না, আর সব সময় এমন আনন্দের সঙ্গে এমন উদ্ভাসিত মুখে, এমন আগ্রহের সঙ্গে করতো যে দেখলেও আনন্দ হতো। বোঝা যেতো সে কাজটা উপভোগ করছে আর সে সাধ্যের অতিরিক্ত করে ফেললে প্রায়ই তাকে বাধা দিতে হতো।

"ওটা এখন থাক, একটু বোসো তো, ফেডোসিয়া," আমি তাকে বলতাম।

সে হাসতো আর তার চোখে দুষ্টুমির একটা ঝিলিক খেলে যেতো।

"সে আমি পারি না," সে বলতো। "বসে থাকতে আমার বিরক্ত লাগে। আমার পা ব্যথা করে।"

আমাদের থেকে ভালো করে সে রোগীদের চিনতো — তাদের নাম কি, কোথায় থাকে এমন কি তাদের কি অসুখ তা পর্যন্ত।

মাসের বিশ তারিখে আমি শহরে গেলাম মাইনের টাকা আনতে, সন্ধ্যায় ফিরে এসে হভেস্কাকে ডাকলাম।

"এই নাও তোমার এক মাসের মাইনে, ফেডোসিয়া", আমি বললাম, তার হাতে সোনার পাঁচ রুবলটি দিয়ে। ফ্রান্টসোভনা কাল শহরে যাচ্ছে তোমার জন্য সে কি

আনবে তার সঙ্গে কথা বলে নিও। তোমার এখন জুতোও আছে আর জ্যাকেটও আছে।" (ফ্রান্টসোভনা ওগুলো তাকে দিয়েছিল।) "কিন্তু তোমার কোনো পোশাকও নেই বা ব্লাউজও নেই। যেগুলো তুমি পরে আছো সেগুলো তোমার নিজের নয়। তাই তোমার কি লাগবে ভেবে দেখো।"

আমি তার দিকে তাকালাম আশা করেছিলাম তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তার উদ্ভাসিত মুখ দেখতে আমার ভালো লাগতো কারণ তখন, তার চোখ দুটো, তার গালের টোলগুলো এমনকি তাব খ্যাঁদা নাকটা পর্যন্ত হাসতে থাকতো। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো নতমুখে, ইতস্ততভাবে পাঁচ রুবলটা নিয়ে হাতের মধ্যে মোচড়াতে মোচড়াতে।

"কি হলো?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।" "তুমি খুশি হওনি?"

"হ্যাঁ খুশি তো হয়েছি", ফেডোসিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। "কিন্তু বাবা তো ওটার সবটাই মদে খরচ করবে ...।"

"মদে খরচ করবে?"

"হ্যাঁ, বাবা আসবে আর ওটা নিয়ে যাবে।"

"ওঃ, বুঝেছি। ঠিক আছে, ওটা আমাকে দাও। তোমার যা লাগে তা আমি নিজেই কিনবো! আর তোমার বাবা যদি আসে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

পবের দিন সার্জারি শেষ হলো, ফেডোসিযা এসে আমাকে জানালো ঃ

"বাবা এসেছে, হুজুর। লবিতে অপেক্ষা করছে।"

"ওকে বলো ভেতরে আসতে।"

একটুক্ষণ পরেই একটা সতর্ক কাশি আর রহস্যময় ফিসফিসানি আমাকে জানালো যে "বাবা" ভিতরে এসেছে। আমি ওয়েটিং রুমে গেলাম, সেখানে দরজার পাশে বহু ব্যবহারে জীর্ণ একজোড়া বাকলের জুতো পায়ে আর খড়ের কুটো মাখা একটা টুপি মাথায়, অবিন্যস্ত একজন কৃষককে দেখতে পেলাম। লম্বা একটা লাঠি ধরে দাঁড়িয়েছিল। তাব মধ্যে কেমন একটা টলমলেভাব দেখতে পেলাম, হাতগুলো তার আলগাভাবে ঝুলেছিল, যেন তাদের আর তার কোনো প্রয়োজন নেই ঃ তার সরু সরু পাগুলো হাঁটুর কাছে ভেঙে পড়েছিল যেন তাদের প্রভুর নড়বড়ে দেহটা তুলে ধরে রাখবার শক্তি তাদের নেই। অমায়িক মুখটা রেখাকীর্ণ আর তার মধ্যে থেকে, আশ্চর্যরকমভাবে হুভেস্কার চোখের মতো একজোড়া স্বচ্ছ, গাঢ় নীল চোখ, একটা দায়িত্বহীনতার ভাব নিয়ে তাকিয়েছিল, কিন্তু তার মুখের প্রধান শোভা ছিল তার নাকটা, বড়ো আর টকটকে লাল, ফুটন্ত পপি ফুলের মতো জ্বলজ্বল করছিল। ফেডোসিয়া একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল, দুঃখ আর সমবেদনা মেশা চোখে বাপকে লক্ষ্য করছিল, প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের মায়েদের মতো।

"বলো, তোমার জন্য কি করতে পারি?" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

"আমি এসেছি মাইনের টাকাটার জন্য", লোকটি খুশি খুশিভাবে হাসিমুখে, উত্তর দিয়েছিল।

"কোন মাইনের টাকা? তুমি তো এখানে কাজ করো না।"

লোকটি কেমন থমকে গেলো আর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালো, যেন তার কাছ থেকে সে সমর্থন আশা করছে। কিন্তু ফেডোসিয়া কিছু বললো না।

"আমি এখানে কাজ করি না ··· সেটা ঠিকই ··· কিন্তু আমার মেয়ে করে ··· তাই আমি এসেছি তার মাইনের জন্য।" সে আমতা আমতা করতে লাগলো।.

"কিন্তু আমরা তো সেটা হতে দিতে পারি না। সে তাহলে কি করবে? তারও তো পয়সার প্রয়োজন। তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখো। যে সব জামা কাপড় সে পরে আছে তার একটাও ওর নিজের নয়। কিছু সহৃদয় লোক ওকে ওগুলো দিয়েছে। আর তারা যদি ওর কাছ থেকে ওগুলো ফেরত চায়, তাহলে ওর কিছুই থাকবে না! তা আমরা হতে দিতে পারি না, পারি কি?"

"ওঃ তা ও ঠিক থাকবে ··· আমরা একেবারে নিঃস্ব ··· ময়দা আর অন্য সব কিছু কিনতে হবে, চারটে ছেলেমেয়ে আর স্ত্রী আর আমি তার মানে আমরা ছ'জন ···। ও তো সবুর করতে পারে ···।"

আমি প্রায় রাগারাগি করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার পরিবর্তে হো হো করে হেসে উঠলাম।

"ও সবুর করবে কি করে? তুমি তো দেখছি অদ্ভুত লোক। ও কি করবে, জামা কাপড় ছাড়াই ঘুরে বেড়াবে? তুমি তো একজন বয়স্ক, স্বাস্থ্যবান লোক অথচ তোমার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য যথেষ্ট রোজগার করতে পারো না। আরওতো ছোট্ট একটা মেয়ে, আর ওর প্রতিটি পাই পয়সা তুমি নিয়ে নিচ্ছো। সেটা উচিত নয়, উচিত কি? আরো একটা কথা। ও যদি ঠিকমতো জামাকাপড় না পরে, তাহলে ওকে আমি রাখতে পারবো না। এখানে যেই কাজ করবে তাকে উপযুক্ত পোশাক পরতে হবে। আমরা এক দঙ্গল ভিখারীর মতো সাজ করতে চাই না, চাই কি?"

'খানিকক্ষণ ধরে যুক্তি দিয়ে আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার সমস্ত যুক্তির উত্তর ছিল তার চোখের কোনার হাসি, তার গলার খ্যানখ্যানে সুর আর পুরনো সেই এক কথা "ময়দা কিনতে হবে ··· আমরা ছ'জন ··· "ইত্যাদি ইত্যাদি।

"বেশ", অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে আমি বললাম। "এই নাও পঞ্চাশ কোপেক, ময়দার জন্য, এবার যাও।"

কিন্তু লোকটা গেলো না। সে কোপেকটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো তারপর নড়েচড়ে দাঁড়ালো।

"পঞ্চাশ কোপেকের ব্যাপারটা কি?" সে বিড় বিড় করে বললো। "আমরা শুনেছিলাম আপনি ওকে পাঁচ রুবল করে দিচ্ছেন, এখন মাত্র পঞ্চাশ কোপেক। ওটা চলবে না।"

"তা যদি না চলে, তবে এটা ফেরত দাও আর চলে যাও।"

"চলে যাবো ঃ এ্যাঁ? বেশ তো তাই যদি হয় তবে আমি আমার মেয়েকেও নিয়ে যাচ্ছি। পঞ্চাশ কোপেকের জন্য সে হাড়ভাঙা খাটনি খাটবে কেন? বাড়িতে সে এর থেকে বেশি রোজগার করতে পারবে।"

"কিন্তু সহকারী তো ওকে পঞ্চাশ কোপেকই দিতো, তাই না।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেতো আগে। এখন আর সেটা চলবে না। চলে আয় হভেস্কা।"

"কি আর করবো, ফেডোসিয়া", আমি বললাম। "তোমার বাবার সঙ্গে বাড়ি যাও। ঐ যে ফেল্টের বুটগুলো পরে আছো ও গুলো তো বাড়িওয়ালার — তাই না? আর ঐ ভেড়ার চামড়ার কোটটা? তুমি বরং ওগুলো খুলে ফেলো আর 'ব্লাউজটাও"। আমি বললাম আমার মুখের ভাবে ফেডোসিয়াকে বুঝিয়ে দিলাম ঐ কথাগুলো বলছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে।

ফেডোসিয়া তাড়াতাড়ি একটা ফেল্ট বুট খুলে ফেললো, তারপর আর একটা আর তার কোটটা যখন খুলতে যাচ্ছে, তখন তার বাপ, ব্যাপারটা পরিহাসের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে তাঁকে থামাবার ইঙ্গিত করলো।

"ঠিক আছে, ওকে থাকতেই দিন। তুমি থাকতে পারো হভেস্কা। আমি ঐ রকমেরই লোক ··· পঞ্চাশ কোপেকই সই, এবার মিটিয়ে দিন।"

তারপর সে বেবিয়ে চলে গেলো।

"প্রত্যেকটা কোপেক বাবা মদে খরচ করবে!" হভেস্কা দুঃখের সঙ্গে বললো। মাকে কিছু দেবে না। ওরা এখন উপোস করে থাকবে ··· কেন আপনি বাবাকে ওটা দিলেন?"

"মন খারাপ কোরো না, ফেডোসিয়া!" আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম। "ফ্রান্টসোভনা ময়দা, আর দরকারী সব কিছু কিনে আনবে আর তোমার মার কাছে নিয়ে যাবে। সেটাই ভালো হবে ···।"

তখন থেকে আমরা সেই রকমই করতাম, আর হভেস্কার বাপ প্রতিটি মাইনে পাবার দিন এসে হাজির হতো আর তাকে পঞ্চাশ কোপেকই দেওয়া হতো, তার বেশি নয়।

আমাদের কাছে থেকে ফেডোসিয়ার ওজন বাড়লো আরও বেশি চটপটে আর আমুদে হয়ে উঠলো। ও আর ফ্রান্টসোভনা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলো, আর অনন্তকাল ধরে দু'জনে ফিসফিস করে কথা বলতো যাজকের মেয়ে কেমন পিছনের দিকে কুঁচকে থাকা অদ্ভুত দেখতে জ্যাকেট পরে চার্চে এসেছিল কিংবা রোগী ও তাদের ব্যাপার স্যাপার, যেগুলো ফেডোসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানাতো সেই সম্বন্ধে, কিংবা মানুষকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় কি কিংবা মানুষের আত্মা কোথায় থাকে সেই সম্বন্ধে। এই সব সম্বন্ধে ফেডোসিয়ার খুবই কৌতুহল ছিল। ফ্রান্টসোভনা তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল যাতে করে ফেডোসিয়া শুধু যে মিশ্রণ করে ওষুধ বানাতে পারতো তাই নয়, আবার নানা রকম ওষুধ জ্বাল দিতে জটিল মলম মিশ্রিত করতে আর এমন কি তার কথায় "রক্তের প্রদাহ" কমাবার জন্য কাপিং গ্লাস ও (রক্ত মোক্ষক কাচ বিশেষ) লাগাতে পারতো।

"তোমার ডাক্তার হওয়া উচিত, ফেডোসিয়া", আমি মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলতাম।

হভেস্কার মুখটা উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠতো।

"ওমা সে কি" সে বলতো। একজন ডাক্তার …। যদি পড়তে লিখতে পারতাম!"

"বেশ তো, শেখোনা কেন? চলো একটা ABC (এ বি সি-বর্ণ পরিচয়) কেনা যাক, আর অক্ষর চিনতে শেখো।"

"আমার লজ্জা করবে! এখানকার মেয়েরা ওসব করে না। ওরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।"

"বেশ তো, হাসাহাসি করতে দাও! শুধু নির্বোধরাই হাসাহাসি করবে আর বুদ্ধিমান লোক তোমার প্রশংসা করবে।"

হভেস্কা চিন্তামগ্ন হয়ে গেলো। শীঘ্রই আমি লক্ষ্য করলাম সে যত্নের সঙ্গে বই আর সংবাদপত্রগুলো দেখে, আর খুবই অবাক হলাম যখন একদিন সে হঠাৎ আমার সামনে রাখা একটা বইয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে একগাল হেসে বললো ঃ

"ওটা তো 'A' তাই না?

"কি করে সেটা জানলে তুমি?"

"বাড়িওয়ালার ছেলে মিশা আমাকে চিনিয়ে দিয়েছে। ওতো ইস্কুলে যায় আর সব অক্ষর চেনে। আর আমিও এখন ওগুলো চিনি। কিন্তু শুধু বড় হাতের গুলো, ছোট হাতেরগুলো আমি এখনও ঠিক ভালো করে চিনি না।"

"বাঃ খুব ভালো।" আমি তাকে প্রশংসা করে বললাম। "এর পবের বার যখন শহরে যাবো তখন তোমার জন্য একটা পড়ার বই নিয়ে এসে তোমায় পড়তে শেখাবো।"

কিন্তু ফেডোসিয়া মাথা নাড়লো।

"না, হুজুর, ওটা করবেন না। ওরা সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। আমাদের মতো লোকদের জন্য ওসব নয়। আমি কি করে পড়তে শিখতে পারি?"

আর হাসতে হাসতে সে পালিয়ে গেলো।

কিন্তু ফেডোসিয়া আমাদের কাছ থেকে কিছু গোপন করছিল। আমি অনুমান করেছিলাম, যে সে গোপনে অক্ষর পরিচয়ের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, কারণ হঠাৎ আমরা খুব কেরোসিন খরচ করতে লাগলাম আর সার্জারির লণ্ঠনটা প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত জ্বলতো। এর আগে ফেডোসিয়া তার গোছগাছ করা শেষ হলেই শুতে চলে যেতো কিন্তু এখন সার্জারির জানলা দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আলো দেখা যেতো। আমাদের চৌকিদার তাহলে জেগে থাকে। তাকে আমি ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছিলাম।

"আজকাল আমাদের এত কেরোসিন খরচ হচ্ছে কেন, ফেডোশিয়া?"

"কেন কি হলো? সেটা কি অন্যায়?" মেয়েটি চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল।

"না, না, যতক্ষণ খুশি তুমি লণ্ঠন জ্বালাতে পারো, শুধু কি করো তুমি ওখানে? ভূত নামানো না অন্য কিছু কর?"

"ভূত নামানো। ওরে বাবা, ওসব নিয়ে আপনি ঠাট্টা করবেন না। তাহলে আমি আর লণ্ঠন জ্বালাবো না।"

"শোন ওর কথা একবার। চাও তো তুমি সারা রাত জেগে বসে থাকতে পারো, কেরোসিনের ব্যাপারে আমি কিছু মনে করছি না। তুমি কি করছো আমি শুধু সেই ব্যাপারে কৌতূহলী।"

ফেডোসিয়া কিছু বললো না, কিন্তু গোপন করার যতই চেষ্টা করুক না কেন শেষ পর্যন্ত আমি ধরে ফেলেছিলাম।

একদিন রাতের খাবার পর লবিতে গিয়েছিলাম। দরজাটা খুলতে না খুলতেই মোটাসোটা একটি অল্প বয়সী ছেলে আমার পাশ কাটিযে ছুটে উঠোনে বেরিয়ে গেলো। শুধুমাত্র তার মাথায লোমশ টুপিটা আর টুপির নিচে চকচকে চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে এটাই দেখার সুযোগ হয়েছিল ঃ আর ঐখানে দাঁড়িয়ে ফেডোসিযা, কোনার মধ্যে একবার কুঁকড়ে যাচ্ছিল, শঙ্কিত মুখ আর পিছনে কি যেন লুকোবার চেষ্টা করছিল। আমি দোষী দু'জনকে হাতে নাতে ধবে ফেলেছিলাম। বড় টুপি মাথায় ছোকরাটি স্পষ্টতই ফেডোসিয়ার সহযোগী।

"এখানে কি করছিলে?" আমি কঠিনভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। "ওকে?"

"ওও ··· ওতো মিশা, বাড়িওযালার ছেলে ···" ফেডোসিয়া আমতা আমতা করে বলেছিল।

"বুঝেছি। আব তোমার হাতে ওটা কি? দেখি একবার? লজ্জায় লাল হয়ে ফেডোসিয়া অনিচ্ছার সঙ্গে একটা বই বার করলো "Our First Reader" (আওযার ফার্স্ট রিডার)-এর একটা ছেঁড়া-খোঁড়া বহু ব্যবহৃত কপি।

"ওরে খুদে শয়তানরা।" আমি জোরে হেসে উঠলাম।" এই জন্যই আমরা এত এত কেরোসিন খরচ করছিলাম। বেশ, বইটা নিয়ে কতদূর এগোলে? এখনও কি শুধু বড় হাতের অক্ষরগুলো চিনতে পারো?"

"না, এখন ছোট হাতের অক্ষরগুলোও পড়তে পারি। ফেডোসিযা ফিসফিস করে বললো।

"বেশ তো, পড়ে দেখাও তাহলে।"

ফেডোসিয়া বইটা নিয়ে, একটু থেমে থেমে, বিশেষ করে পর পর দুটো ব্যঞ্জন বর্ণওযালা সিলেব্যালগুলোয়, বেশ স্পষ্টভাবেই কয়েকটা লাইন পড়লো।

"বাঃ, বেশ হয়েছে," আমি বললাম। "কিন্তু এই লুকোচুরি কেন? পড়তে শেখা তো কোনো লজ্জা পাবার ব্যাপার নয়। খোলাখুলিভাবে করো, আর যদি কিছু বুঝতে না পারো, আমাকে ফ্রান্টসোভনাকে জিজ্ঞাসা কোরো। আমরা তো খুশি মনে তোমাকে সাহায্য করবো।"

"আপনি হাসবেন না তো?" ফেডোসিয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, বরাবরের মতো উদ্ভাসিত মুখে।

সেইদিন থেকে সে লুকোচুরি বন্ধ করেছিল, আর প্রতিটি অবসর মুহূর্তে তাকে দেখা যেতো জানলার ধারে একটা বই নিযে বসে লাইনের পর লাইন আউড়ে চলেছে "বরফের মতো সাদা দাড়িওয়ালা একজন টাক মাথা বুড়ো।"*

একজন হভেস্কা ভালো করে পড়তে আর লিখতে পারে ঃ সে এখনও জানতে উৎসুক মানুষের আত্মা কোথায় থাকে, আর আমি যখন রোগী দেখে সন্ধ্যাবেলায় ফিরি আর দেখতে পাই সার্জারির জানলায় একটি মাত্র বাতি জ্বলছে, আর ফেডোসিয়া হেঁটমাথায় বসে অতটা অধ্যাবসায় আর দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে জ্ঞান আহরণ করছে, তখন ভাবি এই রকম কত শত আলো সারা রুশদেশ ব্যেপে ছড়িয়ে আছে!

★ জেমস্তভো ছিল গ্রামীণ এলাকায় স্বায়ত্তশাসনের একটি সংস্থা। ১৮৬৪ সালে রুশদেশে ভূমিদাসদের মুক্তির পর প্রচলিত করা হয়, কিন্তু এটির ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত আর বেশির ভাগই সম্ভ্রান্তবংশীয়দের নিয়ে গঠিত হতো।

★ আইভান নিকিটিন-এর কবিতা "Grandfather" থেকে উদ্ধৃত একটি লাইন।

ভ্যালেনটিনা আইযেভোভনা ডিমিট্রিয়েভা (১৮৫৯-১৯৪৭)-র "Hveska-Doctors Watchman" গল্পটির ছায়াবলম্বনে।

পলাতকা

সিনডিউই ম্যাগোনা

"ধরো ওকে! ওকে ধরো তোমরা!" চিৎকাবে সবুজ পাহাড় আর ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ঝোপে ঢাকা পর্বতে ঘেরা উপত্যকার মধ্যে আরামে গা ঘেঁষে থাকা পিরিচের আকারের গ্রামটার নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল।

পাহাড়ের চূড়ো থেকে প্রতিধ্বনিগুলো মাঝ আকাশে ধাক্কা খেয়ে তালগোল পাকানো কলরবে ছিটকে পড়েছিল, গমগম সেই শব্দ আমাদের কানের মধ্যে বিঁধে গিয়ে অন্য সব শব্দ আটকে দিয়েছিল।

ওয়েহ ওয়েহ ওযেহ খাউউ খাউউ লেহ লেহ লেহ লেহ তুউ তুউ তুউ এক মুহূর্ত আগেও যেসব ন্যাকড়ার পুতুল নিয়ে আমরা নিবিষ্ট হয়ে ছিলাম একটা শক্তিশালী চুম্বকের মতো সোরগোলটা তার থেকে আমাদের টেনে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

ইইই-ইইই-উউ-উউ-উউউ!

এম এম বা-এম বিই ই ই হ হ হ-নি!

খা আ আ-উউ-লী-লী-লা আনি!

এক বুড়ো : তার মাথার ওপরের ধূসর ক্ষুদে ক্ষুদে শক্ত করে পাকানো পশমের স্প্রিংগুলো আঁটসাঁট একটা টুপির মতো লাগছিল। স্খলিত পায়ে আমার পাশ দিয়ে সে চলে গিয়েছিল, দেখে মনে হয়েছিল দৌড়বার জন্য সে যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তার গায়ে ঢিলেঢালাভাবে জড়ানো কম্বলটা সে বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরেছিল। তার কাঁধ থেকে ডান হাত পর্যন্ত এমনভাবে বেরিয়ে ছিল যে মনে হচ্ছিল সেটা যেন একটা টোগার থেকে বেরিয়ে আছে। রোগা, লম্বা আর অস্থিসার হাতটা তার অভিপ্রেত দ্রুততর গতির সঙ্গে তাল রেখে সামনে পিছনে দুলছিল। হাতে উঁচু করে ধরা একটা নকবেরি (মুণ্ডি দেওয়া লাঠি) বাইরের দিকে বেরিয়েছিল। যতবার সে " এমবা এমবেনি! ওকে ধরো!" বলে চিৎকার করছিল ততবারই নকবেরি ধরা হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে লাঠিটা দিয়ে পাহাড়ের দিকে দেখাচ্ছিল।

আমার দৃষ্টি তার নির্দেশিত জায়গাটার দিকে ধেয়ে চলে গিয়েছিল। পাহাড়টা সূর্যের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিল। না কি মেঘেদের সঙ্গে? যে যাই হোক পাহাড়ের অর্ধেকটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল বাকি অর্ধেকটার দিকে আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলাম।

সেখানে দূরে ছোট হয়ে আসা মানুষগুলো ছোটাছুটি করছিল, তাড়াহুড়ো করে ঠেলাঠেলি করতে করতে দৌড়োচ্ছিল।

তাদের আগে একপাল কুকুরে তাড়ানো খরগোশের মতো মাত্র একজন মানুষ সবেগে ছুটে চলেছিল। আমি লক্ষ্য করেছিলাম মেঘেরা কিন্তু অলস খেলুড়ে ছিল না। এই খেলায় তারা ছিল তৃতীয় পক্ষ, আর কার্যকর তারতম্য তারাই ঘটাবে।

সেই দিনই আমি পরিষ্কারভাবে অশ্রুর জন্ম দেখেছিলাম। মেঘেরা কেঁদেছিল আর নিস্তব্ধ পাহাড়টার ওপর হালকা কুয়াশার অশ্রু ঝরিয়েছিল। পলাতক মানুষটি কি সময় মতো কুয়াশার কম্বলের মধ্যে পৌঁছতে পারবে? সূর্য হেসে উঠেছিল আর কুয়াশা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল দীর্ঘ তপ্ত, হলুদ রঙের ছুঁচের ফোয়ারার মধ্যে, সূর্যের সন্তান-সন্ততি যে তারা।

ঐখানের সে ছিল, পরিষ্কারভাবে আমি তাকে দেখতে পেয়েছিলাম। ওর পিছনে ধাওয়া করা লোকগুলোও নিশ্চয়ই ওকে দেখতে পাচ্ছে? — আমি যেমনভাবে তাকে দেখতে পাচ্ছি ঠিক তেমনি ভাবে?

আমার ভেতরটা গুলিয়ে উঠেছিল। আমার পেটের মধ্যে আশঙ্কার একটা গোলা দলা পাকিয়ে উঠেছিল। কিন্তু মেঘেরা হার না মেনে কেঁদে চলছিল। ঘন, মোটা, গাঢ় ধূসর রঙের সব বল্লম ঝরে পড়ছিল। ক্ষিপ্র গতিতে আর সজোরে তারা নেমে আসছিল। ঘন, মোটা; তার মধ্যে গা ঢাকা দেওয়া আর তাব পিছনে ধাওয়া করে আসা লোকগুলোর কাছে হারিয়ে যাওয়াটা মেয়েটির পক্ষে নিরাপদের ছিল।

"উইয়ে ফি? কোথায় গেলো সে?"

তাকে ধরার জন্য যারা বদ্ধ পরিকর তাদের আর্তনাদের শব্দ আমার কানে এসে পৌঁছেছিল। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করেছিলাম, মেয়েটিব সঙ্গে প্রবলভাবে চেষ্টা কবছিলাম, চাইছিলাম সে যেন ওদের এড়িয়ে যেতে পারে, দূরে আরও দূরে চলে যাওযার জন্য তাকে উৎসাহিত করছিলাম।

শেষবারের মতো তাকে দেখেছিলাম, নীল রঙের জার্মান প্রিন্টের পোশাকটা তার দূরত্ব আর আলোর অভাবে হালকা আসমানী রঙ হয়ে গেছে .... ঐ তো ঐখানে সে পাথরের চাঙরের মধ্যে দিয়ে ইতস্ততভাবে ছুটে চলেছে, তার পরনের লম্বা নতুন বউয়ের পোষাকটায় তাকে মনে হচ্ছিল যেন তার পা নেই। পালাবার জন্য সে যখন সবেগে চলেছিল তখন মনে হচ্ছিল সে যেন বাতাসে চড়ে চলেছে, তার দেহের কোনো অংশ মাটি স্পর্শ করছিল না।

আমি দেখেছিলাম কুয়াশার দেওয়ালের মধ্যে সে আলতোভাবে ভেসে চলে গিয়েছিল। দেখেছিলাম কুয়াশার দেওয়ালটার মধ্যে ভেসে কোনো রকম ঢুকে পড়ার পব ফাঁকটা বুঁজে গিয়েছিল। জলের মধ্যে সাঁতার দেওয়া মাছের মতো সে দেওয়ালের মধ্যে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। কুয়াশার দেওয়াল তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নিজেকে আবার নতুন করে গুছিয়ে নিয়েছিল। আর যারা তাকে ধাওয়া করছিল তাদের থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।

মেয়েটিব মুখটা আমি একেবাবেই মনে কবতে পাবছি না। সে তো অনেক দিন আগেব কথা আব হয়তো সে আমাদেব সঙ্গে বেশি দিন থাকেনি বলেও। কিন্তু তাব চলে যাওযাব কথা আমাব মনে আছে। কেন না সেটা আমাকে দৃঢ় সঙ্কল্প, নিজেব ইচ্ছাশক্তিব ক্ষমতা শিক্ষা দিযেছিল।

সে ছিল অল্পবযসী এক মেযে, এক নতুন বউ। তাব স্বামী, আমাব কাকা, খনিগুলোব একটাতে কাজ কবতে চলে গিযেছিল, গ্রামেব সব পুরুষমানুষবাই যেমন অনেক দিনেব জন্য সেখানে চলে যেতো। পবে, অনেক পবে, নিজেব জীবনটা গড়ে তোলাব জন্য যথেষ্ট শিক্ষালাভেব পব আমি জানতে পেবেছিলাম তাদেব সেখানে থাকাব মেযাদ — এগাবো মাস কবে প্রতি বছবে। কিন্তু আমাব সেই জ্ঞানটা হযেছিল বহু বহু দিন আগেব আমাব সেই আতঙ্কভবা দিনটা থেকে বহু আলোক বৎসব পবে।

সেটা ছিল বোধহয ভবদুপুব কেন না সূর্য ছিল অনেক উঁচুতে আব আমবা বাচ্চা ছেলেমেযেবা ইতিমধ্যেই বাইবে খেলতে বেবিযে এসেছিলাম, অর্থাৎ আমবা যাবা স্কুল নামক মাটিব দেওযাল ঘেবা ঘাসেব চাল দেওযা বাড়িটাব পক্ষে নেহাৎ-ই ছোট তাবা।

আমি জানি একজন কাকীমাকে হাবানোব জন্য আমাব দুঃখ হওযা উচিত ছিল। আমি জানি সে একজন ভালো মা কোটি (নতুন বউ) ছিল, যত্ন কবে বান্না কবতো সাফ সুতবো কবতো, আব তাব আসাব ফলে আমবা বাচ্চাবা অনেক কাজেব থেকে বেহাই পেযেছিলাম — নতুন বউযেবা তাদেব নতুন পদে অধিষ্ঠানেব জন্য গাধাব মতো খাটতো। আমি জানি আমাব কাকাব জন্য আমাব সহানুভূতি হওযা উচিত ছিল কেন না আমাব কাকা যে শুধু বউ হাবিযেছে তাই নয তাব সঙ্গে সঙ্গে সে হাবিযেছে গোরু বাছুব, লোবেলা (কন্যাপণ) সেই বউযেব জন্য যা সে দিযেছিল।

আমি শুধু জানি গাঢ় ধূসব মেঘেব আব কুযাশাব মধ্যে তাকে পালিযে যেতে দেখে যে শিহবণ অনুভব কবেছিলাম তাব কথা।

Sindiwe Magona (সিনডিউই ম্যাগোনা) দক্ষিণ আফ্রিকা। অধুনা ইস্টার্ন কেপ প্রভিন্সেব উমটাটা থেকে ১৮ কিলোমিটাব দূবে গুঙ্গুলুলু গ্রামে ১৯৪৫ সালে তাব জন্ম হয। ছোটবেলায তিনি কেপটাউনের নিকটবর্তী বিট্রিটেব কাছে গ্রাযোভলেই, এবং পরে গুগুলেটুসে বাস কবতেন। পবিচাবিকাব কাজ কবতে কবতে তিনি শিক্ষিকা হবাব জন্য পড়াশোনা কবেন এবং আমেবিকা যুক্তবাষ্ট্রেব কলম্বিযা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষালাভেব জন্য একটি বৃত্তি পান। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনির্ভাসিটি ও কলম্বিযা ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রী পান আব নিউ ইযর্কেব হার্টউইক কলেজ থেকে অনাবাবি ডক্টবেট পান তিনি ইউনাইটেড নেশানস এ কমবত। তাব প্রকাশিত বইযেব মধ্যে বযেছে To my children's children Forced to grow push push! Mother to Mother ছোট ছোট টুকবোব সংকলন Living Loving and Lying Awake at night Sindiwe Magona বচিত Fight গল্পটিব ছাযাবলম্বনে।

চীনাবাদাম ছাড়ানো

ইভোন ভেরা

'লুকোও ! লুকোও !

বাচ্ছা বাচ্ছা ছেলেরা এ কে রাইফেলগুলো নিয়ে রাস্তা আর উঠোনগুলোর মধ্যে দিয়ে ছোটাছুটি করছিল। মাটিতে ধরাশায়ী হবার আগে বেড়াগুলোর ভেতর দিয়ে তারা গুলি করছিল সেই সঙ্গে চীৎকার করছিল তারপর আবার উঠে পড়ে পরস্পরেব মুখোমুখি হচ্ছিল। যতটা সম্ভব বিকটাকার করার জন্য তারা মুখ বিকৃতি করছিল, চাইছিল নিজেদের যেন আর বেশি নির্মম আর নিষ্ঠুর দেখায়। গুলির শব্দ নকল করছিল তারা। তাদের মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া লম্বা লম্বা ঘাসের আর কাল্পনিক প্রতিক্ষার পাথরগুলোর পিছনে লুকোতে দেখে বাচ্ছা বাচ্ছা মেয়েগুলো মজা পেয়ে হাসছিল।

'জোচ্চুরি করছো তুমি। আমি বলেছিলাম 'লুকোও!' কিন্তু তুমি তো ছুটেই চলেছিলে! এ খেলাটা তুমি তো মোটেই খেলতে জানো না। আমি 'লুকোও!' বললেই তুমি শুয়ে পড়বে আর লুকোবে। তার মানে হলো আমি শত্রুপক্ষকে গুলি কবতে চলেছি কিংবা শত্রুপক্ষ গুলি করতে চলেছে।

'আবার শুরু করা উচিত আমাদের। খেলাটা আরও জমজমাট করার জন্য আরো লোকের দরকার। আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য মেয়েদের ডাকা যাক, তাহলে দু'টো দল হবে আমাদের।'

'যুদ্ধ যে কি করে করতে হয় মেয়েরা তাতো জানেই না, আর ওদের ধাক্কা দিয়ে যদি ঠেলে সরিয়ে দাও তাহলে এরা কাঁদতে শুরু করে। মেয়েদের আমাদের দলে ডাকা উচিত বলে আমার তো মনে হয় না।'

'ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলে সব মেয়ে কিন্তু কাঁদে না। রেবেকা কাঁদে না। ওকে ডাকা যাক, তাহলে আমরা চারজন হবো।'

'আমার মা আমাকে বলেছে কিছু কিছু মেয়েরাও যুদ্ধ করতে গেছে, তারাও বড় বড় বন্দুক নিয়ে ছেলেদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে। সৈন্যরা যাদের মেরে ফেলেছে, সেইসব মেয়েদের ছবি আমি আফ্রিকান টাইমস কাগজে দেখেছি। আমার

আঙ্কল আমাদের সেইসব দেখিয়েছে। তার মানে হলো আমাদের উচিত আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য মেয়েদের ডাকা।'

'তাহলে ঠিক আছে কিন্তু আগে ঠিক করা যাক খেলাটা আমরা কিভাবে খেলবো। তোমরা দুজনে হবে সৈনিক আর রেবেকাকে নিয়ে আমি হবো বিদ্রোহী। তোমরা প্রথমে আমাদের বলবে তোমরা কি চাও, আমরা তখন সেটা দিতে অস্বীকার করবো, তখন তোমরা চলে যাবে আর আমরা লড়াই শুরু করবো। আমরা যখন গুলি করবো তখন যদি তুমি 'লুকোও' না বলো তাহলে তুমি বন্দী হবে। আমরা কলাপাতা দিয়ে হেলমেট বানাবো আর মুখে রঙ মাখবো। তোমাদের দাবি কি?'

'আমরা আরও টাকা চাই। আমরা জানতে চাই তোমাদের মেশিনে তোমরা কেন আরও টাকা বানাতে পারো না যাতে করে সবাই টাকা পায়?'

ছায়ায় বসে মা দেখছিল, শুনছিল ছেলেদের কথা কাটাকাটি আর সিদ্ধান্ত তার গালগুলো অল্প অল্প কাঁপছিল, যদিও তার চোখ দুটো ছিল শুকনো। তার ছড়ানো পায়ের মধ্যে সে বোনার কাঁটাগুলো শক্ত করে চেপে ধরেছিল। মাদুরের একপাশে ছিল খোসাওয়ালা চিনাবাদামের একটা ঝুড়ি। এলাকা দখলের লড়াইয়ের তার মেয়ে রেবেকাকে ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিতে দেখে সে বিচলিত হয়ে উঠেছিল। এই মুহূর্তে মেয়ে আর বাপ একই কাজ করছে এও কি সম্ভব? একে অপরকে দেখেনি কখনো ওরা। বাপ আর মেয়ে।

'লুকোও! লুকোও!' তার মেয়ে চীৎকার করছিল। মা মনে পড়ার যন্ত্রণা ভোগ করছিল। মা তার বোনার কাঁটাগুলো সরিয়ে রেখে দিয়েছিল, চীনাবাদামের ঝুড়িটা তুলে নিয়ে পা মুড়ে বসেছিল। ছায়াটা একটু সরে গিয়েছিল, উঠে সে তার মাদুরটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে গাছের অপর পাশে পেতেছিল।

'তোমরা মরে গেছো! তোমরা মরে গেছো!' বাচ্চাগুলোর কণ্ঠস্বর বাতাস বিদীর্ণ করে দিয়েছিল। তারা তাদের পিছনে ধুলোর ছোট ছোট মেঘ উড়িয়ে বেড়ার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ছায়ার নিচে থেকে তাদের নগ্ন পা গুলো বেরিয়েছিল।

মা ভাবছিল তার মনে পড়ে যাওয়া মুখটার কথা, চওড়া চওড়া কাঁধ, পেশীবহুল বাহু দুটো। 'এক যুবক' বয়সে তখন তার থেকে খুব একটা বেশি বড় ছিল না। এখন যখন তার বাচ্চা তার গর্ভে এখন কি করবে মেয়েটি? যুবকটি বলেছিল সে থাকতে পারবে না, ইতিমধ্যেই সে তো যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। সে ভাবেনি তাদের পরিস্থিতি বদলে যাবে, আর একটা বাচ্চা আসবে।

'তোমাকে আমি গুলি করেছি। তুমি মরে গেছো..... জোচ্চুরি করো না!' রেবেকা রাগতভাবে চীৎকার করে উঠেছিল। বাচ্চা ছেলেটা শুধু হেসে উঠেছিল, তারপর রাগের ভান করে ভুরু কুঁচকে চট করে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, রেবেকার দিকে পরের পর গুলি ছুঁড়ে চলেছিল। মা শুনছিল তার মেয়ের তীক্ষ্ণ গলা, তারপর বাপের অনুনয় ভরা কণ্ঠস্বর, যার কথা তার মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল।

'আমি যখন ফিরে আসবো তখন আবার নতুন করে শুরু করবো,' মেয়েটিকে বলেছিল সে।

'তুমি যখন ফিরে আসবে?' মেয়েটি প্রতিধ্বনি করেছিল। 'তুমি ফিরে আসবে কি?'

যুবকটি নিজের পাৎলুনের দিকে তাকিয়েছিল, পাৎলুনের হাঁটুর কাছগুলো ছেঁড়া।

'যাদের কাজ নেই তাদের যেতেই হবে। ওখানে কাজ একটা আছে'। বিশেষ কোন একটা জায়গার কথা যুবকটির মনের মধ্যে ছিল না, শুধু ছিল জঙ্গলের মধ্যেকার এক টুকরো যুদ্ধ ক্ষেত্র, যেখানে সে কিছুটা এলাকা দাবি করতে পারে।

'আমি কি করবো?' মেয়েটি জিজ্ঞাসা করেছিল যুবকটির চোখের দিকে তাকিয়ে 'একা একা?'

যুবকটি কোনও উত্তর দেয়নি। হয়তো মেয়েটির জন্য সে যা করতে পারেনি তার জন্য লজ্জা পেয়েছিল।

'লুকোও! লুকোও!' বাচ্ছাদের বন্দুকগুলো ছাতের মাথাগুলোর ওপর দিয়ে গুলি চালিয়েছিল।

'আমরা তোমাদের একেবারে খতম করে দেবো!' তার মেয়ে চীৎকার করে বলেছিল।

মা বিচলিত হযেছিল, মেয়ের গলার দৃঢ় স্বর সে সহ্য করতে পারছিল না।

তার মেয়েকে সে ডাকতে চাইছিল, ডেকে এনে তাকে বাজারে পাঠাতে কিংবা গৃহস্থালির কোনও মেয়েলি কাজে লাগাতে চাইছিল। সে দেখেছিল যে গাছের নিচেয় সে ছায়া খুঁজছিল তার মেয়ের পাগুলো সেই গাছের পিছনে চলে গিযেছিল, আব দেখেছিল বাচ্ছা একটা ছেলে তার পিছন পিছন ছুটে গিয়েছিল একটা হ্যান্ড গ্রেনেড হাতে নিযে।

'আত্মসমর্পণ করো।' গাছের পিছনে ধ্বস্তাধ্বতি করতে করতে বাচ্ছা ছেলেটা বলছিল। হারিয়ে যাওয়া সেই মুখটাব সন্ধানে মা চোখ বন্ধ করেছিল।

যাবার জন্য যুবকটি উঠে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু মেয়েটির দিকে সে তাকিয়েই ছিল, শেষবারের মতো তাকে দেখছিল সে। মেয়েটি হয়তো এমন কিছু বলবে বা করবে যাতে যুবকটির থেকে যেতে হবে। শুধুমাত্র আজকের মতোই নয়, বরাবরের মতো। কিন্তু কি বলতে পারে মেয়েটি? তার কাছে সব কিছুই তো আগের থেকে সিদ্ধান্ত হয়ে এসেছে। যেটা তার কাছে এসেছে সম্পূর্ণ হয়ে, তার নাগালের বাইরে, সেটাকে সে তো আর নতুন করে গড়তে পারে না। মানুষটির কিছুটা মাত্র তার কাছে রয়ে গেলো, তার নিজের মধ্যে, সেটা তাকে প্রতিপালন করতে হবে। যুবকটি আবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিল, শেষ বারের মতো তাকে স্পর্শ করতে চাইছিল, কিন্তু সে চাইছিল মেয়েটি যেন এগিয়ে আসে, নিজেকে সমর্পণ করে। কিন্তু মেয়েটি তা করেনি, আর যুবকটি চলে গিয়েছিল।

মৃতরা সব উঠে পড়েছিল আর হেঁটে চলে গিয়েছিল। দুপুরের গরমে নিজেদেব খেলায় ক্লান্ত হয়ে বাচ্ছারা চক্রাকারে ঘুরছিল। তারপর পরস্পরকে নিয়ে আর নিজেদের খেলাটার নির্বুদ্ধিতা নিয়ে হাসাহাসি করছিল। চীনাবাদামগুলোর খোসা

ছাড়িয়ে মা একটা ঝুড়ির মধ্যে রেখেছিল, ঝুড়িটাকে শক্ত করে নিজের হাঁটুব মধ্যে চেপে ধরেছিল। বাচ্ছারা সবুজ বেড়াটার ছায়ায় শুয়ে দম ফিরে পেতে পেতে যে যার নিজের জগতে চলে গিয়েছিল।

'তোমরা মরে গেছো! তোমরা মরে গেছো!' খেলাটা শেষ হবার মুখে, বাচ্ছারা তাদের উদ্ভট কল্পনাগুলো ভেঙে পড়ায় হাসাহাসি করছিল, আর মা তাদের খেলাভঙ্গ হবার পরের নীরবতাকে স্বাগত জানিয়েছিল।

মা জানতো তারা যদি আর একটা খেলা ভেবে বার করতে পারে, আর সে খেলাটা তাদের ভালো লাগে তাহলে উৎসাহের ঝোঁকে সকলে আবার লাফিয়ে উঠে পড়বে। সে রেবেকাকে ডাক দিয়েছিল আর ছাড়ানো চীনাবাদামগুলো দিয়ে তাকে বাড়ির ভেতরে পাঠিয়েছিল।

দুর্ভাগ্য

রচনা : আন্তন চেখভ

কারিগর গ্রিগরী পেত্রোভ, একজন অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পকারী এবং একজন পাকা মদ্যপ ও নিষ্কর্মা বলে সারা গালচিনো জেলায় যার সুপ্রতিষ্ঠিত খ্যাতি, তার অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে চলেছে জেমস্তভো হাসপাতালে। তাকে যেতে হবে ৩০ ভের্স্ত (দৈর্ঘ্যের রুশীয়মাপ ²/₃ মাইল) আর পথ খুবই ভয়াবহ; এমন কি ডাক হরকরার পক্ষেও পেবে ওঠা ভার, সেখানে কারিকর গ্রিগরীর মতো একজন অলস মানুষের কথা না বলাই ভালো। একটা কনকনে তীব্র বাতাস তার মুখে এসে লাগছিল। তুষারকণাগুলো বিরাট বিবাট মেঘের আকারে ঘুরপাক খাচ্ছিল, আকাশ থেকে তুষার পড়ছে না মাটি থেকে উঠছে তা' বোঝা কঠিন হচ্ছিল। তুষারের জন্য মাঠ-ঘাট, টেলিগ্রাফের পোষ্টগুলো কিংবা বনবাদাড়ও দেখা যাচ্ছিল না, আর বিশেষ করে যখন দমকা বাতাসের প্রচণ্ড একটা ঝাপটা এসে গ্রিগরীব ওপর পড়ছিল তখন স্লে-গাড়ির পাশের ডাণ্ডাগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। নিস্তেজ, জরাগ্রস্ত ঘোটকী শম্বুকগতিতে এগিয়ে চলছিল। গভীর তুষারের মধ্যে থেকে একটি একটি করে পা তুলে আনা এবং মাথা নিচু করে এগিয়ে চলার জন্য তাকে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হচ্ছিল ....। কারিগরের খুব তাড়া ছিল। সে তার আসনের ওপর অস্থিরভাবে থেকে থেকেই লাফালাফি করছিল, আর ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারছিল।

"কাঁদিস না, মাত্রিয়োনা," বিড়বিড় করে সে বলছিল। "একটু সহ্য করার চেষ্টা কব। ভগবানের ইচ্ছায় আমরা হাসপাতালে পৌঁছে যাবো, আর ওরা তোকে চটপট দেখাশোনা করবে ....। পাভেল ইভানিচ তোকে ওষুধ দেবে কিংবা ওদের বলবে তোর রক্ত বার করে দিতে, কিংবা ভাল মানুষের মতো তোকে স্পিরিট দিয়ে গা ঘষে দেবার ব্যবস্থা করে দেবে, ওটাতে যে ব্যথা কমিয়ে দেয়, সেটাতো তুই জানিস। পাভেল ইভানিচ তার যথাসাধ্য করবে ...। সে চীৎকার করবে পা ঠুকবে, আর তারপর তার সাধ্যমতো করবে ...। ভারী চমৎকার ভদ্রলোক, খুব দয়ালু, ভগবান তার মঙ্গল করুন ...। সেখানে পৌঁছবামাত্রই সে দৌড়ে তার বাড়ির থেকে বেরিয়ে আসবে আর গাল দিতে শুরু করবে 'কি ? কিসের জন্যে', সে চিৎকার করবে। আগে আসোনি কেন ? আমি কি একটা কুকুর যে সারাদিন ধরে তোমাদের মতো শয়তানদের

দেখাশোনা করবো? সকালে আসোনি কেন? বেরিয়ে যাও! কাল এসো!' আমি বলবো : 'ডাক্তার সাহেব! পাভেল ইভানিচ! হুজুর!' 'হেট্-হেট্, শয়তান কোথাকার!'

কারিগর ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে, স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে বকে চললো।

"হুজুর! ভগবান আমার সাক্ষী ...। আমি পবিত্র ক্রুশের নামে শপথ করছি যে আমি ভোর সকালে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি। ভগবান যখন রাগ করে এমন একটা তুষারের ঝড় পাঠিয়েছেন তখন সময় মতো কি করে এখানে এসে পৌছাবো? আপনি নিজেই দেখতে পাবছেন...। একটা ভালো ঘোড়াই পারতো না আর আমার ঘোড়া — তাকিয়ে দেখুন একবার! — এটা ঘোড়া নয়, এটা একটা যা তা। — পাভেল ইভানিচ, ভুরু কুঁচকে চিৎকার কবে বলবে · 'আমি তোমায় চিনি। তোমরা সব সময় একটা ছুতো খুঁজে বার করো। বিশেষ করে তুমি, গ্রিগরী! আমি তোমায় ভালো করে চিনি। মনে হচ্ছে পথে তুমি বার পাঁচেক মদেব দোকানগুলোয় থেমেছো।' আর আমি-বলবো : 'হুজুর! আমি কি একটা হৃদয়হীন পশু, একটা অধার্মিক? আমার গিন্নী মবমর, মবতে বসেছে, আব আমি কিনা মদের দোকানে ছুটবো! আপনি কি করে এসব কথা বলতে পারেন? মদের দোকান সব গোল্লায যাক।' তখন পাভেল ইভানিচ ওদেব বলবে তোকে হাসপাতালেব মধ্যে বয়ে নিয়ে যেতে। আর আমি তার সামনে নুযে পড়ে অভিবাদন করবো ঃ 'পাভেল ইভানিচ! হুজুর! আমরা বিনীতভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি! আমরা নির্বোধ এবং পাপী, আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের কড়া করে বিচাব করবেন না, আমরা তো মুজিক (রুশ কৃষক) মাত্র। আমাদের লাথি মেবে বার করে দেওযাই উচিত, আর আপনি কিনা আমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তুষারের মধ্যে বেরিয়ে আসছেন।' আর পাভেল ইভানিচ এমন ভাব করবে যেন আমাকে মারতে যাচ্ছে, আর বলবে ঃ "আমার পায়ের ওপর হুমড়ি খেযে পড়ার বদলে, তুমি বরং ভোদকা গেলা বন্ধ করো, বোকা কোথাকার, আর তোমার গিন্নীর প্রতি একটু করুণা করো। তোমাকে চাবকানো উচিত।' 'চাবকানো, পাভেল ইভানিচ, ভগবান জানেন আমাদেব চাবকানোই উচিত! কিন্তু আপনি আমাদের উপকারী, আমাদের বাপ, আপনার পায়ে না পড়ে, আপনাকে অভিবাদন না কবে থাকি কি করে? হুজুর! ভগবানের সামনে সত্য কথাই বলছি — এই কথার একচুল নড়চড় হলে আমার জিব যেন খসে পড়ে! আমার মাত্রিয়োনা এখানে যেমনি একটু ভালো হবে, যে মুহুর্তে সে আগের মতো হবে, আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে যা ফরমাশ করবেন আমি তাই বানিয়ে দেবো। একটা সিগারেট কেস, যদি বলেন ছোপ ছোপ বার্চগাছের ডাল দিয়ে, ক্রোকের বল, স্কিটল একেবারে বিদেশী জিনিসের মতো সরেস করে বানিয়ে দেবো ...। আমি আপনার জন্য সব করবো। আর আমি আপনার কাছ থেকে এক কোপেকও নেবো না।" ঐ রকম সিগারেট কেসেব জন্য মস্কোতে আপনার কাছ থেকে চার রুবল থেকে আমি এক কোপেকও নেবো না।" আর ডাক্তার হাসবে আর বলবে ঃ "হয়েছে? হয়েছে? হতেই হবে তুমি এত মদ খাও এটাই যা দুঃখের বিষয়।' ভদ্র লোকেদের সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয তা

আমি জানি গো, গিন্নী। এমন কোনো ভদ্রলোক নেই যাকে পটাতে না পারি। এখন ভগবান যদি একটু দেখেন যে আমরা যেন পথ না হারাই। তুষারের ঝড় কি রকম। তুষারই দেখতে পাচ্ছি না!"

কারিগর বিড়বিড় করে অনর্গল বকে চললো, যান্ত্রিক ভাবে বকুনি চালিয়ে গেলো, নিজের অস্বস্তি চাপা দেবার জন্য। যদিও তার কথার পুঁজি ছিল এবং ইচ্ছামতো সেগুলো ব্যবহার করার ক্ষমতাও ছিল কিন্তু তার মাথার মধ্যেকার চিন্তা এবং প্রশ্নগুলোর সংখ্যা ছিল আরো বেশি। আচম্বিতে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো দুঃখ এসে কারিগরকে চেপে ধরেছে, সে একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, সেটা আর কাটিযে উঠতে পারছে না, চিন্তা করার জন্য আবার তার স্বাভাবিক অবস্থায ফিরে যেতে পারছে না। এ যাবৎ সে একটা নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন করেছে, এক রকমের পানাসক্ত অসাড়তার মধ্যে দিয়ে, দুঃখ অথবা সুখ যে কি তা অনুভব না করেই, হঠাৎ এখন সে মনের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করছে। ভাবনা-চিন্তাহীন নিষ্কর্মা এবং মদ্যপ হঠাৎ নিজেকে এখন একজন কর্মব্যস্ত, চিন্তাবিষ্ট ব্যক্তির অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে, একজন ব্যক্তি যে একটা তাড়াহুড়ার মধ্যে রযেছে, -- প্রকৃতির বিরুদ্ধে।

কারিগরের যতদূর মনে পড়ে দুঃখের শুরু তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা থেকে। বরাবরের মতোই মাতাল হয়ে আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় যখন সে বাড়ি ফিরলো আর পুরনো অভ্যাস মতো, গাল দিতে আর ঘুঁষি ছুঁড়তে লাগলো, তার স্ত্রী এমন ভাবে তাব যন্ত্রণা দাতার দিকে তাকালো যেমন করে আগে কখনো সে তাকাযনি। তার বার্দ্ধক্যগ্রস্ত চোখদুটোর ভাব হতো একটা কুকুর, যাকে যথেষ্ট প্রহার করা হযেছে এবং অল্প পরিমাণে খেতে দেওযা হয়েছে, তার মতো লাঞ্ছিত এবং ভীরু কিন্তু এখন তাদের ভাব হলো কঠিন এবং স্থির, আইকনের ঋষিদের কিংবা মরণোন্মুখ লোকেদের চোখেব মতো। ঐ অদ্ভুত, অস্বস্তিকর চোখদুটো দিয়েই দুঃখের সূচনা হয়েছে। হতবুদ্ধি কারিগর এক প্রতিবেশীকে একটা ঘোড়া ধার দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল। আর এখন তার স্ত্রীকে সে হাসপাতালে নিযে চলেছে এই আশায় যে পাভেল ইভানিচ তার ওষুধের গুঁড়ো আর মলম দিযে বৃদ্ধার চোখদুটোয় পরিচিত দৃষ্টি ফিরিয়ে আনবে।

'দেখিস, মাত্রিয়োনা,' সে বিড়বিড় করে বললো, 'প্যাভেল ইভানিচ যদি তোকে জিজ্ঞাসা করে আমি তোকে পিটাই কি না তা হলে বলবি 'না, না, হুজুর। আর আমি তোকে আর কখনো পেটাবো না। পবিত্র ক্রুশের দোহাই আমি আর তোকে পেটাবো না তুই তো জানিস, তোকে যখন পিটিয়েছি তখন সত্যি করেই তোকে পেটাতে চাই নি। আরো ভালো কিছু করার থাকতো না বলে তোকে পেটাতাম। আমি তো তোকে ভালোবাসি। অন্য কোনো লোক হলে মাথা ঘামাতো না। কিন্তু আমি তোকে হাসপাতালে নিয়ে চলেছি ...। আমি যা পারি তাই করছি। তাও এই রকমের তুষারের ঝড়ের মধ্যে। আপনারই ইচ্ছা হে ভগবান। শুধু ভগবান যদি দেখেন আমরা যেন পথ না হারাই! তোর ব্যথা এখন কেমন, মাত্রিয়োনা? কিছু বলছিস না কেন? আমি জিজ্ঞাসা করছি — তোর ব্যথা কেমন?"

সে ভাবছিল এটা কেমন অদ্ভুত ব্যাপার বৃদ্ধার মুখের ওপরের তুষার গলছে না কেন, কেমন অদ্ভুত ব্যাপার মুখটা কেমন যেন লম্বাটে হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, আর কেমন যেন মাটির মতো পাঁশুটে রঙ, ময়লা মোমের মতো আর কি রকম কঠিন, কি রকম গম্ভীর দেখাচ্ছে।

"নির্বুদ্ধি বুড়ি!" বিড়বিড় করে কারিগর বললো। "আমি ভগবানকে সাক্ষী করে তোকে জিজ্ঞাসা করছি আর তুই ....। নির্বুদ্ধি বুড়ি! তোকে আমি পাভেল ইভানিচের কাছে নিয়ে যাবো না, হলো তো!"

কারিগর রাশ আলগা করে চিন্তায় মগ্ন হলো। কিছুতেই আর বৃদ্ধার দিকে ফিরে তাকাতে পারলো না — তার ভয় করছিল। কোনো উত্তর না পেয়ে ক্রমাগত তাকে প্রশ্ন করে যেতেও তার ভয় করছিল। শেষকালে, এই উৎকণ্ঠায় ভরা অনিশ্চয়তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে, বৃদ্ধার দিকে না তাকিয়ে সে বৃদ্ধার ঠাণ্ডা হাতখানা অনুভব কবলো। সে হাতখানা যখন ছেড়ে দিলো তখন ওটা একটা পাথরের মতো ধপ করে পড়ে গেলো।

"ও তো মরে গেছে। হায় রে হায়!"

কারিগর কাঁদতে লাগলো। সে যত না বেশি দুঃখ পেয়েছিল তার বেশি হয়েছিল বিরক্ত। এ জীবনে সব কিছুই ঘটে কতো দ্রুতগতিতে, সে নিজের মনে ভাবছিল। তার দুঃখ সবে শুরু হতে না হতেই সব কিছু শেষ হয়ে গেলো। তার স্ত্রীর সঙ্গে সবেমাত্র বসবাস করা, তার সঙ্গে মনের কথা বলা তাকে যত্ন করা শুরু করতে না করতেই সে মারা গেলো ...। চল্লিশ বছর সে তার সঙ্গে বাস করেছে, আর সেই চল্লিশটা বছর যেন এক ধরনের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে। আর যখন সে বুঝতে পারলো তাকে সে ভালোবাসে, তাকে ছাড়া সে থাকতে পারবে না, তার ওপর সে অত্যন্ত অন্যায় করেছে, ঠিক তখনই তার স্ত্রী মারা গেলো।

"তাকে ভিক্ষা করতে হতো," কারিগরের মনে পড়লো। "আমিই তাকে রুটির জন্য ভিক্ষা করতে পাঠাতাম, হ্যাঁ আমিই তাকে পাঠাতাম! হায়, হায়! নির্বুদ্ধি বেচারা আরো দশ বছর হয় তো বাঁচতো, আর এখন সে মনে করছে আমি সত্যিই ঐ রকমের লোক। হায় গো মা, কোথায় চলেছি আমি? ওর এখন প্রয়োজন কবর দেবার, ডাক্তারের নয়! হেট্-হেট্!"

গ্রিগরী ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে তার সর্বশক্তি দিয়ে চাবুক মারলো। প্রতিটি ঘণ্টায় পথ দুর্গম থেকে দুর্গমতর হয়ে উঠতে লাগলো। এখন আর স্লে-গাড়ির দাণ্ডাগুলো একেবারেই দেখতে পাচ্ছিল না। থেকে থেকেই স্লে-গাড়িটা (তুষারের ওপর দিয়ে চলার জন্য চাকাবিহীন গাড়ি বিশেষ) এক একটা ছোট ফার গাছের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছিল, কালো মতো কি একটা জিনিসে কারিগরের হাত ছড়ে দিলো আর তার চোখের সামনে দিয়ে চকিতে সরে গেলো, আরো একবার, একটা ঘূর্ণায়মান শুভ্রতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।

"একবার শুধু যদি নতুন জীবন শুরু করা যেতো ....।' কারিগর ভাবছিল।

তার মনে পড়ছিল চল্লিশ বছর আগে মাত্রিয়োনা কেমন অল্প বয়সী, সুশ্রী, হাসিখুশি ছিল, সে এসেছিল বেশ সমৃদ্ধশালী বাড়ি থেকে। তারা তার সঙ্গে মাত্রিয়োনার বিয়ে দিয়ে ছিল তার পটুত্বের জন্য। সুখী জীবনের প্রয়োজনীয় সব কিছু তাদের ছিল, কিন্তু তাদের বিয়ে হয়ে যাবার ঠিক পর মুহূর্তেই মত্ত অবস্থায় সেই যে সে স্টোভের তাকের ওপর শুয়ে পড়ে, তারপর আর ঠিক মতো জেগে উঠতে পারেনি সে। বিয়ের কথা তার মনে আছে, কিন্তু তারপরে যে কি হলো শুধু মদ্যপান করা, ঘুমনো আর মারামারি করা ছাড়া তা আর সে কিছুতেই মনে করতে পারে না, আর তাই চল্লিশটা বছর নষ্ট হয়ে গেলো।

ঘূর্ণায়মাণ তুষারের সাদা মেঘগুলো ক্রমে ক্রমে ধুসর হয়ে যেতে লাগলো। সন্ধ্যা নামছে।

"কোথায় চলেছি আমি?" কারিগর আবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করলো। "ওকে এখন আমার কবর দিতেই হবে, আর আমি কি না হাসপাতালের দিকে চলেছি। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়।"

আবার সে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলো, আবার তাকে চাবুক মারলো। ঘোড়াটা সব শক্তি জড়ো করে ফোঁস ফোঁস করতে দুলকিচালে চলতে শুরু করলো। কারিগর বারবার তাকে চাবুক মারতে লাগলো ...। তার পিছনে কোথায় যেন ঠকাস করে একটা শব্দ শুনতে পেলো আর ফিবে না তাকিয়ে সে বুঝলো মৃতদেহের মাথাটা স্লে-গাড়ির গায়ে ঠোকা খাচ্ছে। আরো অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগলো, বাতাস শীতলতর আর তীব্রতর হয়ে যেতে লাগলো ....।

"আবার জীবন শুরু করলে," কারিগর ভাবছিল। "আমি নতুন যন্ত্রপাতি কিনবো, ফরমাশ নেবো ..... আর মাত্রিয়োনাকে পয়সাটা দেবো ... ... হ্যাঁ সেটা আমি দেবোই দেবো।"

আর তারপর তার হাত থেকে লাগাম পড়ে গেলো, আবার সেটা তুলে নেবার চেষ্টায় সে খুঁজতে আরম্ভ করলো, কিন্তু বৃথাই; হাতগুলো আর তার নড়ছিল না।

"যাকগে," সে ভাবছিল। "ঘোড়াটা নিজে নিজেই যাবে, ওতো রাস্তা চেনে। এখন একটু যদি ঘুমিয়ে নিতে পারি ... ... অন্ত্যেষ্টি আর উপাসনার আগে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারি।"

কারিগর চোখ বুঁজে ঝিমোতে লাগলো। একটু বাদেই সে শুনলো ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। চোখ মেলে সে দেখলো একটা কুঁড়ে ঘর কিংবা একটা খড়ের গাদার মতো অন্ধকার মতো কি একটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সে বুঝতে পারলো যে তার এখন স্লো-গাড়ি থেকে নেমে সে এখন কোথায় এসেছে তা খোঁজ করা উচিত, কিন্তু তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এমন একটা অবসাদ যে সে এমন কি বরফে জমে মরার থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যও নড়তে পারতো না ... ...। সে শান্তিতে ঘুমোতে লাগলো।

তার ঘুম ভাঙ্গলো সাদা চুণকাম করা দেওয়াল-ওয়ালা একটা বড় ঘরের মধ্যে।

জানলা দিয়ে ঝক্‌ঝকে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। কারিগর দেখতে পাচ্ছিল ঘরের মধ্যে লোকজন রয়েছে আর তার প্রথম চিন্তা হলো গাম্ভীর্য্য এবং বিজ্ঞতার ভাব দেখানো।

"গিন্নীর জন্য আমাদের উপাসনার ব্যবস্থা করতে হবে," সে বললো। "যাজককে খবর দিতে হবে।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে! তুমি এখন স্থির হয়ে থাকো", একটা কণ্ঠস্বর তাকে বাধা দিলো।

"আরে, এ যে পাভেল ইভানিচ," হঠাৎ ডাক্তারকে দেখে অবাক হয়ে কারিগর চিৎকার করে উঠলো। "হুজুর!" মা বাপ!"

সে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চিকিৎসা বিজ্ঞানীর সামনে সাষ্টাঙ্গ হতে চেষ্টা করলো, কিন্তু অনুভব করলো তার হাত পাগুলো তার আজ্ঞা মানছে না।

"হুজুর। আমার পাগুলো কই? আমার হাতগুলো কই?"

"তোমার হাত-পাগুলোকে বিদায় দাও ... ...। তাদের তুমি বরফে জমিয়ে দিয়েছো। হয়েছে, হয়েছে, তুমি কাঁদছো কেন? তোমার জীবন তো কাটিয়ে দিয়েছো, তার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দাও! তোমার বয়স তো বোধ করি ষাটের ওপর, তোমার দিন তো কেটে গেছে।"

"হায় কি দুর্ভাগ্য! কি দুর্ভাগ্য, হুজুর! আমাকে ক্ষমা করুন! যদি আর ছ'টা বছর মাত্র বাঁচতে পারি!"

"কিসের জন্য?"

"ঘোড়াটা আমার নয়, ওটা তো ফেরত দিতে হবে ..... আমার গিন্নীকে কবর দিতে হবে। ওঃ, এ জগতে কত তাড়াতাড়ি সব কিছু ঘটে যায়। হুজুর! পাভেল ইভানিচ্। সব থেকে ভালো ছোপ ছোপ বার্চের একটা সিগারেট কেস। আপনাকে একটা ক্রোকে সেট বানিয়ে দেবো। ... ...।"

হাত নেড়ে ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। কারিগরের সব শেষ।

বিবাহ

লি ওয়েন উয়ান

আজ দু'তিনদিন ধরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি চলেছে, কখনো খুব ঘন, কখনো বা হালকা কিন্তু আগাগোড়াই, মাঠে কাজ করার থেকে গ্রামবাসীদের দূরে রাখার পক্ষে সে বৃষ্টি যথেষ্ট। তারা সব অস্থির হয়ে উঠছে।

বৃষ্টিবহুল দিনগুলোর জন্য লিয়েন-নিউ যে অবকাশটুকু পেয়েছিল সেটুকু সে একজোড়া জুতো বানানোর কাজে লাগিয়েছিল।

সকালে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য উঁকি মারলো। বৃষ্টির পরে সব কিছু যেন আরো ঝকঝকে লাগছিল মেয়ে-পুরুষ সকলের মন সজীব, উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

মাঝের ঘরের একটা নিচু চেয়ারে বসে লিয়েন-নিউ জুতোজোড়াটার গায়ে সস্নেহে হাত বোলাচ্ছিল। জুতোজোড়াটা বেশ ভালোই হয়েছে। মনের মধ্যেটা তার কেমন একটা আনন্দে ভরে উঠলো। মনে মনে ভাবছিল সে, "আকাশটা পরিষ্কার হয়ে আসছে, জুতোজোড়াও তৈরি হয়ে গেলো। আবার যখন ও মাঠে কাজ করতে যাবে তখন পায়ে ওটা পরতে পারবে অন্তত।" এই কথা ভাবতে ভাবতে তার মনের মধ্যে বলিষ্ঠ এক যুবার চেহারা ভেসে উঠলো। পায়ে তার মজবুত করে বানানো জুতোজোড়া ; লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে চলেছে মাথা উঁচু করে, অসাধারণ মর্যাদায় ভরা সে চেহারা। তার ঠোঁটের কোণায় মৃদু একটা হাসি খেলে গেলো। হাসিটুকু ফুটতে না ফুটতেই ও নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। যেন ভয় পেলো কেউ যদি তার মনের গোপন কথাটি জানতে পেবে যায়, আপনা থেকেই সে তাকালো বাড়ির একেবারে শেষের ঘরের দিকে—তার মার দিকে—সকলেই তাকে ইউয়ান মা বলে। মা জল রাখার পাত্র ধুচ্ছে দেখে তার চমক ভাঙলো, তখনি তার খেয়াল হলো দুপুরের রান্নার সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি তার সেলাইয়ের থলির মধ্যে জুতো জোড়াটা গুঁজে রেখে, পরনের নীল রঙের সুতোর পোশাকের গায়ে লেগে থাকা সুতোর টুকরোগুলো ঝেড়ে ফেলে দিলো।

"জুতোটা শেষ করেই যাচ্ছিলাম জল আনতে" সে হেঁকে বললো।

"বাইরে ভীষণ কাদা, ইউয়ান মা বললো, দু'এক বালতি শুধু। তাহলেই কাজ চলে যাবে।

"ঠিক আছে।" উত্তর দিতে দিতে সে তার রবারের বুটজোড়া পরে নিযে বালতি ঝোলানো বাঁকের ডাণ্ডাটা কাঁধের ওপর তুলে নিলো। মাথা ঝাঁকিয়ে নীল ফিতে বাঁধা লম্বা লম্বা বিনুনী দুটো পিছনে সরিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো।

পাঁচিলের কোনটাতে আসতেই দেখলো উল্টোদিক থেকে আসছে উঁচু গালের হাড়, স্বাস্থোজ্জ্বল লালচে পায়ের রঙ, লম্বা এক যুবক, পিছলা মাটির ওপর দিয়ে কষ্ট করে চলার সময় শবীরটা তার এ পাশে ওপাশে হড়কে হড়কে যাচ্ছে। যুবকটি হলো চুং-সিয়াঙ, আসছিল সে লিযেন নিউ এর বাড়ি, সেখান থেকে তার "হ্যান্ড বুক অব মিউচ্যুয়াল এড অ্যান্ড কো-অপারেশন" (পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর তথ্য পুস্তিকা) বইটা নিতে আর সেইসঙ্গে পরের দিন পোকা মারতে তুলোর খেতে যাবার কথা আছে সেই নিয়ে লিয়েন-নিউ-র সঙ্গে পরামর্শ করতে। কিন্তু আসল কথা হলো, ইদানীং যে কোন ছুতোয় লিযেন-নিউ-এর ওখানে যেতে তার বেশ ভালো লাগছিল। এখন কোনাটা ঘুরতেই দুজনে দুজনের মুখোমুখি হলো। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই দেখে চুং-সিযাঙ চুপি চুপি বললো "বড্ড কাদা। আমি তোমার জল তুলে দিচ্ছি। তুমি বাড়ি গিযে আমার "হ্যান্ড বুক অব মিউচ্যুযাল এড অ্যান্ড কো-অপাবেশন" বইটা নিযে এসো। আমি আর একবার ওটা পডতে চাই।" কথা বলতে বলতে সে নিজের পায়ের দিকে তাকালো। "আমার বুটেব দিকে একবার চেযে দেখো।" সে বলে চললো, "কাদায় একেবাবে ভর্তি হয়ে গেছে। বালতি নিয়ে যেতে গেলে তুমি পড়ে যাবে।

লিযেন-নিউ বড় জেদী। কেউ যদি কখনো তাকে বলতো কোনো কাজ তার সাধ্যের অতিরিক্ত তাহলে সে ভীষণ চটে যেতো। "পথ ছাড়ো!" কিছুটা হেসে কিছুটা রাগতভাবে সে বললো। "আমি পারি কিনা তা দেখা যাবে তখন!" চুং সিয়াঙ একটু ইতস্তত করতেই, লিয়েন-নিউ তার পাশ কাটিয়ে নিজের কাজে চললো। এক পা এগিযেই সে তাড়াতাড়ি পিছু ফিরলো। "বাড়িতে একজোড়া জুতো রেখে এসেছি, "সে নিচু গলায় বললো। "গিয়ে একবার পরে দেখো, পায়ে হয় কিনা।" কথাটা বলেই সে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলো। কি করবে ঠিক করতে না পেরে চুং সিয়াঙ এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো, তারপর তার পিছু পিছু পা চালিয়ে দিলো। লিয়েন-নিউ সবেমাত্র তার দ্বিতীয় বালতিতে জল ভরা শেষ করেছে এমন সময় সে গিযে উপস্থিত হলো। বাঁকের দাণ্ডাটা কাঁধে তুলে নিয়ে বালতি দুটো দুপাশে ঝুলিয়ে দিলো তারপর সে বয়ে নিয়ে চললো।

জল রাখার পাত্রে বালতি দুটোর জল ঢালা হলে, লিযেন-নিউ একটা চেযার টেনে নিয়ে এলো তারপর তাকে বললো বসে একটু জিরোতে। এমন সময় দেখলো তার মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা পাত্রের মধ্যে ভাত রাঁধছে, হাসিমুখে চেঁচিয়ে তার মাকে ডেকে সে বললো, "মাগো, চু-সিয়াঙকে জুতোটা আমরা দেবো না কি?"

"নিশ্চয়", মা উত্তর দিলো।

"ও ইউনান মা, 'লজ্জিত ভাবে চু-সিয়াঙ বললো, "আমার খুবই উপকার হলো, কিন্তু... !"

ইউয়ান মা ওর দিকে সস্নেহে তাকিয়ে একটু হেসে বললো, "হয়েছে, হয়েছে বাছা, আর একটা কথাও নয়। তুমি আমাদের কর্মীদলেই রয়েছো, সেটা তো এক পরিবারের থাকারই শামিল। আমাদের সঙ্গে পরের মত ব্যবহার করো না। একটু থেমে সে বলতে লাগলো, "যতই হোক, খেতের কাজই বলো আর বাড়ির কাজই বলো কতবার তুমি আমাদের সাহায্য করছো। এ আদান প্রদান তো খুবই ন্যায্য কাজেব বিনিময়ে কাজ— জুতোটা নাও নিয়ে পরো।"

চুং-সিয়াঙ জুতোটা পরে দেখলো। তার পায়ে একেবারে ঠিক হয়েছে দেখে লিয়েন নিউ ভারী খুশি। ওরা তিনজনে তখন গল্প শুরু করলো অনেক কিছু বিষয় নিয়ে।

"উচ্চ-ফলনশীল এলাকাগুলোয় তুলোর ফসল তোমার একবার দেখা উচিত," একগাল হেসে ইউয়ান মা বললো। এক একটা বীজকোষ যেন এক একটা ডিমের মতো বড়। দেখলেও ভালো লাগে। লোকে বলে "তুমি জমিকে দেখলে জমি তোমায় দেখবে। সেটা খুবই সত্যি।" একটুক্ষণ থেমে সে আবার বলতে লাগলো, "তুমি আমাদের দলটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছো বলেই না, তা না হলে আমাদের ফসল আগেকার দিনের ফসলের অর্ধেকও হতো কি? ভেবে চিন্তে সেচের যে সব খাল কাটিযেছো, সে গুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখো। হ্যাঁ! এবার তো তোমারই করা!"

চুং-সিয়াঙ আপত্তিসূচক ভাবে হাসলো "ইউয়ান মা, আমাকে তুমি বড্ড বেশি কৃতিত্ব দিচ্ছো, সে উত্তর দিলো। তারপর আরো গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলতে লাগলো, 'জানো এটাতে আমার মনে পড়ছে সেই কথাটা 'আমরা সংগঠিত না হলে এই শুষ্ক জমিকে আমি, একা কি করে জল সঞ্চিত খেতে 'পরিণত করতে পারতাম?' তারপর সে আবার হেসে বললো, তার ওপর আবার....., আবার লিয়েন নিউও আছে। কত তাড়তাড়ি সে পড়তে শিখে গেছে। এর ওপর তার আবার উৎসাহও রয়েছে। গত বছর তুলো চারা ছাঁটার ব্যাপারে ও কি করেছিল মনে আছে? আমাদের দলের মধ্যে আমরা অনেকেই ওর সেই পরিকল্পনায় সায় দিতে পারছিলাম না। লিয়েন নিউ আর ফেঙ ল্যান যদি না দেখাতে পারতো যে ওটা কার্যকরী করা যায় তাহলে অন্যদের দিয়ে ওটা পরীক্ষামূলকভাবে কাজে লাগানো একেবারেই সম্ভব হতো না। সত্যি বলতে কি, আমাদের খুবই কপাল ভালো যে লিয়েন নিউকে আমরা সঙ্গে পেয়েছি, এত রকমের ভালো ভালো পরিকল্পনা ওর মাথায় আসে, তা না হলে...।

"অনেক হয়েছে, এখন," লিয়েন নিউ চুং-সিয়াঙকে বাধা দিয়ে বললো। "এতক্ষণ ধরে মা তোমার সুখ্যাতি করলো তুমি এখন সেইটাই পালটা দেবার চেষ্টা করছো!"

ইউয়ান মা পর্যন্ত হেসে ফেললেন।

[illegible] যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন চুং-সিয়াঙ লিয়েন-নিউ কে বললো গত দু-তিন দিনের বৃষ্টির পরে ফলগাছগুলিতে আবার পোকা লেগেছে।

"খুব বেশি?" সচকিত হয়ে লিয়েন নিউ জিজ্ঞাসা করলো।

"না, অল্প," চুং-সিয়াঙ উত্তর দিলো।

"তাহলে আজকেই চলো কিছু পোকা মারা ওষুধ জলে মিশিয়ে নিই। কালকের মধ্যে জমিতো কিছুটা শুকিয়ে যাওয়া উচিত, তা যদি হয় তাহলে গাছগুলিতে কালকেই ওষুধ ছিটাতে পারবো।"

আবো কিছুক্ষণ তাদের আলোচনা চললো। তারপর হ্যান্ড বুক অন মিউচ্যুযাল এড ফান্ড কো-অপারেশান" বইটা আর তার মনের মতো করে বানানো জুতোজোড়াটা নিয়ে চুং-সিয়াঙ বিদায় নিলো।

রাত্রে দক্ষিণে বাতাস উঠলো। পরের দিন আকাশ একেবারে পরিষ্কার, কোথাও মেঘের এতটুকু চিহ্নও ছিল না। রাতের বাতাসে আর সকালের রোদে বালু মেশা জমি পায়েব নিচে বেশ শক্ত হয়ে গেলো।

স্প্রেযার (ওষুধ ছিটোবার পিচকারী) নেবার জন্য চুং-সিয়াঙ এসেছিল লিয়েন-নিউর বাড়িতে। লিয়েন-নিউ তখন সবেমাত্র মাটির জালা থেকে হাতায করে খানিকটা পোকামারার ওষুধ তুলে নিয়ে জলের বালতিগুলোয় দিয়ে খেতে যাবাব জন্য তৈরি হযেছে এমন সময় শোনে বাইরে থেকে কে যেন তাদের ডাকছে।

"চুং-সিয়াঙ! লিয়েন-নিউ!" দেখে ফেঙ ল্যান ওদেরই দলের একজন কর্মী। "সবাই এসে গেছে তাড়াতাড়ি করো, তোমাদের জিনিসপত্র সব নিয়ে এসো।"

"আস... ছি! আস...ছি!" লিয়েন-নিউ উৎফুল্লমনে চীৎকার করে উঠলো।

একটা ডাণ্ডার মধ্যে পোকামারাব ওষুধের বালতিগুলো ঝুলিয়ে চুং-সিযাঙ সেগুলো বয়ে নিয়ে চললো আর লিযেন-নিউ নিলো স্প্রেয়ারটাকে তার কাঁধে ঝুলিয়ে। বাড়ি থেকে বেরুতেই দেখে কে একজন তাদের দিকে আসছে। লোকটা নিজের মনেই বিড় বিড় করছে, "কি করে পোকা হতে পারে ওখানে! হুম... শুধু শুধু কতকগুলো হই চই করা।"

লোকটা হলো গুঁফো লি, তার বয়স হবে বছর পঞ্চাশ। সরু ঠোঁটের ওপর মাত্র কয়েক গাছি লোম, অভাগার মতো ঝুলে রয়েছে। এক সময় ও ছিল গরু বাছুর বেচাকেনার ছোটখাটো ব্যাপারী, সেই সঙ্গে আবার খেটে খাওয়া মানুষও বটে। ভূমি সংস্কারের সময় তাকে সঙ্গতিপন্ন মাঝারি কৃষক বলে তালিকাভুক্ত কবা হয়। ও হলো লিয়েন-নিউ এর মামা।

চুং-সিয়াঙের চরিত্রের একটা দিক ছিল বেশ অদ্ভুত। রক্ষণশীল চিন্তাধারার যে কোনো লোকের সঙ্গেই সে তর্ক করতে ভালোবাসতো, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সে সোজা প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখের দিকে তাকাতো। লোকটার কথার ভাবে মনে হলো কিছু একটা ঘটেছে। গুঁফো লির সঙ্গে সোজাসুজি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে সে জলের বালতিগুলির বাঁকটা তার কাঁধে থাকা সত্ত্বেও, থমকে দাঁড়ালো। কিন্তু ফিরে দেখে লিযেন-নিউর মা দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে ভাইকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে তখন সে আর তার সামনে কোনো রকম তর্কাতর্কি করতে চাইলো না। ঠিক সেই সময়েই পিছন থেকে সে লিয়েন-নিউর গলা শুনতে পেলো, তাকে সে বলছে,

"তাড়তাড়ি করো, চলো এবার। আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ফেঙ-ল্যান অন্যেরা সব একেবারে বিরক্ত হয়ে গেলো।" তারপর তার কানে এলো লিয়েন-নিউর স্নেহভরা কণ্ঠ, "মামা, তুমি এসেছো। ফিরে গিয়ে তোমাকে এক কাপ চা পর্যন্ত করে দিতে পারলাম না। বলে খারাপ লাগছে, কিন্তু কি করি বলো, দলের বাকি সকলে আমাদের জন্য মাঠে অপেক্ষা করে আছে। তবে মা বাড়ি আছে। তুমি ভেতরে যাও।" তারপর বুদ্ধি করে দরজার দিকে চেয়ে তাকালো "মাগো মামা এসেছে। ভালো করে একটা ডিম ফেটিয়ে গরম জল আর চিনি মিশিয়ে মামাকে খেতে দাও কথাটা বলে কিছু হাঁটতে হাঁটতে, কিছুটা লাফাতে লাফাতে তাড়াতাড়ি সে মাঠের দিকে চললো।

লিয়েন-নিউর বয়স যখন বারো বছর তখন তাব বাবা মারা গেছে, মরাব সময় তার বা তার মার জন্য একফোঁটা জমি কিংবা মাথার ওপব এক টুকবো ছাদও বেখে যায়নি। নিজেদের এমনি অসহায় সম্বলহীন অবস্থা গুঁফো লির বাড়ি গিয়ে তারা ছিল। সেই কটা বছর ঘরকন্নার কাজ থেকে আরম্ভ করে খেতের কাজ পর্যন্ত এমন কোনো কাজ ছিল না যা ইউয়ান মা করেনি। বাড়তি একজন মজুরের মতই কাজেব ছিল সে। লিয়েন-নিউ যদিও তখন নেহাতই ছেলেমানুষ তবু গোরুবাছুর চরানো ঘাস কাটা, জ্বালানি কাঠ কুড়োনো— এক কথায়, সে একটা পূর্ণ বয়স্ক লোকের অর্ধেক কাজ করতো। মা বা মেয়ে কেউই আয়েস করে তাব ঘাড়ে বসে খাচ্ছে না দেখে গুঁফো লিব মোটামুটিভাবে অভিযোগ করার আর কিছুই ছিল না। যতই হোক, ওবা তার আপনার লোক নয় কি? কিন্তু তা হলে কি হবে ওব একটা অভ্যাসই ছিল বোন আর তার মেয়ের জন্য যা কিছু সে করছে তা নিয়ে সব সময় বড়াই করা আর আত্মীয় স্বজনের কাছে সবিস্তার সে সম্বন্ধে গল্প করা। আর তার বউয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইউয়ান মার সামনে বা আড়ালে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা। তার মন্তব্যগুলো সবছিল এই ধরনেব "মেয়ের বিয়ে হলে মেয়ে তখন অন্য পরিবারের লোক হয়ে যায়" কিংবা ওদের লক্ষ্য করে বলতো "যারা লোকেব ঘাড়ে বসে খায় আর কোনো কাজ করে না।" এই ধরনের কোনো না কোনো কটু কথার অভাব তাব কখনো হতো না। এর ফলে স্বভাবতই ভাইয়ের বাড়িতে ইউয়ান মার জীবন একেবারে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল।

তারপর এলো ১৯৪৮ সাল— আর শোষণ থেকে মুক্তি। মেয়েকে নিয়ে সে তার নিজের গ্রামে ফিরে গেলো। ভূমি সংস্কারের সময় এককালে জমি মিললো তার, তখন সে নিজের সংসার পেতে বসলো। লিয়েন-নিউ-র বয়স তখন পনেরো, আর গুঁফো লির হুকুমে তার মাসতুতো ভাই, অর্থাৎ তার মার ছোট বোনের ছেলের বাগ্‌দত্তা।

নতুন সমাজে বেশ স্বচ্ছন্দেই জীবন কাটাতে লাগলো, দেখতে না দেখতে তিনটে বছর কেটে গেল লিয়েন নিউ এখন পূর্ণবয়স্কা তরুণী। দারিদ্র্য ও সংগ্রামের কঠোর শিক্ষালয়ে শিক্ষালাভ করে সে প্রাণ প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ একজন দক্ষ কর্মী। নতুনকে

আয়ত্ব করার ব্যাপারে সে ক্ষিপ্র, গ্রামের ও ইউথ লীগের (যুব সংগঠন) অত্যন্ত সক্রিয় সদস্যাদের একজন।

গত শীতকালে গ্রামের লোকেরা কর্মচাঞ্চল্যহীন শীতের দিনগুলো বাঁধ মেরামতের কাজে লাগিয়েছিল। কাজটা তখন প্রায় সমাপ্তির দিকে। সে দিনটা ছিল বেশ গরম—কাজের শেষ দিন সেটা। গ্রামের লোকেরা বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছিল। লিযেন নিউ, ফেঙল্যান ও আরো কয়েকটি মেয়ে বাঁধের গাযে হেলান দিযেছিল আর চুং-সিয়াঙ ছিল তাদের পাশে দাঁড়িযে। মেয়েরা নুড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করছিল, হঠাৎ চুং-সি[illegible] বাঁধের গায়ের মাটির ওপর একটা চিড় দেখতে পেলো। কোনো কিছু চিন্তা না করেই সে পিঠ দিয়ে বাঁধের গাযে ঠেকা দিলো। তারস্বরে চীৎকার করে উঠলো "পালাও! পালাও!" মেয়েরা সরে যেতে না যেতেই হুড়মুড় করে মাটি ভেঙে পড়লো। চুং-সিয়াঙ পিঠে খুবই আঘাত পেলো।

এই ঘটনার পর থেকে লিয়েন-নিউ চুং-সিয়াঙের প্রতি একটু অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। অন্যের অগোচরে কখনো সে তাকে একজোড়া জুতো বানিয়ে দিতো, কখনো বা খেতের কাজ করতে কবতে গরম চা ঢেলে ঠাণ্ডা করে তাকে ডাকতো এসে চা খেয়ে যাবার জন্য। চুং-সিযাঙও যখন লিযেন-নিউ-র সঙ্গে থাকতো তখন কেমন একটা উদ্দীপনার ভাব অনুভব করতে আরম্ভ করলো। যদি কোনো কাজ কবার থাকতো তাহলে সব সময লিয়েন-নিউই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিযে আসতো সে কাজ করতে। এটাতে চুং-সিয়াঙের যেন নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হতো, তার মনে হতো সে যেন লিযেন নিউ-ব কর্মশক্তি থেকে নতুন করে শক্তি লাভ করছে। পবস্পবের প্রতি ওদের মনের ভাব যে একই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তবু ওরা কেউই এ বিষয নিয়ে কথা বলতে চাইতো না।

তাদের গোপন কথা, গ্রামের প্রায় সকলেই আন্দাজ করেছিল, বিশেষ করে তরুণের দল, এটাকে তাদের নিজেদেব ব্যাপার বলে মনে করতো আর ওদের কথা ভেবে খুশি হতো। সকলেই মনে করতো ওদের দুজনকে মানাবে ভালো।

গুঁফো লিও লক্ষ্য করছিল ওই দু'বছর তার ভাগ্নী কিরকম পরস্পরকে সাহায্য করার যে দল তৈরি হযেছিল তাতে যোগ দিযেছে, নিযমিতভাবে সভাগুলিতে গেছে, রাজনীতিক শিক্ষার ক্লাসে নাম লিখিয়েছে, আর প্রায়ই জেলা কাউন্টি (দেশের প্রশাসনিক বিভাগ বিশেষ) দপ্তরগুলির সঙ্গে কাজ কারবার, চালাচ্ছে। আরো কি, গত দুবছরে বিবাহ আইনের উদয় হযেছে— তারপর থেকে অল্প বযসী ছেলে মেয়েদের মুখে সেই একই কথা। চুং-সিয়াঙ ও লিয়েন-নিউ-এর ব্যাপারটা সেও লক্ষ্য করেছে, আর বেশ বিচলিতও হযেছে। ধরো, তার ভাগ্নী যদি তার মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙেই দেয়? আজ সে উত্তরের গ্রামে তার মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরছিল, অবস্থাটা কি তা জানবার জন্য ইচ্ছে করেই বাজিযে দেখতে এলো। তার বিশ্বাস মাসীকে শ্বাশুড়ি হিসাবে পাওয়ার থেকে ভালো আব কিছু হতে পারে না—কার্যত দুটো সম্পর্ক— আর এতো সবই লিয়েন-নিউ-র মঙ্গলের জন্য। তাছাড়া এ

সম্বন্ধ তো তার নিজের ঠিক করা, যদি লিয়েন-নিউ-র সঙ্গে গুঁফো লির ছোট বোনের ছেলের বিয়ে না হয়— তবে নিজের পছন্দ করা ছেলে। নাহলে তার মুখটা থাকবে কোথায়? তার ওপর, লিয়েন-নিউ যখন এতটুকু বাচ্চা তখন থেকে সে কি তাকে দেখাশোনা করেনি? সে তার মামা তো বটেই কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তার বাপের স্থানও কি সে নেয়নি? লিয়েন-নিউ-র উচিত কথা শোনা, লিয়েন-নিউ-র যাতে ভালো বিয়ে হয় এটা দেখার তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। "হুম! বিধবা আর 'বাপমরা বাচ্চা", সে নিজের মনে প্রায়ই বলতো,"জগতটা চেনে না।" তার বিশ্বাস ভাগ্নীর বিয়ে ঠিক করা তার অবশ্য কর্তব্য।

সত্যি বলতে কি, বিবাহ আইন আজ এক বছরের ওপর হলো চালু করা হয়েছে, গুঁফো লি যে সেটা জানতো না তা নয়। কিন্তু এই ব্যাপারে তার নিজস্ব কতগুলো ধারণা ছিল। সে মনে করতো এই আইন "মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার প্রচলিত অবস্থা" নষ্ট করে দেবে। তার পূর্ব-পুরুষদের আমল থেকে এমন কোনো বিয়ে কি কখনো হয়েছে, যেটা ঘটকে ঠিক করেনি? এমন কোনো মেয়েছেলের কথা কি কখনো শোনা গেছে তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একই পুরুষ মানুষকে মেনে চলে নি? এখন সে যখনই ছেলে মেয়েদের এক সঙ্গে দেখে তখনই মাথা নেড়ে বলে, "কমিউনিস্টদের সবই ভালো তাদের এই বিবাহ আইন ছাড়া, ওটাতেই আমার গা গুলিয়ে ওঠে।" সত্যি, গুঁফো লি-র নিজের মেয়ে প্রতি তিন দিনের মধ্যে দু'দিন তার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতো। কিন্তু গুঁফো লি অতটা সেকেলে বলে উলটে তার মেয়েকেই বক্‌তো, "তোমার শ্বাশুড়ির পরিবারের লোকদের মন রেখে যদি চলতে না পারো তবে আমার বাড়ির চৌকাঠ তুমি মাড়াবে না।" এমনি ধারা লোক বলে, সে যখন তার বোনের বাড়ি আসতো তখন মা ও মেয়ের সামনে প্রায়ই এই ধরনের সব আবোল তাবোল কথা বলতো। মাঝে মাঝে ইউয়ান মা তাকে আর ঘাঁটাতো না, আর অন্যান্য সময় হ্যাঁ ও নয় আবার না-ও নয় গোছের দু'একটি মন্তব্য করতো। লিয়েন নিউ-এর পক্ষে অবশ্য চুপ করে থাকাটা অসম্ভব বলে মনে হতো, মাঝে মাঝে সে তর্ক করতো, আবার মাঝে মাঝে ঐ বিষয়ে কথা তুলে যাচ্ছে দেখলেই কোন একটা ছুতো করে পালিয়ে যেতো।

দরজার কাছে বসে, তার পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে গুঁফো লি বললে, "লিয়েন নিউ-র মাসী তোমাকে বলতে বলেছে যে বিয়েটা সে তাড়াতাড়ি দিতে চায়।

ইউয়ান মা একটু ইতঃস্তত করলো। "সে কি, মেয়েতো এখনও বড় হয়নি," সে বললো। "এই প্রশ্ন আলোচনার আগে আমরা আরো ক'টা বছর নিশ্চযই অপেক্ষা করতে পারি।

গুঁফো লি-র কাছে সবটাই পরিষ্কার ঠেকলো ইউয়ান মার মুখের মেঘাচ্ছন্নভাব, কথাগুলো কেমন সংযত। "এও কি সম্ভব যে হাওয়া বদলে গেছে?" পাইপে আরো কয়েকটা টান দিয়ে সে জোরে বোঝানোর ভঙ্গিতে বললো, "বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। তাহলে তোমার আমার, দুজনেরই মন শান্ত হয়। দেখতেই তো

পাচ্ছো মেয়েটা ধিঙ্গি হয়ে বেড়াচ্ছে। এইভাবে বেশি দিন চললে কি যে হয় কে বলতে পারে?

শুধু আমাকে একাই তো আর সে লজ্জার ভার বইতে হবে না। তাই নয় কি?"

কথায় বলে "অস্থির সঙ্গে মজ্জার সম্পর্ক যতটা নিকট, অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ক ঠিক ততটাই নিকট।" মেয়ে হচ্ছে মার অতি আপনজন। ইউয়ান মার পক্ষে এটা আরও বেশি সত্যি, লিয়েন নিউ যে তার একমাত্র সন্তান। সে যে তার মেয়েকে অত্যধিক ভালোবাসবে এটা তো খুবই স্বাভাবিক। সে কি নিজের চোখে দেখেনি। যে দেড় বছর আগে বিবাহ আইন চালু হলে যেসব ছেলেমেয়ে নিজেদের সাথী বেছে নিয়েছিল তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছে, আর অপর পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ চাইছে তারাই যাদের বিয়ে ঠিক করেছিল তাদের বাপ-মারা? আধুনিক বিয়ের সুবিধাগুলো সে দেখেছে আর তার নিজের মেয়েকে সে খুবই ভালোবাসে তাই লিয়েন নিউ-র বাগদানের ব্যাপারে তার মনটা খুবই খারাপ হয়েছিল।

অল্প কয়েকদিন আগেই, এই ব্যাপার নিয়ে সে লিয়েন নিউ-র সঙ্গে কথা বলেছিল। "তোমার বাপের বাড়িতে এসেছিলাম বাছা, বাচ্চা বয়সে বিয়ে হয়ে," সে বলেছিল। "লোকের চোখ রাঙানি খেতে হয়েছে, লোকের অসদ্ব্যবহার সইতে হয়েছে, এমন একটা দিন যায়নি যে আমার চোখের জল পড়েনি। এখন সরকার আমাদেব বিবাহ আইন দিয়েছে। খুবই ভালো আইন ওটা। তুমি এখন আঠারো বছরের ডাগর মেয়ে, বোকা গাধাও নয়। তোমার জীবন এখন তোমার নিজের হাতে। কিন্তু.....।" এখানে ইউয়ান মার কথার সুরটা হঠাৎ বদলে গেলো, এতক্ষণ লিয়েন নিউ মাথা নীচু করে একমনে শুনছিল। এবার তার মুখটা রাঙা হয়ে উঠলো, বিনুনীর ডগা নিয়ে খেলা করতে করতে সে বিব্রতভাবে বললো, "তোমার যা মনে হচ্ছে বলে ফেলো, মা। মনের মধ্যে চেপে রেখো না।"

ইউয়ান মা তখন ইতঃস্তত করে বলতে লাগলো, "কিন্তু আমি ভাবছিলাম কি যে তোমার মাসীর পরিবারে যদি তোমার বিয়ে হয়, তবে আমি বুড়ো হলে আমাকে দেখবার কেউ থাকবে। যতই হোক, আমার সঙ্গে তো দুটো সম্পর্ক হবে, আর যে দিক থেকেই দেখো না কেন, আমার দেখাশোনাটা করবে।" মার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

তার মা তখনও তার বুড়ো বয়সের কথা নিয়ে চিন্তা করছে দেখে লিয়েন নিউ কোমলভাবে বললো, "মাগো, এ কথা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি। তুমি তো জানো আমাদের পুরনো একটা কথা আছে 'আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশীর ওপর নির্ভর করার থেকে নিজের ওপর নির্ভর করা অনেক ভালো।' অন্যের চাল খেতে হয়তো ভালোই তবে সেটা হজম করা শক্ত। অতীতে তোমার লাঞ্ছনা কি যথেষ্ট হয়নি? তাছাড়া, তুমি তো ভালো করেই জানো আমার মাসীটি কি ধরনের লোক। তিনদিন যদি খোশ মেজাজে থাকে, তবে পরের দুদিন যে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে এ সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো। তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে মেজাজ খারাপ করে

সে। কে তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে?" একথা শুনতে শুনতে ইউয়ান মার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

"এখন, দিন বদলেছে," লিয়েন-নিউ বলে চললো, এখন লোকে নিজের পরিশ্রমের ওপর বেঁচে থাকে। পারস্পরিক সাহায্যদানের ভিত্তিতে আমরা এক কর্মীদল সংগঠিত করেছি। আমরা দুজনেই খাটতে পারি। কয়েকদিন আগেই চুং-সিয়াঙ বলেছিল খুব শীগগিরই আমরা কৃষিজাতদ্রব্য উৎপাদকদের একটা সমবায় গঠন করবো। সেটা গঠিত হলে, আমরা কতগুলো নার্সারি (শিশুশালা) খুলবো, খেতের কাজ যদি তোমার পক্ষে বেশি কষ্টসাধ্য হয় তাহলে তোমার করবার আরো অনেক কাজ থাকবে।"

মেয়ে যতক্ষণ কথা বলছিল মা ততক্ষণ সমানে ঘাড় নেড়ে তার কথার সায় দিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। এই কথাগুলিই তো বুড়ি শুনতে ভালোবাসে, এই কথাগুলিতেই তো তার হৃদয়ের সহানুভূতিশীল কোন এক তন্ত্রীতে ঘা দেয়।

"মাগো," লিয়েন-নিউ বলে চললো, "আমি বড়াই করবার চেষ্টা করছি না, কিন্তু তোমায় একটু আশ্বাস দিচ্ছি যে আমি এমন রোজগার করতে পারি যাতে তোমার সারা জীবন চলে যেতে পারে। আজকের দিনে একজন মেয়ে একজন ছেলেরই সমান। আমি চুং সিয়াঙ কিংবা আমাদের দলের অন্যদের সমান ওয়ার্কপয়েন্ট (কাজে অর্জিত পযেন্ট) পাইনি কি?" একটু থেমে সে আবার বলতে লাগলো, "পরে আমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজে বাস করবো, মাগো। আমাদের সামনের পথ দিনে দিনে প্রশস্ততর হচ্ছে" শুনতে শুনতে ইউয়ান মার মুখে হাসি ফুটলো।

লিয়েন-নিউ-র কথাগুলো তার মনের ভাব প্রকাশ করে দিলো। অনেক দিন ধরে তার মা তার মনের গোপন কথাটি অনুমান করার চেষ্টা করছিল। ইদানীং তাদের পারিবারিক কথাবার্তার মধ্যে সব সময় চুং-সিয়াঙ এই, চুং-সিয়াঙ ঐ, এসে পড়ছিল। এতক্ষণে মা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলো মেয়ের মনের কথা। তাই গুঁফো লি কথাটা উত্থাপন করতেই সে বুঝতে পারলো কি রকম বিশ্রী একটা অবস্থার মধ্যে সে পড়ে গেছে।

মনে মনে সে ভাবছিল, "একটি আমার অতি আপনার জন, আর অপরটি আমার আদরের বোন, তার ওপর ঘটক যে সে লোক নয়, স্বয়ং আমার নিজের ভাই। লিয়েন-নিউ আর চুং-সিয়াঙের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনোভাবের কথা কোনো মতেই ওদের বলতে পারা যায় না, ওদের মধ্যে কোনো কিছুই এখনো সঠিক রূপ নেয়নি। তাছাড়া, আমার ভাইয়ের মুখের ওপর বলবো যে আমার মেয়ে প্রেমে পড়েছে— এত লজ্জা করবে আমার যে কথাটা কি করে পাড়বো তাই ভেবে পাবো না। এইভাবে নিজের সঙ্গে যুক্তি করে সে ঠিক করলো যদি পারে তো ব্যাপারটা স্থগিত রাখার চেষ্টা করবে।

"আহা!" সে তার ভাইকে বললো, "মেয়ে বড় হয়ে গেলে তার নিজস্ব মতামত হয়। ডানায় পালক গজিয়ে গেছে, এখন যে সে তোমার কথা শুনবে এ কথা কে বলতে পারে?"

"হুম!" গুঁফো লি রাগতভাবে প্রত্যুত্তর করলো, তার তামাকের থলিটা টানাটানি করতে করতে। "পাহাড় যত উঁচুই হোক না কেন, সূর্যকে সে ঢাকতে পারে না। মা যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ মেয়ে নিজের ইচ্ছেমত কাজ করতে পারে না।"

"ভাইরে ইউয়ান মা' একটু চেষ্টা করে বললো, "আগের দিনের মাপকাঠি দিয়ে ওদের বিচার করো না। দেখছো না....।"

"কি দেখছি না?" বাধা দিয়ে ভুরু তুলে সে বললো। "তোমার ভাইঝি ওতো বিয়ের সম্বন্ধে গোড়ায় আপত্তি করেছিলো, করে নি কি? কিন্তু আমি জোর করলাম, আচ্ছা করে বকুনী দিলাম, আর এখন কি দেখছো? তার বিয়ের পর তিন চার বছর হয়ে গেলো কি না?"

ইউয়ান মার ঠোঁটের ডগায় একটা কথা এসে গিয়েছিল; তার বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, "তাতে আর কি হলো? এত সত্ত্বেও তোমার মেয়েতে আর জামাইয়েতে বনে না।" কিন্তু ইউয়ান মার মনটা নরম, কারুর মনে কখনো সে ব্যথা দিতে চাইতো না। মনের কথা মনেই চেপে রাখলো।

তার বোন কোনো উত্তর দিলো না দেখে গুঁফো লি বললো, "যদিও সে আর তার বর একটু ঝগড়া করে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। দুজনের এত ভাব, কথায় বলে, দাঁতও মাঝে মাঝে জিভ কামড়ে ফেলে।" কথাটা সে বললো অনেকটা কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে।

"সেটা সত্যি," ইউয়ান মা ধীরে ধীরে বললো।

গাছের ছায়াগুলো দীর্ঘতর হলো। ছোট ছোট মেয়েরা, যারা মাঠে গোরু ভেড়া চরাতে নিয়ে গিয়েছিল, তারা জন্তু জানোয়ারগুলিকে পাহাড় থেকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল। কাক আর চড়াইয়ের দল গাছগুলির মাথার ওপর চক্রাকারে উড়ছিল, বাসায় ফিরছে সব। গুঁফো লি বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি তার পাইপ ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে পড়লো। "সন্ধ্যে হয়ে এলো," সে বললো। "এবার আমায় যেতে হবে।" ইউয়ান মা তাকে রাতটা থেকে যেতে বললো। সে রাজী হোল না, বললো: "মাত্র দশ লির মত তো রাস্তা। এটুকু পথ যেতে আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।" কিন্তু যাবার আগে বোনকে তার সর্বশেষ উপদেশ দিয়ে গেলো। ইউয়ান মাকে সে মনে করিয়ে দিলো যে তার ছোট বোনের পরিবারের জমিজমা আছে, বড় একটা বাড়ি আছে তাদের অবস্থা বেশ ভালো, ঐরকম একটা পরিবার খুঁজে পাওয়া ইউয়ান মার পক্ষে বেশ কঠিন হবে। সে আরো বললো, যতই হোক ওদের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের খুবই নিকট, সেটা তো কেউ পালটে দিতে পারবে না। শেষকালে সে ইউয়ান মাকে বললো তার ছোট বোনকে না চটানোই ভালো। ইউয়ান মা কিন্তু তাকে কোনো কথা দিলো না, শুধু বললো, "পরে আবার এটা নিয়ে কথা বলা যাবে অখন।"

প্যারাফিনের বাতির রূপোলি ছটায় ঘর আলোয় আলো। জানলার ধারে একটা আলমারীর পাশে বসে ইউয়ান মা জুতো বানাচ্ছিল। কাজ করতে করতে তার

অন্তরের সব থেকে প্রিয় বিষয়টা নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। "যদি লিয়েন-নিউ তার বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙে দেয়। সে মনে মনে নিজের সঙ্গে যুক্তি করছিল, "তাহলে দুই বোনে আমরা কি করে আর দুজনের মুখের দিকে তাকাবো? তাহলে সত্যি সত্যিই একটা পারিবারিক কেলেঙ্কারি হবে...।" তখনি তার মেয়ে কি বলেছে সেই কথা মনে পড়লো। কথাটা তখন এত সত্যি মনে হয়েছিল তার। কিন্তু আবার মনে হলো, "মেয়ে যদি তার পছন্দ মত বর খুঁজে নেয় তাহলে লোকে তো তার নিন্দা করবে।" ঘুরে ফিরে বারবার এই একইভাবে সে চিন্তা করে যাচ্ছিল। মনের মধ্যে সবকিছু তার একেবারে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। দরজার ছিটকানি খোলার শব্দে তার চমক ভাঙলো।

লিয়েন-নিউ ঘরে ঢুকলো। ফুঁ দিয়ে তার লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়ে সেটাকে সে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলো। তারপর টেবিলের সামনের বড় চেয়ারটাতে বসে পড়লো। গ্রামের স্কুল থেকে ফিরে সাধারণত সে কিছুক্ষণ লেখাপড়া করে, দু'তিনবার তার মা এসে বকাবকি না করা পর্যন্ত শুতে যায় না। কিন্তু আজ রাতে সে লিখলোও না, পড়লোও না। টেবিলের ওপর কনুই রেখে হাতদুটোর মধ্যে থুতনী গুঁজে সে তার মার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"আজ মামা এসে কি বললো তোমাকে মা?" সে জিজ্ঞাসা করলো।

তার মা অজ্ঞতার ভান করলো। "কেন," কথাটা সে এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বললো, "সে কি এমনি তার বোনের কাছে আসতে পারে না, বোন কেমন আছে দেখতে? কথা বিশেষ কিছু সে বলেনি।"

"একটা কিছু ব্যাপার আছে যার জন্য সে এখানে এসেছিল," লিয়েন-নিউ চাপ দিয়ে বললো।

"কেন তোমার কি মনে হয়? "ইউয়ান মা মেয়ের দিকে ফিরে হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলো।

লিয়েন-নিউ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো।" একটা মড়াকে বেশিক্ষণ বরফ চাপা দিয়ে রাখা যায় না," ঠোঁট ফুলিয়ে বললো সে, তারপর হাতের মধ্যে মুখ গুঁজলো।

"তুমি যদি সব জানোই," ইউয়ান মা জোর করে হেসে বললো, "তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন?"

ইউয়ান মার মেয়ে অন্ত প্রাণ। যদিও লিয়েন-নিউ এখন বড় হয়ে গেছে, তবু সে শিশুই মনে করতো।

এবার লিয়েন-নিউ ঠিক বাচ্ছাদের মতো করতে লাগলো। কোনো রকম আভাস না দিয়েই সে মার হাত থেকে জুতোটা নিয়ে ছুঁড়ে দেওয়ালের কাছে বিছানার ওপর ফেলে দিলো। "শীগ্‌গীর তুমি আমায় বলো মা," সে চীৎকার করে উঠলো বলতে বলতে সে মাটিতে দুমদুম করে পা ঠুকতে লাগলো, যে চেয়ারটাতে বসেছিল সেটা প্রতিবাদে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে উঠলো।

ইউয়ান মার চোখ দুটো স্নেহে আর্দ্র হয়ে উঠলো। তার পছন্দ নয় এমন এক

পরিবারের এই প্রাণবন্ত ছেলেমানুষ মেয়েটার বিয়ে দেবে, তারপর দেখবে বাকী দিনগুলো তার দুঃখে কাটছে, এটা সহ্য করা তার পক্ষে একটু বেশি হয়ে পড়বে। সেটা সহ্য করার মত সাহস তার কোথায়? স্নেহভরে ইউয়ান মা মেয়ের চুল ঠিক করতে করতে মেয়েকে শান্ত করলো।

"হয়েছে, হয়েছে, লক্ষী মেয়ে, সে কি বলেছে তোমায় বলছি।"

লিয়েন-নিউ যখন দেখলো তার মা তাকে সত্যিই কথাটা বলতে যাচ্ছে, তখন সে সোজা হয়ে বসলো। হঠাৎ মনে হলো তার গাল দুটো যেন পুড়ে যাচ্ছে, বাতির সলতেটা একটু নামিয়ে দিয়ে সে শান্তভাবে শুনতে লাগলো।

আস্তে আস্তে, নীচু গলায় ইউয়ান মা লিয়েন নিউ এর মামা যা বলেছে তা হুবহু পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো।

শুনতে শুনতে লিয়েন-নিউ-র ভীষণ রাগ হতে লাগলো। তার মাসী বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিতে চায় শুনে, বুকটা তার ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো, গলার মধ্যে পুঁটলি পাকাতে লাগলো। মনে হচ্ছিল তার যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে।

একটুক্ষণ পরে সে আবার জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি মামাকে কি বললে, মা?"

'আমি তাকে স্পষ্ট কোনো উত্তর দিইনি", একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা বললো।

ক্রুদ্ধভাবে লিয়েন-নিউ উঠে দাঁড়ালো, চেয়ারটাকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললো, "মা, আমি আধা খেঁচড়া কোনো কিছু পছন্দ করি না। আমাদের পক্ষে এ ব্যাপারে একটা পরিষ্কার ছেদ টেনে দেওয়াই ভালো। আমার বাগদানের ব্যাপারটা খারিজ করার জন্য, চলো জেলা অধিকর্তার কাছে একটা দরখাস্ত দিয়ে আসি।"

ধানের খেত থেকে ব্যাঙেদের গ্যাঙ গ্যাঙ ডাক লিয়েন-নিউ-এর মনের অস্থিরতা যেন আরো বাড়িয়ে দিলো। বসলে তার উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছিল আবার উঠে দাঁড়ালে বসতে ইচ্ছা করছিল। খোলা জানলা দিয়ে একঝলক দক্ষিণে বাতাস বয়ে এলো। বাতাসটা তার মুখে এসে লাগলো, সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেলো, নিজেকে বেশ চাঙ্গা মনে হলো। আস্তে আস্তে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেলো, কথাগুলো সহজভাবে বেরিয়ে এলো;

"জনগণের সরকার আজ আমাদের পিছনে। মামা মাসীদের কথা বাদই দাও এখন বাপ মাকে পর্যন্ত যুক্তিসংগত কথা শুনতে হবে। সামন্ততান্ত্রিক প্রথাগুলোকে, আজকের দিনে কোনোরকম গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গিটা প্রকাশ করতে পেরেই তার অনেকটা ভালো লাগলো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই তার মার দীর্ঘনিঃশ্বাস তার কানে এলো। তখনি তার মনে হলো তার কথায় মা হয়তো মনে ব্যথা পেয়েছে। তাই একটুক্ষণ বাদে, অনেক শান্তভাবে সে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে লাগলো।

"মা", চেয়ারটা বৃদ্ধার কাছে টেনে এনে সে বললো। "মামাকে আমি অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছি না। তার যে কেমন লাগছে তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার ঐ মাসতুতো ভাইটিকে আমি যতটা চিনি তুমিও ঠিক ততটাই চেনো। এতো নির্জীব

ও। ছোটবেলায় একসঙ্গে আমরা খেলা করেছি। ওকে আমার কখনো ভালো লাগতো না। সেটা তুমি নিজেও জানো।" এক মুহূর্তের জন্য থেমে সে আবার বলতে লাগলো, "যদি জোর করে ওকে আমি বিয়েও করি, যখন দেখবো ওর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছি না। তখন বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হবে। বিবাহ বিচ্ছেদ সব সময়ই একটা বিশ্রী ব্যাপার। তাছাড়া তোমার কি মনে হয় তখন লোকে নিন্দা করবে না?"

ইউয়ান মা ঘাড় নাড়লো।

"মাগো", লিয়েন-নিউ বলে চললো, "বিয়ের সম্বন্ধটা যদি আমরা ভেঙে দিই তাহলে লোকে কি বলবে ভেবে ভয় পেয়ো না। সব দিক দিয়ে যদি দেখো তবে তারা কারা?.... খালি কতকগুলো সেকেলে নিন্দুক। আমাদের চিন্তা করা দরকার বিয়ের সম্বন্ধটা আমরা যদি না ভাঙ্গি তবে সেটা আমরা সইবো কি করে। আমরা যে কাজটা করবো। সেটা যদি বিবাহ আইনের সঙ্গে খাপ খায় তবেই আমাদের কাজটা সঠিক ও আইনসংগত হবে।"

"আমার মনে হচ্ছে তুমিই ঠিক, বাছা", ইউয়ান মা বললো।

লিয়েন-নিউ গলাটা নামিয়ে বলতে লাগলোঃ "মাগো, তুমি জানো তোমার কাছে আমি কিছুই লুকোই না। তুমি জানো...।" এখানে তার গলা বুজে গেলো, লজ্জায় তার কথা বেরোচ্ছিল না। তার মার কাছে চিরকাল কথাটা গোপন রাখতে পারবে না সেটা বুঝতে পেরে নিজেকে শক্ত করে নিয়ে সে বলতে লাগলো। "বেশ কিছুদিন ধরে চুং-সিয়াঙকে জেনেছি", সে বললে। "ওর চিন্তাধারাই বলো কিংবা ওর কাজের ধারাই বলো, নিজের কাজের প্রতি ওর দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা ওর পড়াশোনা, ওর স্বভাব বা ওর প্রকৃতি, ওর যোগ্যতা বা ওর চেহারা— সে যেটাই হোক না কেন আমি....।" সে মাঝপথে থেমে গেলো, তারপর মাথা হেঁট করে সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে দুটি কথা উচ্চারণ করলো, "আমি সন্তুষ্ট।"

মনে মনে ইউয়ান মাও খুশি হয়েছিল, তখনকার মতো তার সব দুশ্চিন্তা চলে গিয়েছিল। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাসলো। "আমি অনেক দিন থেকেই...।" সে বলতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু মেয়ে পাছে লজ্জা পায় তাই থেমে গেলো। গলার সুর বদলে, সে বললো, "আমারও ওকে বেশ ভালো লাগে। এমন কেউ নেই যে ওর প্রশংসা করে না। সকলেই বলে ও ছেলে ভালো।"

দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে বলতে লিয়েন-নিউ ক্রমশ মুখর হয়ে উঠলো, তার মার কথা শেষ হতে না হতেই সে আবার বলতে লাগলো। "এই রকম উঁচু দরের লোকের সঙ্গে থাকার অর্থ হলো একে অন্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ও কিভাবে অন্যদের সঙ্গে কাজ করে, সেটা দেখেছো তুমি! কি ভীষণ ওর উৎসাহ, ওর ওপর সব সময় নির্ভর করা যায়। দলের প্রত্যেকে ওর দিকে। দলটাকে যখন সমবায়ে (কো-অপারেটিভ-এ) সংগঠিত করা হবে তখন ও যে তার সভাপতি নির্বাচিত হবে এটা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত।"

এতক্ষণে বেশ রাত হয়ে গিয়েছে, চারিদিক সব নিস্তব্ধ। কিন্তু মা আর মেয়ে

তাদের আলোচনায় গভীবভাবে নিমগ্ন। তাদের গলার শব্দে শেষকালে মোরগটার ঘুম ভেঙে গেল। তার মনিবনীরা উঠে পড়েছে ভেবে সেও নড়েচড়ে ডানা ঝাড়া দিয়ে ডাকতে লাগলো।

মা ও মেয়ের আলোচনা চললো গভীর রাত্রি পর্যন্ত।

পবেব দিন দুপুরের খাবার সময়ের পব শহর অধিকর্তার কাছ থেকে জরুরি বিজ্ঞপ্তি এলো। দেখা গেল, গ্রামগুলিতে যে ক'টা গরুর গাড়ি রয়েছে তাব সব ক'টাই প্রযোজন- জেলার গুদামগুলি থেকে শস্য বযে নিযে যেতে হবে স্টেশনে। সেদিন বাত্রি থেকেই কাজ শুরু হবে।

একাজের জন্য নির্ধারিত গোরুর গাড়িগুলোর মধ্যে তিনটে ছিল চুং-সিযাঙের দলেব। লিযেন-নিউ আর চুং সিযাঙের বাডি থেকে এক একটা করে বলদ নিয়ে তাবই একটা গাড়িতে জোড়া হলো। লিয়েন-নিউ যখন খড়ের আঁটি, জাবনা আর পথে প্রযোজনীয অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস জড়ো করছিল, তখন চাবুক হাতে কবে লি ফেঙল্যান ব্যস্তভাবে এসে নীচুগলায় জিজ্ঞাসা কবলো, "লিয়েন নিউ, গাড়িগুলোর সঙ্গে তোমাব যাওযাটায তোমার মা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন না তো?" এই মোটাসোটা, আঁটসাঁট গড়নের বিবাহিতা মেয়েটি লিযেন নিউ-এর পবম শুভাকাঙ্ক্ষিনী।

"না, না, মা মোটেই অসন্তুষ্ট হচ্ছে না," একটু হেসে লিয়েন নিউ উত্তর দিল।

"তাহলে ঠিক আছে," লি ফেঙ ল্যান বলে চললো। "আমাব ভয হচ্ছিল হয়তো উনি অসন্তুষ্ট হবেন...।" ঠিক সেই সময দরজাব ওপাশ থেকে ইউয়ান মার গলা শোনা গেলঃ "কে ও? ফেঙ ল্যান না কি?"

"হ্যাঁ, ইউযান মা", ফেঙ ল্যান তাড়াতাড়ি উওর দিলো। "আজ বাত্রে বেশ কযেকজন কমবযসী মেযে ও বউরা গাড়িগুলোর সঙ্গে যাচ্ছে। লিয়েন নিউ কি তাদেব সঙ্গে যেতে পারে?"

"নিশ্চয পাবে, হেসে ইউয়ান মা উত্তব দিল।" কাজটা তো খুবই দরকারী। আর অন্যেবা যদি যেতে পাবে তবে লিযেন নিউ যাবে না কেন? একটু পরে সে আরো একটু যোগ করলো, "বড্ড ছেলেমানুষ ও। পথে তুমি একটু ওর ওপর নজর বেখো, কেমন?"

সন্ধ্যাব একটু পরে, গোরুর গাড়িগুলো সারবেঁধে যাত্রা শুরু করলো। গাড়িগুলোর চাকাব ঘবঘর শব্দ শোনা যেতে লাগলো; তামাকের পাইপগুলো জ্বলতে লাগলো; বাতাসে মানুষেব গলার শব্দ ভেসে বেড়াতে লাগলো। রাত্রি হলে কি হয় কারুরই নিজেকে একেবারে নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল না।

একটু দেরী করে আসার জন্য চুং-সিযাঙ আর লিযেন-নিউ-র গাড়িটা সারির একেবারে প্রায় শেষেব দিকে পড়ে গিয়েছিল।

গ্রাম ছাড়বার সময চুং-সিয়াঙ প্রথমে রাশ ধরে গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলছিল, আর কিছু পড়ে না যায় সেটা দেখবার জন্য লিযেন নিউ আসছিল পিছু পিছু। কিছুক্ষণ বাদে চুং-সিয়াঙ থেমে পড়ে পিছনের দিকে তাকালো।

"তোমার ঐ জিনিসপত্রগুলো তদারক করার কোনো প্রয়োজন নেই। এসো, গাড়িতে উঠে বসো।"

"না, "লিয়েন-নিউ ধীরভাবে উত্তর দিলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল তার মনটা রয়েছে তার অন্তরের অতি প্রিয় কোনো কিছুর ওপর। "এমনি আস্তে আস্তে গেলে ঠিক আছে।"

তার উত্তরে কান না দিয়ে, চুং-সিয়াঙ রাশ টানলো তারপর হেঁকে বললো, "শীগ্‌গির, গাড়িতে উঠে বসো।" লিয়েন-নিউ গাড়িতে উঠে খড়ের আঁটিগুলোয় ঠেস দিয়ে বসলো। চুং-সিয়াঙ বসলো তার পাশে, পা মুড়ে।

ঝাঁকানি দিতে দিতে, চাকায় ঘড় ঘড় শব্দ করতে করতে গাড়ি চললো। গাড়ির চাকার অবিশ্রান্ত শব্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একটানা চিন্তার একটা ধারা এই অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে দুটির মনের মধ্যে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগলো।

অনেক দিন ধরে দুজনে একসঙ্গে কাজ করেছে, একসঙ্গে পড়াশোনা করেছে, পরস্পরকে ভালো বেসেছে। লোকে তাদের বলেছে অভিন্ন আত্মা, কানকে যেমন গালের থেকে পৃথক করা যায় না, ছায়া যেমন মানুষের সঙ্গে সঙ্গে চলে, তেমনি আর কি। দুজনে দুজনকে শ্রদ্ধা করে, কাজকর্মে দুজনে দুজনকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। দুজনে যখনই একসঙ্গে হয়েছে, কত গল্প করেছে, হাসিঠাট্টা করেছে কিন্তু কেউই কখনো নিজেদের সম্পর্কের কথা তোলেনি।

দুজনেই বহুদিন ধরে এই কথাটা মনের মধ্যে সযত্নে পোষণ করেছে, সুযোগ খুঁজেছে কথাটা ব্যক্ত করবার। কিন্তু এ পর্যন্ত সে সুযোগ আর তাদের মেলেনি।

অন্ধকার রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ। আগের গাড়িগুলো সামনে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, আর পেছনের গাড়িগুলি অনেক পিছিয়ে পড়েছে। মনের কথা বলার একেবারে উপযুক্ত সময়। কিন্তু ঠিক এই সময়েই মনে হবে যেন তাদের ঠোঁট দুটো কে সীল মোহর দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে কারুর মুখে কোনো কথা নেই। শেষ কালে চুং-সিয়াঙই সে নীরবতা ভঙ্গ করলো।

"জেগে আছো না কি?" তার গলার স্বরটা যেন বুজে আসছে মনে হলো, এরপরেই সে গলাটা ঝেড়ে সাফ করলো। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল একটা কথাও তাকে বেশ কষ্ট করে বলতে হয়েছে।

অনেকক্ষণ হলো লিয়েন-নিউ-র ঘুম কোথায় পালিয়ে গেছে।

যে মুহূর্ত থেকে সে যাত্রায় প্রস্তুতি শুরু করেছে ঠিক তখন থেকেই একটা অদ্ভুত আনন্দ সে অনুভব করেছে, গাড়িতে ওঠার সময় থেকে তার মন এক লহমাও স্থির ছিল না। তার ভাবনাগুলি ছুটে চলেছে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে। ঠিক কখন যে সে উপলব্ধি করলো একজন তাকে ভালোবাসে তো সে নিজেই জানে না। যদি ও তার মার সে প্রাণের থেকেও প্রিয়, তবু সে অনুভব করলো এ ভালোবাসা অন্য ধরনের। একবার তার মনে হয় তার মার সঙ্গে তার যে কথাগুলো হয়েছিল চুং-সিয়াঙকে

সেগুলো বলে, চুং-সিয়াঙ হয়তো সেগুলো শুনলে খুশি হবে। কিন্তু একটা মেয়ে আচমকা কি করে একজন ছেলেকে এসব কথা বলতে পারে? গ্রামে সমবায় সংগঠিত করার যে সব কথাবার্তা চলেছে তার চিন্তাধারা সেই দিকে মোড় নিলো। সকলের পক্ষেই সেটা বেশ আশাপ্রদ হবে বলে মনে হচ্ছে। শুধু চুং-সিয়াঙের সঙ্গে যদি সব সময় থাকা যেতো...। তার চিন্তাধারা অসংলগ্ন হয়ে গেলো। মনে মনে সে ভাবছিল চুং-সিযাঙ কি সমবায়ের সভাপতি হবে? হ্যাঁ, নিশ্চয় হবে। কি রকম স্ফূর্তিতে ও কাজে নেমে পড়েছে। এ বিষয়ে, অবশ্য কোন প্রশ্নই ওঠে না। তারপর নিজের মনে কল্পনা করতে লাগলো চুং-সিয়াঙ যখন যৌথ খামারের সভাপতি হবে তখনকার কথা। কি আনন্দেরই হবে ব্যাপারটা। কিন্তু তার চিন্তাগুলো অনেক বেশি এগিযে গেছে।

পথের দুধারের খেতগুলোয, শস্যের শীষ সব বাতাসে দুলছে। মনে হচ্ছে তারা যেন ওর উদ্দেশ্যে ঘাড় নাড়ছে। আকাশে অনেক উঁচুতে ছায়াপথ বেযে তারাগুলো ঝিকমিক করছে। ও দিব্যি করে বলতে পারে আসলে ওরা ওর দিকে তাকিযে চোখ টিপছে। মধুর একটা আবেশ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

এই সুখকর কল্পনায় সে যখন গা ভাসিয়ে দিয়েছে তখন তার কানে এলো চুং-সিয়াঙের কণ্ঠস্বর। উষ্ণ একট লজ্জার আভা তাব গলা পর্যন্ত উঠে এলো তারপর সেখান থেকে তার গালে, তার কানে ছড়িয়ে পড়লো। একটুখানি ইতঃস্তত করে, অবিচলিতেব ভান করলো, তারপর চোখ রগড়ে উত্তর দিলো, "আমি ঘুমোইনি।" ওদের লক্ষ্য করে একটা হাঁক দিলো, তারপর বগলে চাবুকটা গুঁজে এর পরে কি বলবে মনের মধ্যে সেটা হাতড়ে বেড়াতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে তবে সে আবার কথা বলতে শুরু করলো, "আমাদের দুজনেব একসঙ্গে যাওয়াব ব্যাপারে তোমার মা কি বললেন?

"মা? লিযেন-নিউ মৃদুভাবে বললো। "মা কিছু বলেনি। কিন্তু যদি কিছু বলতো, তাহলেও কিছু এসে যেতো না।"

চুং-সিয়াঙ আবার বলদ দুটোর উদ্দেশে চীৎকার করে উঠলো। থেমে থেমে সে বললো, "আমরা দুজনে—।" এই কথা দুটো মুখ দিয়ে বার করতে না করতেই তার বুকের মধ্যেটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো, কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগলো। ঠোঁট শুকিয়ে গেলো, গলার স্বর বুজে এলো। বাকী কথাগুলি আর মুখ দিয়ে বারই হোল না।

চুং-সিয়াঙ যে কথা পাড়তে যাচ্ছে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে লিয়েন-নিউ একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলো। তাহলেও ওর বাকী কথাগুলো শুনবাব জন্য নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিলো।

কিন্তু চুং-সিয়াঙ অন্যভাবে কথাটা পাড়তে গেলো।

"আমার এত কথা তোমায় বলার আছে", সে আবার শুরু করলো।

"বেশ তো, বলো না, ধীরে সুস্থ," লিয়েন নিউ বললো বেশ একটু কষ্ট করে। বেশ স্পষ্টভাবেই ওর গলা কেঁপে গেলো।

মনে হচ্ছিল দুজনের মাঝখানে যেন জানলাতে লাগাবার পাতলা কাগজের ব্যবধান, কিন্তু সেটা ছেঁড়া লোহার পাত ছেঁড়ার মতোই কঠিন যেন।

চুং-সিয়াঙ এবার একটা শেষ চেষ্টা করলো। নিজের মনকে সে বোঝালো, যাই হোক, এখানে আমরা তো মাত্র দুজনে রয়েছি। যদি ভুল কথাও বলি তাহলেও খুব একটা ক্ষতি হবে না। এটাতে মনে একটু বল পেয়ে সে জোরে বললো, তোমার সঙ্গে আমি আমাদের নিজেদের সম্বন্ধেই কথা বলতে চাই, লিয়েন-নিউ।" ওর গলার স্বর ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। তবুও কথাটা বলে ফেলে তার অনেকটা ভালো লাগলো। লিয়েন-নিউ এর·উত্তরের অপেক্ষায় সে ঘুরে বসলো।

লিযেন-নিউ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো।

সে ভাবছিল তার বাগদানের কথা আর তার মামা সামান্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণায় যার মনটা ভরা তার কথা। ভাবছিল তার মাসীর কথা, যাকে বাগ মানানো খুবই কঠিন। যুক্তিসঙ্গতভাবে আলোচনা করে এ সমস্যা সমাধানের আশা করা বৃথা। কিন্তু যদি পরিষ্কার একটা ছেদ টেনে নেওয়া যায় তাহলে তার ফল হবে এই যে তার মার একমাত্র নিকট আত্মীয় বলতে রয়েছে তার ভাইবোন, সেই ভাইবোনকে হারাতে হবে। দুদিন আগে তার মামার আসার কথা তার মনে পড়লো। এটা একরকম নিশ্চিত যে তার বিয়ের সম্বন্ধ যদি ভেঙে দেওয়া হয় তবে সে বা তার বোন কেউই কখনো সেটা ক্ষমা করবে না বা ভুলবে না। অবশ্য দুদিন আগেই হোক বা দুদিন পরেই হোক ঘটনাটাকে তাদের মেনে নিতেই হবে। তবে ফলটা খুব সুখের হবে না। এটা নিয়ে যখন সে চিন্তা করছে তখন চুং-সিয়াঙ তাকে জিজ্ঞেসা করলো সে উত্তর দিতে ইতঃস্তত করছে কেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললো, "ব্যাপারটা অত সহজ নয়!" কথাটা বলেই সে চুং-সিয়াঙের দিকে ফিরে তাকালো। কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেলো না। সে যে কখন গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে লিয়েন-নিউ সেটা দেখতেই পায়নি।

কথাগুলো বলেই চুং-সিয়াঙ খাড়া হয়ে বসেছিল তার উত্তরের অপেক্ষায়। কিন্তু দীর্ঘ নীরবতার পর সে যখন উত্তর দিলো "অত সহজ নয়" গোছের কি একটা বললো। তা শুনে চুং-সিয়াঙ বিড় বিড় করে বললো "হলো না, কিছু হলো না। তা না হলে ও একথা বলবে কেন? লজ্জায় সে একেবারে লাল হয়ে গেলো গাড়িতে আর তার স্থান হবে না এটা উপলব্ধি করে তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো

"তুমি নেমে পড়লে কেন?" তার দিকে ফিরে লিয়েন-নিউ জিজ্ঞাসা করলো।

"এইভাবে হাঁটতে বেশ ভালো লাগে, বিড় বিড় করে বললো চুং-সিয়াঙ।

সে যে অসন্তুষ্ট হয়েছে এটা বোঝা খুব শক্ত ছিলনা। তাই লিয়েন-নিউ একটু হেসে বললো, "উঠে এসো। আমি বাঘও নই, ভাল্লুকও নই। তোমায় আমি খেয়ে ফেলবো না। তোমার যদি কিছু বলবার থাকে তবে ধীরে সুস্থে বলো সেটা।"

কেবলমাত্র তখনই চুং-সিয়াঙ ঘুরে দাঁড়িয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে

লিয়েন-নিউ চাবুকটাবুক শুদ্ধ তার বড় বড় হাত দুটো নিজের হাতে শক্ত করে চেপে ধরে রইলো।

গড়গড়িয়ে গাড়ি চললো। গাড়ির সামনে জোতা বলদদুটো ক্লান্তভাবে ঢিমেতালে কষ্ট করে এগিয়ে চলছিল। জনমানুষের সাড়াশব্দ ছিল না কোথাও। বুড়ো বলদদুটো সুপরিচিত পথ ধরে একভাবে এগিয়ে চলেছিল, তাদের চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কেনো লোকের প্রায় প্রয়োজনই হচ্ছিল না।

লিয়েন-নিউ আর চুং-সিয়াঙ পরস্পরের হাত ধবে বসে রইলো, কারুর মুখে কোন কথা ছিল না। চুং-সিয়াঙ মুখ খুলতে যাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ শোনে পিছনে চাকার শব্দ আর কে যেন বলদগুলোকে গালাগাল কবছে। ফিরে দেখে পিছনের একটা গাড়ি ওদের পিছু পিছু এসে ওদের ধরে ফেলার চেষ্টা করছে। লিয়েন নিউ-এর হাত থেকে নিজের হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে সে লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়লো। চাবুক তুলে বলদ দুটোর দিকে তাকিয়ে চেঁচাতেই গাড়ি একেবারে হুড়মুড় করে এগিয়ে চললো।

এবারে পিছনের লোকটা চীৎকার শোনা গেল, "আমাদের সামনের ও গাড়িটা কাব ?"

লিয়েন-নিউ উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। গলাটা যেন খুব চেনা চেনা ঠেকছে ? চাকার ঘড় ঘড়ানির জন্যে ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না। পিছনের খড়ের গাদার ওপর উঠে সে লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মিশ কালো অন্ধকারে পরিষ্কার কিছু দেখতে পেল না। সে চেষ্টা তাকে ছাড়তে হোল।

"আমার ইউনিয়ন গ্রাম থেকে। তুমি কোথা থেকে আসছো ?" একটু বিব্রতভাবে চুং-সিযাঙ চীৎকাব করে বললো।

"আরে," পিছনের গাড়ির লোকটা বললো, "কে ও চুং-সিয়াঙ নাকি ?"

"হায় ভগবান। পৃথিবীটা সত্যিই খুব ছোট্ট!" লিযেন-নিউ চমকে উঠলো, এতক্ষণে সে গলাটা চিনতে পেরেছে। লোকটা আর কেউ নয়, তার মামা গুঁফো লি। তাহলে সেও সে রাতে শস্য বইবার কাজে সাহায্য করতে এসেছে। "হায় ভগবান। আর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসার প্রথম রাতেই হবি তো হ' তার সঙ্গে দেখা!" লিয়েন-নিউ আর চুং-সিয়াঙ হঠাৎ কি রকম যেন থতমত খেয়ে গেলো। "বলদ দুটোকে কসে চাবুক লাগাও যাতে তাড়াতাড়ি চলে", লিয়েন-নিউ ফিসফিস করে মিনতি করলো তাকে।

চুং-সিয়াঙ দু'বার কসে চাবুক লাগাতেই দেখতে না দেখতেই তারা গুঁফো লিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলো। কিন্তু সামনের গাড়িগুলো পথ জুড়ে থাকায় গুঁফো লি শীগগিরই আবার ওদের ধরে ফেললো। চুং-সিয়াঙের হঠাৎ ভীষণ রাগ হোল। "ওহে" "সে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার গাড়িতে কার বলদ জুতেছো ?"

গুঁফো লিব মনের কথাটা চুং-সিয়াঙ পরিষ্কার বুঝতে পারলো, কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কিছু বলার তার ইচ্ছা ছিল না তাই সেকথাটা ঘুরিয়ে দিলো।

"ওহো, আমাদের লি খুড়ো দেখছি যে," সে বললো। "তোমার গলাটা চিনতে

আমার খানিকটা সময় লাগলো।" একটু থেমে সে বললো, "আমার তামাকের থলিটা সঙ্গে আনিনি তাহলে তোমাকে পাইপ খেতে দিতাম। গাড়ি বলদ সব কি তোমার নিজের? না বলদগুলো অন্য কারুর?" গুঁফো লিকে একটা কথা বলারও সুযোগ না দিয়ে চুং-সিয়াঙ বলে চললো।

লিয়েন-নিউ চুপ করে গাড়ির ওপর শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলো।

শেষকালে গুঁফো লি যখন কথা বলতে শুরু করলো তখন মনে হলো তার কথার আর শেষ নেই। এক কথা থেকে আর এক কথা সে বলে চললো তো চললোই, "এতদিনের আলাপ আর তুমি কি না আমার গলাই চিনতে পারলে না?.... আমার সঙ্গে তামাক আছে, তুমি আমার তামাক নিয়ে পাইপ খাও না কেন!.... আমার পক্ষে এ যাত্রা করার দুটো উদ্দেশ্য।"

"দুটো উদ্দেশ্য কেন?" চুং-সিয়াঙ জিজ্ঞাসা করলো।

"যাবার সময় আমি ধান নিয়ে যাচ্ছি আর ফিরবার সময় একজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবো, "গুঁফো লি বললো। "বেশ কিছু দিন হলো আমার মেয়ে লিখেছিল সে বাড়িতে এসে ক'দিন থাকতে চায়।"

গাড়ি থেকে লিয়েন-নিউ সবই শুনছিল। মেয়ে যদি তার বাপের বাড়ি যেতে চায় তবে তার স্বামী কেন তাকে তার নিজেব গাড়ি করে পাঠায় না? দুজনের হয় তো আবার ঝগড়া চলেছে। গুঁফো লি-র মেয়ের জন্য তার দুঃখ হয় ঠিকই— মেয়েটা একেবারে নির্জীব ধরনের, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে গুঁফো লি কেন এই রকম সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সেইটাই সে বুঝতে পারতো না।

দুটো গাড়ি কাছাকাছি হলে, পিছনের গাড়িটা সামনের গাড়ির একেবারে গা ঘেঁষে এলো। গুঁফো লি আবার জিজ্ঞাসা করলো, "তোমার গাড়িতে কার বলদ জুতেছে, চুং-সিয়াঙ?"

চুং-সিয়াঙ কোনোরকম গণ্ডগোল চাইছিল না, তাই সে সেটা এড়াবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এখন একেবারে কোনঠাসা হয়ে গেলো। কিন্তু নিজেকে সে প্রশ্ন করলো ভয় পাবার কি আছে? ঠিক করলো কথাটা সোজাসুজি বলেই ফেলবে। "দুটোর মধ্যে একটা হলো লিয়েন-নিউদের," সে উত্তর দিলো।

"আজ রাতে লিয়েন-নিউ আসে নি তো, এসেছে না কি সে?" গুঁফো লি প্রশ্ন করলো।

"হ্যাঁ, এই তো সে এখানে।"

গুঁফো লি একেবারে খেয়ে গেলো, চুং-সিয়াঙের মুখোমুখি হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলো, "কি বললে। লিয়েন-নিউ এখানে?"

"হ্যাঁ" চুং-সিয়াঙ উত্তর দিলো।

গুঁফো লির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। "কোথায় সে? কোথায় সে?" সে চীৎকার করতে লাগলো। "এটা....এটা একেবারে বাজে কথা!" রাগে একেবারে সে ফেটে পড়লো, তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো।

লিয়েন-নিউ ভেবে দেখলো এই অবস্থায় তার লুকিয়ে থাকাটা আর যুক্তিযুক্ত হবে না।

মনে মনে সে ভাবলো, "ওকে আমি ভয় করবো কেন, লুকোবার মতো কোন কাজ তো আমি করছি না ?" এই ভেবে সে উঠে বসে চেঁচিয়ে বলল, "এই যে আমি এখানে মামা।"

গাড়ির থেকে লিয়েন-নিউর গলা শুনতে পেযে গুঁফো লির রাগ একেবারে চবমে পৌঁছলো।

"কে তোমাকে আসতে বলেছে ?" সে একেবারে তারস্বরে চীৎকার করে উঠলো। কিসেব জন্য তুমি এসেছো ? আমি বলছি, এক্ষুণি এই মুহূর্তে তুমি বাড়ি ফিরে যাও।"

"মামা এত রাগ কবছো কেন ?" জিদেব সঙ্গে লিয়েন-নিউ বললো, "আমি না এলে আব কে আসতো ?"

"তোমার দলেব আব সকলে কি মরে গিযেছে ?"

"না, প্রত্যেকেই নিজেব নিজের কাজে আছে।"

"নেমে এসো বলছি, গুঁফো-লি ভাঙাগলায চীৎকাব করে উঠলো। তোমার গর্ভধাবিণী মা জানে না কি করে মেয়ে মানুষ করতে হয।"

"অমনিভাবে কথা বলো না, মামা। ছেলেদের মত মেয়েরাও কি বাইরে আসতে পারে না ? আজ বাতে, আমাদের মেয়েরা অনেকেই আমাদের সঙ্গে এসেছে," তার বাগ একটু পড়ে এলে লিযেন-নিউ বললো।

গুঁফো লি, এই প্রশ্নেব কি উত্তর দেবে ভেবে পেলো না। সেই জন্যে সে আরও বেশি বেগে গিয়ে তর্জন গর্জন শুরু করে দিলো, "এখনো ওখানে বসে বয়েছ কেন ? তুমি চাও আমি গিযে তোমায টেনে নামিয়ে আনি ?" কথাটা বলে সে চুঙ-সিয়াঙকে হুকুম দিলো গাড়ি থামাতে।

চুঙ-সিয়াঙ এতক্ষণ বাগে ফুঁসছিল। ওর হুকুমে সে কানই দিলো না। গুঁফো লিকে তার খুবই অবুঝ বলে মনে হলো। কিন্তু সে সঙ্গে যখন তার মনে পড়লো যতই হোক, লিয়েন-নিউর ও মামা তখন সে রাগটা দমন করার চেষ্টা কবলো। "লি খুড়ো," সে বললো তুমি এত হৈ চৈ করছো কেন ? লোকে যে তোমায় দেখে হাসবে সেটা ভেবে তোমার ভয হচ্ছে না ?"

"হা, হা !" টিপ্পুনী কেটে গুঁফো লি বললো। "আমায দেখে হাসবে ? সে ভয় যদি কবতাম তবে এতদূর কি এগোতাম ?

চুঙ-সিয়াঙ এর মনে হলো গুঁফো লি একটু বেশি দূরই এগিয়েছে। শেষকালে সে বললো।

"কাকে তুমি খোঁচা দিতে চাইছো ? ওকে না আমাকে ?"

গুঁফো লি তার চাবুকটাকে ঘুরিয়ে বললো, "তোমবা দুজনেই সমান।"

চুঙ-সিযাঙ কিছু বলবাব আগেই হঠাৎ দেখে লিযেন-নিউ গাড়ি থেকে লাফ দিযে

নেমে গুঁফো লি-র সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর বললো। "মামা, গাড়িতে করে যদি শস্য নেবার প্রয়োজন হয় তবে আমার কর্তব্য হলো সে কাজে সাহায্য করতে বেরিয়ে আসা। আমি আমার নিজের ইচ্ছায় এসেছি। তাছাড়া, যে ব্যাপারেব সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই তাতে কেনই বা তুমি বাগড়া দিতে আসো? আর কেনই বা তুমি ঘুরে ঘুরে ঝগড়া বাধাতে চাও? "একটু থেমে সে বললো, "আচার ব্যবহার যদি সঠিক হয় তবে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে সন্ন্যাসিনীদের ভয় পাবাব কোনো কারণ নেই।"

"বেহাযা মেয়ে কোথাকার।" উত্তরে গুঁফো লি বললো। "এক্ষুণি, এই মুহূর্তে তুমি বাড়ি চলে যাও।"

"না, আমি বাড়ি যাচ্ছি না। আমি কি করবো না কববো তোমাকে তা বলতে হবে না!" লিযেন-নিউ তার মুখে মুখে জবাব দিলো।

"ওঃ, আমায তা বলতে হবে না, তাই নাকি।" গুঁফো লি তার দিকে এক পা এগিযে গেলো। "মার ভাই হচ্ছে বাপের মত। তোমার বাবা যখন নেই তখন তুমি আমারই জিম্মায রয়েছো।"

লিযেন-নিউ-র এক পাও নড়লো না। "তুমি আমার মার ভাই বলেই তোমাকে এতদিন মেনে এসেছি। সেটা তোমার বোঝা উচিত আব সেটাকে প্রশংসা করা উচিত।"

"কোন সাহসে তুমি এমনি করে আমার মুখে মুখে কথা বলো!" বলতে বলতে গুঁফো লি চাবুক উচিযে লিযেন-নিউকে মারতে গেলো। কিন্তু হাত তুলতে না তুলতেই কে যেন খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলে দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। সামনের ও পিছনের গাডিগুলি অনেকক্ষণ আগে থেকেই দাঁড়িয়ে পড়েছে সে গুলি থেকে মেযে পুরুষ সকলে দাঁড়িযে দৃশ্যটা দেখছিল। তাঁদের মধ্যে মতভেদ ছিল, কেউ মামার দিক নিচ্ছিলো আর কেউ নিচ্ছিলো ভাগ্নীর দিক। "আরে, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। মেযেবা তো ঠিক ছেলেদের মতই খাটে। তাহলে কেনই বা তারা গাড়িব সঙ্গে বেরিযে আসবে না?...।"

কেউ এগিয়ে এলো লিয়েন-নিউ-র হয়ে মধ্যস্থতা করতে। "নতুন যুগ এখন। মেয়েদের বাক্সে বন্ধ করে রাখতে পারবে না কখনোই অন্যেরা বললো। "আজকের দিনে মেয়েদের ওপর জুলুম করার চেষ্টা করতে পারো না," কে একজন সাহস করে বললো।

কিন্তু সেখানে অন্যরাও ছিল, তারা ফিসফিস করে বলাবলি করছিল, "একটা মেয়ে যে কত কীর্তিই করতে পারে তা কে জানে, এ্যাঁ, কি বলো? "এই ছোঁড়া আর ছুঁড়ি হয় তো বড্ড বেশি মাখামাখি করছিল। এই ধরনের ব্যাপার তো আর ঘটতে দেওযা যেতে পারে না!" "ও যদি আমার মেয়ে হতো, তাহলে আমি ওকে ঘরে বন্ধ করে রাখতাম...।" কিন্তু তাদের মধ্যে বেশিরভাগই গুঁফো লিকে দোষ দিলে, তাকে

বললো তার সপক্ষে কোনো যুক্তিই নেই। চুঙ-সিয়াঙ ও লিয়েন-নিউ-র দিক নিয়েছিলো যারা তারা বেশ স্পষ্টভাবেই কথা বলছিল, কিন্তু গুঁফো লি-র প্রতি যারা সহানুভূতি দেখাচ্ছিল তারা কথা বলছিল একধারে দাঁড়িয়ে নিচু গলায়।

ইতিমধ্যে লি ফেৎ-ল্যান, সামনের দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল সেখানে সে শুনলো লিয়েন-নিউ আর তার মামার ঝগড়ার কথা। এতক্ষণে সে ছুটতে ছুটতে এসে, ভিড় ঠেলে গুঁফো লি-র সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

"লি খুড়ো, লক্ষ্মীটি, এত হৈ চৈ করো না," সে মিনতি করে বললো। তার আশেপাশের অল্প বয়সী মেয়ে বউদের দেখিয়ে সে বলতে লাগলো, "নিজের চোখে তুমি দেখো কতগুলো মেয়ে আজ রাতে আমাদের সঙ্গে এসেছে। লিয়েন-নিউ একাই শুধু আসেনি।"

গুঁফো লি তার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রাগের চোটে হাঁকতে লাগলো। "ফেঙ-ল্যান," সে বললো, "ও বলছে, ও কি করবে না করবে সেটা বলা আমার কাজ নয়! সে কথা কি ঠিক, না ঠিক নয়?"

"যদি তুমি তাকে ঠিক কাজ করতে বলো, তবেই।" ফেঙ ল্যান উত্তর দিলো।

গুঁফো লি তর্ক শুরু করে দিলো, কখনো চিৎকার করে কখনো বিড় বিড় করে।

ফেঙ ল্যান যখন দেখলো গাড়িগুলো ও তাদের চালকরা ওখানে জড়ো হয়ে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে তখন সে বেশ চিন্তিত হলো। "আর যদি কিছু বলার থাকে, বাড়ি গিয়ে তার মীমাংসা করা যাবে", সে বললো। "আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার এই ধরনের কাজে বাধার সৃষ্টি করে, এ আমরা হতে দিতে পারি না। এ শস্য আমাদের ট্রেনে তুলে দিতেই হবে।" এই কথা বলে সে ভিড়ের দিকে চেয়ে হাত নেড়ে ইশারা করলো। "চলে এসো এবার, আর ভিড় করো না।" সে বললো। "আমাদের এবার যেতে হবে.... তাড়াতাড়ি করো।" ভিড় ভেঙে যে যার কাজে চললো।

সামনের গাড়িগুলো দূরে এগিয়ে গেলো, কিন্তু গুঁফো লি তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। ফেঙ-ল্যান তাড়াতাড়ি লিয়েন-নিউ-র কাছে গিয়ে বললো "লিযেন-নিউ, আমি তোমার সঙ্গে আসছি। গাড়িতে উঠে পড়ো।" এই বলে সে তাকে ঠেলে গাড়িতে উঠিয়ে দিলে।

লিয়েন-নিউ বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। হাজার হোক, সে তো বাচ্চা একটা মেয়ে মাত্র। সে যখন দেখলো গুঁফো লি কি ভীষণ একরোখা তখন তার ভয় হলো যে ঝগড়াটা তাহলে কিছুতেই মিটবে না। লজ্জায় আর রাগে অভিভূত হয়ে সে আর চোখের জল সামলাতে পারলো না। লিয়েন-নিউকে কাঁদতে দেখে লি ফেঙ ল্যান তাকে বুকে টেনে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। "এ কি! কাঁদছো তুমি? সে বললো।" "কেঁদে কোনো লাভ হবে না। বাড়ি গিয়ে শান্ত ভাবে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করো। এমন কোনো জিনিস নেই যে তার মীমাংসা হয় না।" চুঙ-সিয়াঙের দিকে ফিরে সে তাকে বললো তাড়াতাড়ি করে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্যদের ধরে ফেলবে।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে গুঁফো লি-র দিকে তাকিয়ে চুঙ-সিয়াঙ সপাং করে বলদ দুটোর পিঠে চাবুক বসালো।

"বেচারা বোবা প্রাণী দুটোর ওপর ঝাল ঝাড়ছো কেন?" লি-ফেঙ-ল্যান জিজ্ঞাসা করলো।

ওদের দিকে তাকিয়ে দুয়ো দিতে দিতে আর থুথু ফেলতে ফেতে গুঁফো লি পিছন পিছন আসছিল। কিন্তু লি ফেঙ-ল্যান এখন লিয়েন-নিউ-এর সঙ্গে রয়েছে দেখে তার রাগটা অনেক পড়ে আসতে লাগলো।

বেশ খানিকক্ষণ চললো তারা। ফেঙ-ল্যান পিছন ফিরে দেখে গুঁফো লি-র গাড়ি বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। খড়ের গাদায় ঠেস দিয়ে হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে, ফেঙ-ল্যান আর লিয়েন-নিউ মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগলো।

"রাগ করে আর কি হবে?" ফেঙ-ল্যান বললো। "বুড়ো মানুষদের পক্ষে নতুন ধরন-ধারণে অভ্যস্ত হওয়া সহজ নয়। মনে আছে আমার বাবা কি রকম ছিলো?"

লিয়েন-নিউ চোখ মুছে, চুলটা ঠিক করলো। "এমন কাণ্ড সে কেন করবে?" সে বললো। 'ফিরে গিয়ে, মামা সমস্ত ব্যাপারটা আবার চর্বিত চর্বণ করবে। দেখো, করে কিনা।"

লিয়েন-নিউ অনেকদিন আগেই ফেঙ-ল্যানকে তার মনের কথা বলেছিল। তাই ফেঙ-ল্যান ব্যাপারটা জানতো, মেয়েটার দিকে ফিরে সে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। "বিবাহ আইন সম্বন্ধে শিক্ষা নিতে যখন জেলা-সদরে গিয়েছিলাম তখন নতুন জেলা অধিকর্ত্রী আমাকে কি বলেছিলেন তা আমি এসে তোমাকে বলেছিলাম, সে কথা কি তোমার মনে আছে? তিনি বলেছিলেন বাপ মা কিংবা ঘটকের ঠিক করা বিয়ে হচ্ছে একটা সামন্ততান্ত্রিক প্রথা, সেটা বদল করা সহজ ব্যাপার নয়। মনে আছে সে কথা? আর তিনি তো নিজেই একজন মেয়ে। এটার অবসান ঘটাতে হলে চাই মনের জোর আর সকলের মিলিত প্রচেষ্টা। কিন্তু তাই বলে আমরা যেন আবার হঠকারিতা না করে বসি। এক কোপেই তোমার মামার মতো গোঁড়া লোকের মত পালটে যাবে না। তবু তাকে তোমার ভয় করার কিছু নেই—বিবাহ আইন তো রয়েছেই। কিন্তু এবিষয়ে তোমায় মার সঙ্গে কি কথা বলেছো?"

"মা এর বিরুদ্ধে নয়। কেনই বা আমরা বিয়ের খাতায় নাম লেখাবো না, সেটা আমি বুঝতে পারছি না,—যত তাড়াতাড়ি সেটা করা যায় ততই মঙ্গল।"

লি ফেঙ ল্যান একটুক্ষণ ভাবলো। "তাড়াহুড়ো করে সহজ পথ নেওয়া আমাদের ঠিক হবে না," সে বললো। "আগে তোমার মাসীর সঙ্গে বসে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা উচিত।" এইখানে সে থামলো, কিন্তু আবার শুরু করলো, "সে যে ভাবেই হোক, এই কাজটা শেষ করে ফিরেই আমরা জেলা দপ্তরে গিয়ে তোমার বাগদানের ব্যাপারটা নাকচ করার জন্য দরখাস্ত করবো।

"যদিও এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তারা এটা মুখ বুঁজে সহ্য কববে না, তা সত্ত্বেও।"

"কিন্তু সরকার তো তোমার পিছনে দাঁড়াবে।"

লি ফেঙ ল্যান তখন চুঙ-সিয়াঙকে ডাকলো তাদের কাছে এসে বসবার জন্য, তারপর হাসতে হাসতে বললো "তুমি যদি তোমার সোনার গুলি ছুঁড়তে নারাজ হও তাহলে তোমার বুদ্ধিমতী স্ত্রী ও মিলবে না। এব্যাপারে তোমাদের দুজনকেই লড়তে হবে।"

'কিচ্ছু চিন্তা করো না! তা না করতে পারলে আমি তো আর আমি থাকবো না", চুঙ সিয়াঙ দৃঢ়ভাবে বললো।

সূর্যমুখীগুলো হাসতে হাসতে সূর্যের দিকে মাথা হেলাচ্ছিল; মাচার থেকে ঝুলে পড়া বীনের শুঁয়োগুলো বাতাসে দুলছিল। সবুজ পাতার আড়াল থেকে লাল লঙ্কাগুলোকে দেখাচ্ছিল কর্নেলিয়ান পাথরের মতো। সবজির জন্য নির্ধারিত জমিটুকু বিশেষ বড় নয়, কিন্তু তারই মধ্যে নানা রকমের, বলতে গেলে মরসুমী প্রায় সব রকমের সবজিই হয়েছে।

দুপুরের মাটি খুঁড়তে ব্যস্ত। দুরে পূব দিক থেকে আসা গাড়ির চাকার শব্দ তার কানে এসে পৌঁছালো। মাদুরেব চাঁদোয়ার গায়ে হেলান দিয়ে তাকাতেই দেখে চুঙ-সিয়াঙ সোজা হয়ে বসে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসছে।

মেয়ের কথা মা বেশিক্ষণ মন থেকে দূরে সরিযে রাখতে পারে না। গাড়ির সামনের বা পিছনের দিকে মেয়ের কোনো চিহ্ন দেখতে না পেয়ে ইউয়ান মা চিন্তা করতে শুরু করে দিল। তাড়াতাড়ি সবজির পাটি ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে চুঙ-সিয়াঙকে সম্ভাষণ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "লিয়েন-নিউকে দেখছি না যে? সে তোমার সঙ্গে নেই কেন?"

ইউয়ান মা আর তার প্রশ্নের সামনে পড়ে চুঙ-সিয়াঙ লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে অপ্রতিভভাবে উত্তর দিলো, "লি ফেঙ-ল্যানের সঙ্গে জেলা কর্তৃপক্ষের ওখানে গেছে।"

শস্য পৌঁছে দিয়ে লি ফেঙ-ল্যান লিয়েন-নিউকে জেলা দপ্তরে নিয়ে গেলো, তার ইচ্ছে ছিল জেলা অধিকর্ত্রীকে আগাগোড়া ঘটনাটা খুলে বলে তারপর ওর বাগদানের ব্যাপারটা নাকচ করার দরখাস্ত পাঠাবে।

তার মেয়ে জেলা কর্তৃপক্ষের ওখানে গেছে শুনেই ইউয়ান মা বুঝতে পারলো তার অর্থ কি। হঠাৎ তার মনে হলো তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটি আর প্রতিবেশির ছেলে চি চুং-সিয়াঙ নয়, সে যেন তার আপনার জন। কথায় বলে "জামাই তো প্রায় ছেলেরই মতো", ইউয়ান মার মনে হলো তার জামাই পুরোপুরি ছেলের মতো হবে, মেয়ে তো তার একমাত্র সন্তান।

এবার সে এই যুবক আর নিজের মেয়েকে যতবারই তার বুড়ো বয়সের প্রধান অবলম্বন বলে মনে করতে লাগলো ততবারই মনটা একটা উষ্ণ আবেগে ভরে যেতে লাগলো। চুং-সিয়াঙকে খুবই লজ্জায় ফেলে দিয়ে সে তার ভাবী জামাইকে দেখে পারলো না, যা সে দেখলো তার ভালোই লাগলো, এমন কি তুচ্ছ খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত।

বলদগুলোকে জল খাইয়ে, চুং-সিয়াঙ আর বসেনি পর্যন্ত, সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলো

শহর কর্তৃপক্ষের কাছে, সেখান থেকে এই আশ্বাস তার মিললো যে লিয়েন-নিউ আর সে বিয়ে করতে চায়, তবে কেউ তাদের রুখতে পারবে না।

দুপুর হযে এলো তখনও লিয়েন-নিউ বাড়ি ফেরেনি। ইউয়ান মা খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠলো, বারবার বাইরে গিয়ে দেখতে লাগলো। মেয়ে তার গেছে মাত্র দু'দিন, কিন্তু তবু তার মনে হচ্ছিল বহুদিন হয়ে গেছে। ভেবেছিল দুপুরের মধ্যেই মেয়ে বাড়ি ফিরবে ইচ্ছে ছিল তার জন্য ভালোমন্দ কিছু রাঁধবে। একটা মুরগি কাটবে ভেবেছিল কিন্তু মুরগিগুলো, সব ডিমে বসেছে তাদের একটাকেও আর খোয়াতে চাইলো না। তাছাড়া অনেক চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু মুরগি মারাটা তার আসে না। তাই সে কটা ডিম আনতে গেলো। ঘরের দরজায় সবে পা দিয়েছে এমন সময় দেওয়ালে একটা ছায়া পড়লো। ফিরে দেখে তার ভাই গুঁফো লি। মুখটা তার ফুলো ফুলো। একটা কথাও না বলে সে এসে দেওযালের পাশে বসলো। তার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিযে ইউয়ান মার মনে হোল তার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেলো। দীর্ঘ নীরবতার পর সে একটু সাহস করে বিব্রতভাবে বললো, "তুমি এসেছো, ভাই।" গুঁফো লি রাগে ফুঁলছিল, কথাটা যেন শুনতেই পেলো না। ইউয়ান মা দেখতেই পাচ্ছিল একটা ঝড় উঠলো বলে।

এই বৃদ্ধা তার সারাটা জীবনই খুব ভীরু প্রকৃতির, সারাটি জীবন কিছুতে জড়িযে পড়তে ভয় পেয়েছে। এখনও তার ভীষণ ভয় হলো, আরো ভয় হলো যখন তার মনে পড়লো লিয়েন-নিউ গেছে জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে। তার হাসিখুশি ভাবটা পলকে মিলিয়ে গেলো।

"আচ্ছা! কি ধরনের পারিবারিক শিক্ষার ধারা এটা?" গুঁফো লি জানতে চাইলো। এতক্ষণে সে ঘরের মধ্যে চলে এসে ঘন ঘন পাইপে টান দিচ্ছে। তারপর রাগের চোটে আবার সে চীৎকার করে উঠলো, "এ বিষয়ে তোমাকে সে কিছু বলেনি, তাই না?" তার চোখ দিয়ে আগুন ছুটছিল। পাইপ থেকে ছাই ঝেড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে, মাথা নাড়তে নাড়তে সে বললো, "তুমি তাহলে পূর্ব-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি সব জলাঞ্জলি দিয়েছো।"

"কি হয়েছে? যদি কিছু বলার থাকে তো শান্তভাবে বলো", ইউয়ান মা উৎকণ্ঠিতভাবে বললো।

"কি জন্যে গাড়ির সঙ্গে ওকে পাঠিয়ে ছিলেন।"

"আমাদের সংসারে পুরুষ মানুষ তো কেউ নেই", গলাটা নামিয়ে নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করতে করতে সে উত্তর দিলো।

"তাহলে কারুর যাবারই প্রয়োজনই ছিল না।"

"আমাদের গ্রাম থেকে বেশ কয়েকজন মেয়ে গেলো। আর কেউ যদি হাসির পাত্র হতে চায় তো হোক কিন্তু আমাদের পরিবারের কেউ অন্তত তা হবে না।"

কয়েকবার গুঁফো লি ঠোঁট নাড়লো কিন্তু কিছু বললো না। তার বোনের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো তারপর একটা কিছু শেখাচ্ছে এমনিভাবে বললো।

"একবার চিন্তা করে দেখো, সে বললো, "তোমাকে যদি আমি আমার পরিবারের একজন বলে মনে না করতাম তাহলে তোমাকে আর তোমার মেয়েকে কখনো জায়গা দিতাম ? তোমার আর তোমার মেয়ের জন্যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কতবার যে ঝগড়া করেছি তার ইযত্তা নেই সে সব তুমি ভালো করেই জানো। আগেও তোমাকে দেখাশোনা করেছি এখনও তোমাকে দেখাশোনা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এখন একবার তুমি নিজেকে প্রশ্ন করো, তোমার মঙ্গল ছাড়া আর কি জন্যে আমি এটা করছি ? লিয়েন-নিউ যখন তার মাসীর বাড়ি যাবে তখন মাসী তাকে অনেক বেশি যত্ন করবে। তোমার বুড়ো বয়সে তোমার বোনপো কি তোমাকে ফেলে দিতে পারবে ?"

যখন গুঁফো লি দেখলো যে তার বোন এর জবাবে কিছু বললো না তখন সে ধরে নিলো বোধহয় তাব সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে।

"অন্য দিকে", সে বলে চললো, "অপদার্থ ঐ চি চুং-সিয়াঙ কোন ঘর থেকে আসছে' সেটাও ভেবে দেখো। আগেকার দিনে রাখালগিরি করতো, একেবারে কপর্দকহীন, নিঃস্ব। না ছিল চাল না ছিল চুলো। অবশ্য ঠিকই, বছর কয়েক আগে কযেক মু জমি পেয়েছে, কিন্তু তাতে কি, গ্রামে তো তার প্রতিষ্ঠা বলে কিছু নেই। তোমার মেযে যদি তাকে বিয়ে করে তাহলে কি পাবে ? কিন্তু আমাদের বোনের পরিবারের লোকে বরাবর জমির মালিক ছিল। সেখানে তোমার কখনো কিছুর অভাব হবে না। তাছাড়া আমাদের সম্পর্ক হবে দুটো। তুমি আর তোমার মেয়ে যে কি চাইছো, তা সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না। আমার যতদূর মনে হয় তোমার উচিত তাড়াতাড়ি করে মেয়েকে মাসীর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া।"

এইভাবে গুঁফো লি কথা বলেই চললো, কখনো নরমভাবে কখন কড়াভাবে, কিন্তু আগাগোড়া উদ্দেশ্যটা ছিল। তার শ্রোতাকে এমনভাবে খোঁচা দেওয়া যাতে করে ভেঙে পড়ে কান্নাকাটির আশ্রয় নেয়।

মাথার ওপর রাশি রাশি হালকা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল ; দেওয়ালের ওপরে ঘাসগুলো মৃদু মৃদু দুলছিল ; ইউয়ান মাও যেন দুলছিল কখনো এপাশে কখনো ওপাশে। ব্যাপারটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করে, সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"যে দিক থেকেই দেখো না কেন", সে বললো "এটা নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দিতেই হবে তোমাকে।"

"কি নিয়ে আলোচনা করবে ? মা যা বলবে তাই হবে ; মেয়ের আর কোনো বক্তব্য থাকার তো প্রয়োজন নেই।

বৃদ্ধা তার চোখের জল চেপে ধীরে ধীরে শান্তভাবে বললো, "কিন্তু তুমি তো আমার মেয়ের প্রকৃতি জানো না।"

যত বেশিক্ষণ ধরে গুঁফো লি ঝগড়া চালিয়ে যেতে লাগলো ততই তার সাহসও বাড়তে লাগলো বিদ্বেষও বাড়তে লাগলো। "নিজে হাতে যে মেয়েকে মানুষ করেছো

তাকে যদি সামলাতেও না পারো তবে বেঁচে আছো কোন মুখে— তোমার লজ্জা হওয়া উচিত!"

ইউয়ান মা যদি এক পা পিছিয়ে যায় তো গুঁফো লি দু'পা এগিয়ে আসে। সে বলেই চললো, "এ বিষয়ে সম্বন্ধ যখন হয় তখন তুমি নিজে এটাতে কথা দিয়েছিলে। নিজের থুথু যেমন তুমি মাটি থেকে চেটে তুলতে পারো না, তেমনি তোমার কথাও তুমি ফিরিয়ে নিতে পারো না।"

ইউয়ান মার হঠাৎ মনে হলো এরকম ঝগড়া আর খিটিমিটি সে যথেষ্ট সহ্য করেছে, সেও তখন পালটা জবাব দিতে লাগলো।

"ভাই", সে বললো, লজ্জায় তার গলা পর্যন্ত লাল হয়ে গেলো, "একটা কথা আছে 'পাহাড়ে চড়তে হলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়, নদী পার হতে গেলে জুতো খুলতে হয়।' অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। মেয়ে বড় হয়ে গেছে। আর বিয়ের ব্যাপার সরকারই তার হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না আমি তো কোন ছার"।

"ঐ কুত্তার বাচ্চা ব্যাটা চি! "গুঁফো লি চীৎকার করে উঠলো।" তাহলে বিবাহ আইনটাকে ও মেয়ে ফুসলানোর ওজর হিসাবে ব্যবহার করছে তাই না? ওর মত লোকদের চাবকে মেরে ফেললেও যথেষ্ট হবে না।"

এখন যখন ব্যাপারটা চরমে পৌঁছেছে তখন ইউয়ান মা আর ভয় পেলো না। আবার যখন সে কথা বললো তখন খুব একটা অমায়িকভাবে বললো না। "ওরা.... ওরা... দুজনেই চাইছে।"

গুঁফো লি এমনি রাগে জ্বলছিল। যখন দেখলো তার অতি গোবেচারা বোন পর্যন্ত তার সঙ্গে এমনি প্রচণ্ডভাবে তর্ক করছে তখন সে আরো চটে গিয়ে ছোট একটা টেবিলে এক লাথি মারলো, টেবিলটা গেলো উলটে আর তার ওপরে রাখা সেলাইয়ের বাক্সটা গেলো মাটিতে পড়ে। তারপর পাগলের মতো হাত পা নেড়ে চীৎকার করে বললো, "তোমায় সোজা বলছি, যদি ভেবে থাকো সম্বন্ধটা তুমি ভেঙে দিতে পারবে তাহলে তুমি স্বপ্ন দেখছো। একটা কথা বোধ হয় তুমি ভুলে গেছো, জেলা অধিকর্ত্রী হচ্ছে তোমার বোনের ভাগ্নে বউ। তুমি খামখা বে-ইজ্জত হবে, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রচণ্ডভাবে তাদের তর্ক চলতে লাগলো মতৈক্যের ধারে কাছেও গেলো না। হঠাৎ লিয়েন-নিউ দৌড়ে উঠোনে এসে ঢুকলো, ঘর্মাক্ত, রক্তাভ তার চেহারা, কিন্তু খুবই উৎফুল্ল মনে হলো তাকে। সে ঢোকামাত্রই তারা তার ডাক শুনতে পেলো, "মাগো, তুমি আমায় খুঁজছিলে?" কথা বলতে বলতে সে লাফিয়ে বেড়াতে লাগলো, "দেখো, কি চমৎকার মিহি কাপড় কিনেছি।" ছুটে মাঝের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার গোড়ায় থমকে থেমে পড়লো। হাতের মধ্যে থুতনি রেখে তার মা এক বাণ্ডিল খড়ের ওপর বসে আছে, চোখ দুটো তার জলে ভরা। আর দেওয়ালের ধারে বসে তারা মামা, কটমট করে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে, পাইপে তামাক ভরছে। ছোট টেবিলটা উলটে পড়ে আছে, পায়া চারটে ওপরের

দিকে করে....। এর অর্থ যে কি তা সে বুঝতে পারলো। গুঁফো লি এখন তার শত্রু। সকালে রাস্তার ওপর ধ্বস্তাধ্বস্তির কথা মনে পড়ায় সে আর রাগ সামলাতে পারছিল না। বড় চৌকানো টেবিলের ওপর কাপড়ের বাণ্ডিল আর গায়ে মাখা সাবানটা দুম করে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। দরজার গোড়ায় গিয়ে বসলো, চোখ পাকিয়ে। লেশের ধারি দেওয়া স্ট্র হ্যাটটা (তৃণ দিয়ে নির্মিত টুপি) মাথা থেকে খুলে নিয়ে সেইটা দিয়ে পাগলের মতো নিজেকে বাতাস করতে লাগলো।

মেয়েকে দেখে ইউয়ান মার হঠাৎ ভীষণ দুঃখ হলো। চোখের জল তার গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

"তুমি কাঁদছো কেন মা?" লিয়েন-নিউ তার মার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলো। "আকাশ যদি ভেঙে পড়ে তবে পৃথিবী তাকে তুলে ধরবে আমার কাজকর্মের জন্য আমি দায়ী।"

গুঁফো লি রক্তবর্ণ চোখে কটমট করে লিয়েন নিউ-র দিকে তাকালো।

"তোমার বিয়ের সম্বন্ধ তুমি ভাঙতে পারো না", সে বললো।

লিয়েন-নিউ ভুরু কোঁচকালো।

"সম্বন্ধ ভাঙতে হবে কি হবে না সেটা আমি ঠিক করবো," সে পালটা জবাব দিল।

"তোমার ঠিক করার ব্যাপার এটা নয়", ভাগ্নীর দিকে আঙ্গুল তুলে, গুঁফো লি বললো।

"তোমার পক্ষে তো আরোও নয়।"

"আমি যে তোমার মামা এটা তো তুমি অস্বীকার করতে পারো না।"

"তুমি তোমার মেয়ের বিয়ে ঠিক করতে পারো, কিন্তু আমার নয়।"

এটাতে গুঁফো লির বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেলো। সে আবার বিশেষ করে তার মেয়ের কথা তোলাটা মোটেই পছন্দ করতো না। লিয়েন-নিউর কথাগুলি তার গায়ে এমনি জ্বালা ধরিয়ে দিলো যে তার লজ্জা একেবারে রাগে পরিণত হলো।

"সে যাই হোক" কর্কশস্বরে সে বললো, "আজ তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ।"

লিয়েন-নিউ চট করে উঠে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল দিয়ে গুঁফো লির দিকে দেখালো। "আমি এ দেশের নাগরিক", সে বললো। "আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা রয়েছে। আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না। এ নিয়ে একশো বার তোমাকে বলছি আমি যাচ্ছি না। দেখি আমার গায়ে হাত দেয় এমন সাহস কার আছে!"

ইউযান মা এখন আর কাঁদছিল না, শুধু মেয়ের দিকে তাকিয়েছিল। কত বড় হয়ে গেছে মেয়ে! আর এই বড় হয়ে যাওয়া মেয়েই যেন তাকে শক্তি দিলো।

গুঁফো লির ঠিকে ভুল হয়ে গিয়েছিল। তার চোখে লিয়েন-নিউ তখনও সেই পাঁচ বছর আগেকার নিরীহ ছোট্ট মেয়ে, তাকে যদি কেউ হুকুম করতো পূর্বে যেতে তবে সে পশ্চিম যাবার কথা কল্পনা করতো না। সে তো ভাবতেই পারেনি সেই মেয়ের এত সাহস হবে যে সে তার মুখে মুখে জবাব দেবে, প্রতিটি কথার বদলা দেবে। সে

ভেবেছিল, যদি তার মর্যাদার কথা তোলে— সে কি ওর মামা নয়?— তাহলে লিয়েন-নিউ হয়তো ওর সামনে নীচু হবে। সে ধরে নিয়েছিল লিয়েন-নিউ যদি তার সঙ্গে তখনি যেতে আপত্তিও করে তবু সে অন্তত কিছুটা দমে যাবে। শেষ পর্যন্ত তাকে দাবাতে পারবে আর সেও পিছিয়ে যাবে। তারপর মিষ্টি কথা আর স্তোক দিয়ে বশে আনা যাবে। কিন্তু দেখো, এখন ব্যাপার কি রকম দাঁড়ালো। এমনটি যে হবে গুঁফো লি তা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

ইতিমধ্যে বেশ লোক জমতে শুরু করেছে। কেউ কেউ উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, অন্যেরা আবার একেবারে ভিতরে চলে গিয়েছে যদি একটা মিটমাট করতে পারে। কয়েকজন ভাবছিল, গুঁফো লিরই দোষ, কিন্তু অন্যেরা মামাকে অপমান করার জন্য লিয়েন-নিউকে দুষছিল। তারা বলছিল, যতই হোক না কেন, সেই তো তাকে মানুষ করেছে, করে নি কি?

বাচ্চা কোলে এক মহিলা দেখলো ঝগড়া বেশ গুরুতর হয়ে উঠেছে। তার পাশের মেয়েটির দিকে ফিরে সে বললো, "তাড়াতাড়ি যাও, জেলা অধিকর্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এসো।"

"তাঁকে পাবো কোথায়?" মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো।

"গাঁয়ের পূর্বদিকে লি-ফেঙ-ল্যানের ওখানে।"

মেয়েটি তাড়াতাড়ি চলে গেলো।

সে দিন সকালে জেলা অধিকর্ত্রী জেলা পার্টি কমিটির সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করে তারপর উৎপাদকদের সমবায় সংক্রান্ত কতগুলো সমস্যা পরীক্ষা করতে ইউনিয়ন গ্রামে আসবে বলে ঠিক করেছিল। বাড়ি থেকে বেরুতেই তার লিয়েন-নিউর মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সে এসেছিল গ্রামের মেলায়, কয়েকটা জিনিস কিনতে। জেলা অধিকর্ত্রী তাকে নিজের দপ্তরে নিয়ে গিয়ে লিয়েন-নিউ কেন তার বিয়ের সম্বন্ধ ভাঙতে চায় তা আদ্যোপান্ত খুলে বললো। সেই সাথে সাথে সে ধৈর্য ধরে বিবাহ আইনের অর্থটা তাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললো, 'ভাই, লিয়েন-নিউ তোমাকে বিয়ে করতে রাজী নয়, তবে যদি তুমি তাকে জোর করে বিয়ে করে তাহলে একটুও শান্তি পাবে না। তার ফলে তোমার ক্ষেতের কাজ খারাপ হতে বাধ্য। যতদিন তুমি ভালো করে খাটবে ততদিন তোমার বউ খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধাই হবে না। বাড়ি গিয়ে মাকে বোঝাও সে যেন লিয়েন-নিউর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি না করে। তৃতীয় ব্যক্তি যদি বিয়ে ঠিক করে তবে সেটা বিবাহ আইন বিরুদ্ধ।

যতই হোক, অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের মন অনেক উদার। জেলা অধিকর্ত্রীর কথাগুলো শেষ পর্যন্ত শুনে ছেলেটি লজ্জায় লাল হয়ে গেলো আর বললো, "আমার দিক থেকে ঠিকই আছে। কথায় বলে, 'একটা ঘোড়াকে জল খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু তাকে জল খাওয়াতে পারা যায় না।" জেলা অধিকর্ত্রী আবার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় দিলো।

মধ্যাহ্নভোজের পর সাইকেলে করে সে ইউয়ান গ্রামে চললো।

জেলা অধিকর্ত্রী বেশ লম্বা প্রায় তিরিশ বয়সের এক যুবতী। তার বব্ করে কাটা চুল, পরণে নীলরঙের উর্দি। মহিলাটি বেশ অমায়িক, কিন্তু তার অমায়িকতার আড়াল থেকে গাম্ভীর্যের একটা সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যেত। এবার সে লি ফেঙ ল্যানের সঙ্গে লিয়েন-নিউর বাড়ি চললো, তাদের সঙ্গ নিলো চুং-সিয়াঙ, একযোগে লজ্জা ও রাগের সমন্বয়ে মুখটা তার টকটকে লাল।

উঠোনে ঢুকেই, সেখানে যত বুড়ি আর কমবয়সী বউয়েরা জড়ো হয়েছিল, জেলা অধিকর্ত্রী তাদের দিকে তাকালো। "তাহলে সকলেই দেখছি এখানে!" সে বললো। তাবপর সটান চলে গেলো বাড়ির ভেতরে, লিয়েন-নিউ গেলো তার পিছু পিছু।

চুং-সিয়াঙ ভীড়ের মাঝেই দাঁড়িয়ে রইলো, তার একটু অস্বস্তি লাগছিল, কিন্তু গুঁফো লির সঙ্গে লড়বার জন্যে সে প্রস্তুত। চোখ দুটো তার বিস্ফারিত ; নিঃশ্বাস পড়ছিল জোরে জোরে ; লোকে তার দিকে তাকিয়ে হাসলে সেটা সে দেখতে পেলো কি না তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল না।

ঘরে ঢুকে জেলা অধিকর্ত্রী সকলকে অভিবাদন জানালো, ইউয়ান মা তার বসার জন্য একটা বেঞ্চি টেনে আনলো, বেঞ্চিটা আনার সময় চোখের জলটাও মুছে ফেললো। লিয়েন-নিউর হাত ধরে তাকে নিয়ে জেলা অধিকর্ত্রী হাসিমুখে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলো। তারপর ভীড়ের মধ্যে থেকে সে চুং-সিয়াঙকে খুঁজে বার করলো। "দুটিতে মানাবো ভালো!" মনে মনে সে ভাবছিল।

ইউয়ান মা যখন শুনলো জেলা অধিকর্ত্রী আসছে তখন সে একটু চিন্তিত হোল। যতই হোক, তার বোনের ভাগ্নে বউ তো সে! ওদিকে গুঁফো লি ভারী উৎফুল্ল, সে ভাবলো ছোট বোনের কথাগুলোয় জেলা অধিকর্ত্রী কতটা অন্তরঙ্গ আর তার ওপর আবার সেই নির্লজ্জ বেহায়া চুং-সিয়াঙ ও এসেছে— তখন থেকেই তার মনে আশঙ্কা হতে লাগলো। ব্যাপারটা কি তাহলে চরমে পৌঁছাবে, সে মনে মনে ভাবতে লাগলো। ভালো করে আবার চিন্তা করে নিজেকে বোঝালো জেলা অধিকর্ত্রীর হাসি মুখ দেখে ভুল ধারণা না করতে । নিজেকে কি সে প্রবোধ দিলো। নতুন সমাজ, সরকারী কর্মচারীরা তো হাসিমুখেই কাজকর্ম করে থাকে! কিন্তু তবু সে মনে স্বস্তি পেলো না। চোখ কুঁচকে সে জেলা অধিকর্ত্রীকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। একটু বাদে সে জিজ্ঞাসা করলো, "তোমার সঙ্গে লিয়েন-নিউর মাসীর দেখা হয়েছে কি না, একথাটা কি আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"হ্যাঁ হয়েছে, বেশ কিছুদিন আগে, "স্নেহভরে লিয়েন-নিউর হাতে হাত বুলিয়ে, জেলা অধিকর্ত্রী উত্তর দিলো।

এ কথাটা শুনে ইউয়ান মার গলায় যেন একটা ডেলা আটকে গেলো।

"ব্যাপারটা তো সব পরিষ্কার করে বোঝান হয়েছে তো?" চোখ দুটো আবার কুঁচকে গুঁফো লি প্রশ্ন করলো।

"হ্যাঁ! সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে, হাসিমুখে জেলা অধিকর্ত্রী উত্তর দিলো।

ইউয়ান মা একবার তার দিকে একবার গুঁফো লির দিকে তাকালো। তার বুকটা ধ্বক ধ্বক্ করতে লাগলো।

গুঁফো লি একেবারে আনন্দে আত্মহারা। একটা সন্তুষ্টির ভাব তার মুখচোখে ছড়িয়ে পড়লো। তখনই সে আবার জিজ্ঞাসা করলো, "বলো তো, বুড়ো মামা হিসাবে আমার ভাগ্নীর ভালোমন্দ দেখার অধিকার কি আমার নেই?

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে। মামা তো খুবই আপনার লোক, বিশেষ করে আবার তোমার মতো মামা, লিয়েন-নিউর ছোটবেলা থেকে দেখাশোনা করেছে যে। তুমি তো প্রায তার বাপের মতো।"

"একেই তো বলি ন্যায বিচার! "গুঁফো লি এবার খুবই সন্তুষ্ট হলো। মা আর মেয়ের দিকে তাকিয়ে সে বললো, "ও যে জেলা অধিকর্ত্রী হয়েছে এতে আর আশ্চর্য কি। এত ন্যায্য সে।" তারপর আবার একটা প্রশ্ন করলো, "তোমার কি মনে হয না যে ওর বুড়ো মামা আমি, আমি যা করছি তা ওব মঙ্গলের জন্য?"

"হ্যাঁ, বটেই তো। অল্পবযসী একটা মেয়ের জন্য সকলেই চায় একটি ভালো বর জোগাড় করে দিতে।"

"ঠিক তাই। কথাটা একেবারে ঠিক।গুঁফো লি একেবারে আনন্দে বাক্যহারা। "তুমি সত্যি একজন সৎ আধিকারিণী। যা বলবার তা তুমি সবই বলেছো।', লিয়েন-নিউ আর তার মার দিকে সে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকালো, যেন বলতে চাইলো, "দেখো তোমাদের দাবাতে পারি কি না!"

সেই মুহূর্তটিতে গুঁফো লির যতো ভালো লাগছিল এত ভালো আর তার জীবনে কখনো লাগে নি। সে ভাবছিল, জেলা অধিকর্ত্রী যে লিযেন-নিউকে তাব মাসীর বাড়িতে যাবার জন্য বোঝাতে এসেছে এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। এইভাবে নিশ্চিত হয়ে সে লিয়েন-নিউকে দেখিয়ে মন্তব্য করলো, "এত বেশি জেদী ও মোটে যাবেই না।"

"কেন, ও এত জেদী কেন? আব যেতেই বা চায় না কেন?" হাসতে হাসতে জেলা অধিকর্ত্রী বললো।

"একবারে ওকেই জিজ্ঞাসা করেই দেখো না।" গুঁফো লি আবার লিযেন-নিউর দিকে দেখালো।

জেলা অধিকর্ত্রী প্রথমে লিয়েন-নিউর দিকে তাকিয়ে তারপর গুঁফো লির দিকে ফিরে তাকালো। "আমি চাই তুমিই আমায় বলো" সে বললো।

লিয়েন-নিউ এর পানে চেয়ে গুঁফো লি উত্তর দিলো, "ও বলছে সমস্ত ব্যাপারটাই আমি আমার নিজের হাতে নিয়ে ওর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছি।"

"সে সম্বন্ধে তুমি কি বলো? তোমার কি মনে হয় এ সম্বন্ধ ওর মত না নিযেই তুমি ঠিক করেছো?"

গুঁফো লি বলতে যাচ্ছিল দুই পরিবারের লোকেরা মিলে বিয়ের বাগদানের ব্যাপারটা ঠিক করেছে, এই দুই পরিবার আবার নিকট আত্মীয়ও বটে, তবে যে দিকে

থেকেই দেখা যাক না কেন, এটা খুবই ভালো হয়েছে। কিন্তু কেন জানি কথাগুলো ঠিক সহজভাবে বেরিয়ে এলো না।

ধীরে ধীরে, জেলা অধিকর্ত্রী বললো, তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেলো।

"যদি তোমরা ভাল করে ভেবে থাক তবে খুব ভাল।" সে বললো পরিষ্কার গলায়। "কিন্তু বয়স্ক লোকেরা সব সময় তাদের ছেলে মেয়েরা যেভাবে চিন্তা করে সেই ভাবে চিন্তা করে না....।

এই কথা শুনে ইউযান মার গলার মধ্যে আটকানো ডেলাটে নেমে গেলো।

গুঁফো লির কানে কিন্তু কথাটা অত ভালো শোনালো না। তার মুখ থেকে আগের সেই উল্লাসের ভাবটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো।

ঘবেব ভেতরে আর বাইরে উঠোনে অনেক মাযেরা আর অল্পবয়সী বউয়েরা মুখ চাওয়া চাওয়ি কবতে লাগলো, গুঁফো লির প্রতি নিঃশব্দ ঘৃণা প্রকাশ কবে।

জেলা অধিকর্ত্রী বলে চললো, "কিছু কিছু বয়স্ক লোক তাদের পুরনো চিন্তাধারা আঁকড়ে রয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে তারা নিজেদের ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত নেয এটা ঠিক নয। এটা তাদেব জানা উচিত যে এই ধরনের পুরনো প্রথা উচ্ছেদ কবার জন্যই জনগণের সরকার আমাদের বিবাহ আইন দিয়েছে, যাতে করে তাদেব ছেলে মেয়েরা নিজেদের পছন্দ মত বিয়ে করতে পারে।" ওর কথাগুলো খুবই সহজ ও সরল কিন্তু শ্রোতাদের ওপর তার ফল হলো প্রচণ্ড। ঘরের ভেতরটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলো, এত বেশি নিস্তব্ধ হয়ে গেলো যে একটা আলপিন পড়লেও বোধহয় তার শব্দ শোনা যেতো।

এতক্ষণে ইউযান মা বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল।

"হায় ভগবান, ঠিকই তো!" চীৎকার করে উঠলো পাকালো এক মহিলা, দরজার বাইরে থেকে। "অন্যরা, যারা অতীতে বছরের পর বছর মৃত্যু কামনা করেছে, তাদের কথা না হয় নাই বললাম কিন্তু আমাদের গ্রামের মেয়েদের কথা একবার ভেবে দেখো তো! আজকে দিনে...।"

সে কথা শেষ করবার আগেই বাচ্চা কোলে মহিলাটি তাড়াতাড়ি বললো, "হ্যাঁ, আজকে আমাদের বিবাহ আইন হয়েছে, মেয়েদের পোষা জন্তু জানোয়ারের মতো করে দেখতে কেউ আর সাহস করে না। আমার স্বামীকে দেখো । শোষণ থেকে মুক্তির আগে সে বলতো, 'আমি পয়সা দিয়ে ঘোড়া কিনেছি। সে ঘোড়ায আমি চড়তেও পারি আবার আমার ইচ্ছেমত তাকে চাবকাতেও পারি।' এমন একটা দিন কি কখনো গেছে যখন একটানা ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। খেতের কাজের ঝামেলা... সেতো পরেও হতে পারে। মাঝে মাঝে ফসলের থেকে আগাছাগুলি মাথায় বড় হয়ে যেতো। আর অবস্থা যত খারাপ হতো আমাদের ঝগড়াও তত বেড়ে যেতো। কি অবস্থার মধ্যে দিয়েই না গেছি তখন। এখন যখন আমার স্বামী বিবাহ আইনের অর্থ বুঝতে পেরেছে আর পারস্পরিক সাহায্যদানের কর্মীদলে যোগ দিয়েছে, এখন তাকে দেখো। তাকে তো চিনতেই পারবে না। ঐ ধরনের বাজে কথা আর তার মুখ থেকে

শুনতে পাবে না। সে একেবারে অন্য লোক হয়ে গেছে, যত সকালেই চাও সে উঠে পড়েছে, আর অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত কাজ করে চলেছে।

"কথাটা তুমি শুনলে?" জেলা অধিকর্ত্রী গুঁফো লিকে জিজ্ঞেস করলো। বিবাহ আইনটা যেমন তেমন করে খসড়া করা হয়নি।। আইনের উদ্দেশ্য হলো পারিবারিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা, যাতে করে আমরা কাজ করে যেতে পারি আর লক্ষ লক্ষ পবিবারের জীবনে সুসময়ের সূচনা করতে পারি। আগেকার দিনের বিবাহ প্রথায় মেয়েদের জীবন ছিল লাঞ্ছনার জীবন, এইমাত্র এই মহিলা যা বললো। ভেবে দেখো জ্যাঠাঃ এতদিন যে বিবাহ আইনের জন্য আমরা অপেক্ষা করেছিলাম সেটা যখন হাতে পেয়ে গেছি তখন বাধ্যতমূলক বিয়ে করে মেয়েদেব স্বাধীনভাবে স্বামী পছন্দ করায় বাধা দিতে কে আর চাইবে?"

জেলা অধিকর্ত্রীর কথা শেষ হবার অপেক্ষা না করেই লিয়েন-নিউ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "সঠিক কাজ যদি করা যায় তবে নিজের বাপের কথাও অমান্য করা যায়। অন্য ব্যাপারে তোমার কথা আমি মানবো, তুমি আমার মামা। কিন্তু আমার বিয়ের ব্যাপার তুমি তো দূরের কথা আমার মরা বাবাও যদি আজ বেঁচে ওঠে আসতো তাহলেও তার কথা শুনতাম না।"

লিয়েন-নিউর চার পাশের সকলে লিয়েন-নিউর দিকে তাকিয়ে রইলো, খুবই উদ্বুদ্ধ আর উৎফুল্ল হলো তারা।

ইউয়ান মাও কথা বলতে লাগলো। ভাই আমার "একটু বোঝবার চেষ্টা করো না কেন তুমি? তোমায় কেবল তোমার নিজের মেয়ের দিকে তাকাতে হবে। গোলপুরন্ত মুখ, মোটাসোটা গড়নের মেয়ে ছিল সে, চমৎকার, কাজের মেয়ে। এখন তার স্বামীর সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারছে না, খুবই অসুখী সে। বেশ অসুস্থ হযে পড়েছে। একেবারে শুকিয়ে গেছে, ফ্যাকাশে মেরে গেছে। এমনিভাবে গুমরে থাকতে থাকতে যদি সে মরেই যায় তখন তোমার কেমন লাগবে?"

একটা কথা না বলে গুঁফো লি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো।

জেলা অধিকর্ত্রী বললো, "ওঃ হ্যাঁ! ঐ কথায় মনে পড়লো। গুঁফো লির দিকে ফিরে বললো, জ্যাঠা, তোমার মেয়ের দুরবস্থার কতকগুলো খবর পেলাম, আমাদের কয়েকজন কমরেড তার গ্রামে গিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে। অনেকবার তারা তোমার জামাইকে সমালোচনা করেছে। কিন্তু সে সব সমালোচনায় কোনো কাজ হয়নি। তোমার মেয়েকে দেখে তাদের বেশ অসুস্থ মনে হয়েছে, তাছাড়া তাকে কখনো হাসতে দেখা যায় না। তোমার জামাই কখনো বাড়িই থাকে না। আর যদি বা বাড়িতে থাকে তবে বাড়িতে পা দেবা মাত্র ঝগড়া শুরু করে দেয়। এখন সে পারস্পরিক সাহায্য দানের কর্মীদল থেকে ভেগে পড়েছে। একে তুমি নিশ্চয়ই সুখী জীবন বলবে না, বলবে কি?"

গুঁফো লি মাথা হেঁট করলো, তার মুখ একেবারে লাল হয়ে গেলো।

"উদাহরণস্বরূপ আমার কথাই ধরো না," জেলা অধিকর্ত্রী বলে চললো। "তোমরা

সকলেই জানো শিশু বয়সে আমার বিয়ে হয়। আমি যখন ছোট তখন আমার বাবা মা আমাকে উত্তর গ্রামে বিক্রি করে দেয়। আমি শুতাম গোয়ালে আর আমার বিছানা ছিল পুরোনো ছেঁড়া থলে....। আর আমার বাবা মা কেঁদে কেঁদে একেবারে অন্ধ হবার যোগাড়। কখনো কল্পনা করতে পারিনি একদিন সোজা হয়ে দাঁড়াবো, মানুষে পরিণত হবো! নতুন সমাজে ছেলে আর মেয়ে একই রকম কাজ করার অধিকারী ; সমান মর্যাদার অধিকারী । বাপ-মা-দের এ ধরনের অশান্তি আর কখনো হবে না।"

কথাগুলো গুঁফো লির মর্মে গিয়ে আঘাত করলো। কোনো কথা বলতে অক্ষম হয়ে সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। জেলা অধিকর্ত্রী তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, "জ্যাঠা, আমি লিয়েন-নিউর মাসতুতো ভাইকে ব্যাপারটা সব খুলে বলেছি, বিয়ের সম্বন্ধ ভাঙতে সে রাজী আছে। এর বেশি আর কি বলা যেতে পারে? এখন একটু চাঙ্গা হও, আমি তোমার ভাগ্নীকে বলছি, তোমাকে রাতের খাবার করে দিক। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে কখন।"

গুঁফো লি নিঃশব্দে মাথা নাড়ালো। তারপর হঠাৎ গর্জে উঠলো, "আমার ক্ষিদে পায় নি।"

এমন সময় লিয়েন-নিউর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে লি ফেঙ ল্যান এগিয়ে এলো। অপর হাত দিয়ে চুং-সিয়াঙ কে দেখিয়ে সে বললো, "মা মাসী ও ভায়েরা সব দুজনকে খুব ভালো মানিয়েছে না?"

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা হাসির রোল উঠলো। বাচ্ছা কোলে মহিলাটি জোরে চীৎকার করে বললো, "আমরা তো অনেক দিন আগেই বলেছি এই দুটিতে যদি জোট না বাঁধে তাহলে তিন বছর ধরে খরা চলবে, এ দুজনের বিচ্ছেদ ভগবান সহ্য করতে পারবে না।"

সাধারণভাবে একটা গুঞ্জন উঠলো, কথাটায় সকলেই সায় দিলো।

এই কথাগুলো শুনে আর জেলা অধিকর্ত্রীর কথাগুলো চিন্তা করে গুঁফো লি বুঝতে পারলো ওরা পুরোপুরি ভ্রান্ত নয়। বিশেষ করে তার মেয়ের কথা তোলায় তার আঁতে ঘা লেগেছে। এখন সকলেই যেন তাকে নিয়ে মজা করছে আর তাও আবার ঐ ছোকরা চুং-সিয়াঙের সামনে। তার রাগ হয়ে গেলো। তাছাড়া আবহমান কাল থেকে ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা বাপ মারই কাজ বলে গণ্য হয়ে আসছে। চিরকালের সেই প্রথা এত তাড়াতাড়ি, এত সহজে ধুয়ে মুছে যাওয়া অসম্ভব। আরো সেইজন্যেই তো এইসব মেয়েদের এত অনমনীয় আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া উচিত নয়। সে ভাবলো আবার একবার চেষ্টা করে দেখে, কিন্তু জেলা অধিকর্ত্রী আর এই এত লোকের বিরুদ্ধে তার সফলতার কি কোনো সম্ভাবনা আছে? ওদের মধ্যে একজনও কেউ তার হয়ে একটা ভালো কথা বলবে না। যদি সে লেগেও থাকে তবুও কখনো জিততে পারবে না। সে আড়ষ্টভাবে উঠে দাঁড়ালো, তারপর বেরিয়ে চলে গেলো। কে একজন তাকে আটকাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। সে শুধু ঘাড় ফিরিয়ে কষ্ট করে বলেছিল, " আমার এই আত্মীয়দের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক রইলো

না।" এইকথা বলে সে গটগট করে চলে এসেছিল।

"ভাই রে..... ।"

ইউয়ান মা উঠে দাঁড়ালো তারপর দরজার ছিটকানির ওপর হাত রেখে চীৎকার করে তাকে ডাকলো। কিন্তু ততক্ষণে সে দূরে মিলিয়ে গেছে।

যাবার আগে জেলা অধিকর্ত্রী লিয়েন-নিউ আর চুং-সিয়াঙের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলো," তোমরা দুজনে বিয়ের খাতায় নাম লেখাতে আসছো কবে?"

ওরা হাসলো, কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।